আমার দেখা পৃথিবী-১

ফুরাত নদীর তীরে

[দক্ষিণ আফ্রিকা, সৌদী আরব, ইরাক, মিসর
ও আলজিরিয়ার ঐতিহাসিক সফরনামা]

মূল

শাইখুল ইসলাম মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী
(দামাত বারাকাতুহুম)

অনুবাদ

মাওলানা মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন
মুদাররিস ঃ টঙ্গি দারুল উলূম মাদরাসা
ইমাম ও খতীব ঃ আল বাইতুল মা'মুর জামে মসজিদ
আহালিয়া, উত্তরা, ঢাকা

মাকতাবাতুল আশরাফ
(অভিজাত মুদ্রণ ও প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান)
ইসলামী টাওয়ার (দোকান নং-৫)
১১/১, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ তাকী উসমানী সাহেবের

ঐতিহাসিক সফরনামা **'জাহানে দিদাহ'**–এর অনুবাদ

'ফুরাত নদীর তীরে' (প্রথম খণ্ড)

যাতে রয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা, সৌদী আরব, ইরাক, মিসর ও আলজিরিয়ার ভ্রমণ বৃত্তান্ত।

'উহুদ থেকে কাসিয়ূন' (দ্বিতীয় খণ্ড)

যাতে সৌদী আরব, জর্দান, সিরিয়া প্রভৃতি দেশের সফরনামা বিবৃত হয়েছে।

'হারানো ঐতিহ্যের দেশে' (তৃতীয় খণ্ড)

এটি তুকিস্তান, সিঙ্গাপুর, ইন্দোনেশিয়া, বাংলাদেশ, কাতার ও চীনের সফরনামা।

'অমুসলিম দেশে মুসলিম পর্যটক' (চতুর্থ খণ্ড)

এ অংশে ইউরোপ, আমেরিকা, ভারত প্রভৃতি অমুসলিম রাষ্ট্রের সফরনামা বিবৃত হয়েছে।

অনুবাদকের কথা

اَللّٰهُمَّ لَا اُحْصِىْ ثَنَاءً عَلَيْكَ اَنْتَ كَمَا اَثْنَيْتَ عَلٰى نَفْسِكَ - وَ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهٖ مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ -

আল–হামদুলিল্লাহ। আল্লাহ কারীমের অপার অনুগ্রহে 'ফুরাত নদীর তীরে' প্রকাশিত হওয়ার কালে আমি আপাদমস্তক দ্বারা একান্তভাবে তাঁরই শুকর গুজারী করছি।

এটি মূলতঃ হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী (মুঃ যিঃ আঃ)এর বিশাল ভ্রমণ কাহিনী 'জাহানে দীদাহ'–এর বাংলা তরজমার প্রথমাংশ।

বিদগ্ধ লেখক তাঁর এই ভ্রমণ কাহিনীতে বিশটিরও অধিক দেশের ভ্রমণ বৃত্তান্ত তুলে ধরেছেন। সাথে সাথে তিনি এসব দেশের সঙ্গে জড়িত ইতিহাসের কপলে জ্বলজ্বলকারী অমূল্য রত্নাবলী আহরণ করে বইটিকে বিচিত্র রত্নসমাহারে সমৃদ্ধ করেছেন। উপরন্তু নিজস্ব অভিজ্ঞতা, মন্তব্য ও প্রতিক্রিয়াও ব্যক্ত করেছেন।

আমি আসলে 'জাহানে দীদাহ'–এর বিষয় বৈচিত্র, জ্ঞান সম্ভার এবং লেখকের প্রতি ভক্তি–শ্রদ্ধা ও ভালবাসার দুর্বলতা হেতু বইটির তরজমার কাজে হাত দেই। আমার আসল উদ্দেশ্য ছিল তরজমার অঙ্গনে অল্প অল্প পদচারণা করে অনুশীলনের কাজকে চালু রাখা। বাংলায় এর তরজমা প্রকাশ করা আমার কল্পনারও ঊর্ধ্বে ছিল। কারণ আমার কলম সম্পর্কে আমিই সম্যক অবগত। কিন্তু আল্লাহর অভিপ্রায় ছিল হয়ত অন্যরকম। তিনি পথ সুগম করে দিলেন। কাজকে পূর্ণতার পথে অগ্রসর করালেন এবং এর জাহেরী আসবাবও জোগাড় করে দিলেন। অর্থাৎ, 'মাকতাবাতুল আশরাফ'–এর স্বত্বাধিকারী শ্রদ্ধাবর হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান খান সাহেব এর তরজমাকৃত অংশ দেখলেন এবং তা শেষ করার জন্য উৎসাহিত করলেন। তাড়া দিলেন এবং বইটি প্রকাশ করার ব্যাপারে তাঁর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানালেন। আমি আমার

দুর্বলতার কথা তাঁকে অকপটে জানালাম। কিন্তু তিনি তাঁর সিদ্ধান্তে অটল। পাণ্ডুলিপি নিয়ে নিলেন এবং দায়িত্ব সচেতন আন্তরিকতার সাথে সংশোধন করে বই আকারে প্রকাশ করার বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করলেন। আল্লাহর মেহেরবানীতে আজ সেই বই আত্মপ্রকাশ করতে যাচ্ছে। এতে ভুল–ত্রুটি ও অসঙ্গতি যা আছে তা সব অনুবাদকের আর সুন্দর ও ভাল যা কিছু আছে, তা বুযুর্গ লেখক ও মাওলানার কৃতিত্ব।

এই বইয়ে ব্যবহৃত বিভিন্ন ব্যক্তি ও জায়গার নাম যেগুলো উর্দু থেকে বাংলা করা হয়েছে, তার মধ্যে অনেকগুলো নাম ভিনদেশী ও অজানা থাকার কারণে সঠিকভাবে আদায় করা হয়ত সম্ভব হয়নি। তাই বিশেষভাবে এর ভুল–ত্রুটিগুলো আমাদের গোচরীভূত করার এবং ক্ষমার চোখে দেখার অনুরোধ রইল।

আমার এই কাজ এ পর্যন্ত পৌছতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যাঁদের সহযোগিতা ও দু'আ রয়েছে, তাঁদের সকলের নিকট বিশেষ করে হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান খান সাহেব ও স্নেহের তৈয়ব–এর নিকট আমি চির ঋণী।

আল্লাহ পাক তাঁদেরকে ইহ–পরকালে উত্তম প্রতিদানে ভূষিত করুন এবং আমাদের এই মেহনতকে সার্বিকভাবে কবুল করুন। আমীন।

দোয়াপ্রার্থী

মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন

বেজগাতী, ফুলকোচা, সিরাজগঞ্জ

২১শে রবিউস সানী, ১৪২২ হিজরী

প্রকাশকের কথা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

نَحْمَدُهٗ وَ نُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ اَمَّا بَعْدُ

আজ থেকে প্রায় এক যুগ আগের কথা। পাকিস্তানের বিখ্যাত সাপ্তাহিক ম্যাগাজিন 'তাকবীর'–এর ভেতরের পৃষ্ঠায় ছোট একটি বিজ্ঞাপন আমার দৃষ্টিগোচর হয়। বিজ্ঞাপনটি ছিল জগদ্বিখ্যাত আলেমে দ্বীন জাষ্টিস মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী সাহেব (দামাত বারাকাতুহুম)–এর বিশটি দেশের ঐতিহাসিক সফরনামা 'জাহানে দিদাহ' কিতাবের।

আমি এমনিতেই পরম শ্রদ্ধেয় উস্তায হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ তাকী উসমানী সাহেবের লেখার প্রতি মারাত্মক রকমের দুর্বল। এরপর আবার এ কিতাবটি তাঁর সফরনামা।

সুতরাং বিজ্ঞাপনটি দেখেই কিতাবটি সংগ্রহ করি এবং এর বেশ কিছু অংশ সেদিনই পাঠ করি। মূলতঃ কিতাব পাঠের যে অপূর্ব স্বাদ ও আত্মতৃপ্তির কথা আসাতেযায়ে কেরামের মুখ থেকে শুনেছি, তার সামান্য ছিটে–ফোটা আমি এ কিতাবেই অনুভব করি। সাথে সাথে মনের মনিকোঠায় এর বঙ্গানুবাদের দুর্বল ইচ্ছেও হতে থাকে। কিন্তু এর অতি উন্নত রচনাশৈলী উচ্চাঙ্গের ভাষার ব্যবহার আমার সে ইচ্ছেকে বাস্তবে রূপায়িত করতে দেয়নি। পরবর্তীতে বিভিন্ন ব্যস্ততার দরুন এত বৃহৎ কিতাব অনুবাদের কাজে হাত দেয়ার সাহস ও অবকাশ কোনটিই হয়নি।

গত প্রায় ছ' মাস পূর্বে একটি ঘরোয়া দ্বীনী মাহফিলে পরিচয় হলো, নবীন কর্মঠ আলেম বন্ধুবর মাওলানা মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন সাহেবের সাথে। তিনি সে মাহফিলে একটি উর্দু কিতাব থেকে পাঠ করে তা বাংলায় অনুবাদ করে শোনাচ্ছিলেন। তার মূলানুগ অনুবাদ, উপযুক্ত ও উন্নত ভাষার ব্যবহার আমাকে

বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে। আমি তাকে প্রয়োজনীয় আরবী–উর্দু কিতাব থেকে বঙ্গানুবাদ করার প্রস্তাব রাখি। তিনি বললেন, "আমি হযরত মাওলানা মুহাম্মদ তাকী উসমানী সাহেব (দামাত বারাকাতুহুম)–এর ঐতিহাসিক সফরনামা 'জাহানে দিদাহ'–এর কিছু নির্বাচিত অংশ অনুবাদ করেছি।" সাথে সাথে সেগুলো সম্পাদনার অনুরোধও তিনি আমাকে করলেন। আমি তার সে সকল অনুবাদ খুবই আগ্রহের সাথে দেখলাম। তিনি রচনা ও অনুবাদের জগতে নবীন হলেও সামান্য কিছু অসঙ্গতি ছাড়া তার রচনা ও অনুবাদ অনেক প্রবীণের চেয়েও উন্নত। অতএব আমি তাকে পূর্ণ 'জাহানে দিদাহ' অনুবাদ করার জন্য অনুরোধ করলাম। তিনি আমার প্রতি সুধারণা বশতঃ উল্টো অনুরোধ করে বসলেন, আপনি সম্পাদনা করলে আমি অনুবাদ করতে প্রস্তুত আছি।

আমাদের বর্তমান আয়োজন 'ফুরাত নদীর তীরে' হযরত মাওলানা মুহাম্মদ তাকী উসমানী সাহেব (দামাত বারাকাতুহুম)–এর ঐতিহাসিক সফরনামা 'জাহানে দিদাহ'–এর দক্ষিণ আফ্রিকা, সৌদী আরব, ইরাক, মিসর ও আলজিরিয়া অংশের বঙ্গানুবাদ।

পাঠকদের সুবিধার কথা বিবেচনা করে আমরা অনুবাদকে চার ভাগে বিভক্ত করে ভিন্ন ভিন্ন নামে প্রকাশ করছি। এদিক দিয়ে প্রতিটি অনুবাদই একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ ভিন্ন গ্রন্থ। 'ফুরাত নদীর তীরে' এর প্রথম অংশ যাতে রয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা, সৌদী আরব, ইরাক, মিসর ও আলজিরিয়ার ভ্রমণ বৃত্তান্ত। দ্বিতীয় অংশ 'উহুদ থেকে কাসিয়ূন' যাতে সৌদী আরব, জর্দান, সিরিয়া প্রভৃতি দেশের সফরনামা বিবৃত হয়েছে। তৃতীয় অংশ 'হারানো ঐতিহ্যের দেশে' তুর্কিস্তান, সিঙ্গাপুর, ইন্দোনেশিয়া, বাংলাদেশ, কাতার ও চীনের সফরনামা। চতুর্থ অংশ 'অমুসলিম দেশে মুসলিম পর্যটক', এ অংশে ইউরোপ, আমেরিকা, ভারত প্রভৃতি অমুসলিম রাষ্ট্রের সফরনামা বিবৃত হয়েছে।

আমি আমার সাধ্যমত সম্পাদনার চেষ্টা করেছি, তারপরও যদি কোন ভুল–ত্রুটি থেকে যায়, কিংবা কোন অসঙ্গতি কারো দৃষ্টিগোচর হয়, তাহলে আমাদের অবগত করলে পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করে দিব ইনশাআল্লাহ।

আমাদের প্রবল আশা যে, ঐতিহাসিক এ সফরনামা পাঠক মাত্রের অন্তরকেই নাড়া দিবে, উৎসাহিত করবে আমাদের সেই পূর্ব পুরুষের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে, মেহনত ও মুজাহাদার মাধ্যমে পৃথিবীর থেকে শিরক কুফর ও বিদআতের ঘনান্ধকার দূরীভূত করে আবার পৃথিবী একটি সোনালী যুগ উপহার দেওয়ার।

আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে তাঁর সন্তুষ্টির পথে চলার তাওফীক দান করুন। আমীন। ইয়া রাব্বাল আলামীন।

নিবেদক
মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান খান
মাকতাবাতুল আশরাফ
৫০, বাংলাবাজার, ঢাকা–১১০০

২রা জুমাদাল উলা
১৪২২ হিজরী

کس کا خیال کونسی منزل نظر میں ہے؟
صدیاں گزر گئیں کہ زمانہ سفر میں ہے!

বহু শতাব্দী কাল–যমানা
চলছে ভ্রমণ করে,
কোন্ সে মঞ্জিল লক্ষ্য করে
কার বা প্রেমে পড়ে?

সূচীপত্র

॥॥॥

পূর্বকথা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

আমার নিজের দিকে তাকালে আমার 'সফরনামা' লিপিবদ্ধ করার চিন্তাও একপ্রকার পাগলামী মনে হয়। আমার ওয়ালিদ সাহেবের (রহঃ) উক্তি অনুযায়ী—"কোন মশা-মাছি এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় উড়ে গেলে তার 'সফরনামা' কেইবা লিখবে? আর কেনই বা লিখবে?" কিন্তু যখন আমি ১৯৬৩ খৃষ্টাব্দে শ্রদ্ধেয় ভাই জনাব মুহাম্মদ ওলীরাযী সাহেবের সঙ্গে ওমরার সফর করি, তখন সফরনামা লেখার আগ্রহ এ কারণে জন্মে যে, এই বাহানায় হেজাযের পবিত্র স্থানসমূহ ও তার সঙ্গে জড়িত ইতিহাসের চিত্তাকর্ষক ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ করার সুযোগ ঘটবে। বিধায় আমি সর্বপ্রথম সেই সফরনামা অত্যন্ত আবেগ-ঔৎসুক্য নিয়ে বিশদভাবে লিখতে আরম্ভ করি। সত্য তো এই, لذيذ بود حکايت، دراز ترگفتم 'মজার গল্প ছিল তাই দীর্ঘক্ষণ বললাম।'

কিন্তু এ 'সফরনামা' পূর্ণ করা ও তা প্রকাশ করা ভাগ্যে ছিল না। এই সফর থেকে ফেরার পথেই একদিন পানির জাহাজের ডেক থেকে তার পাণ্ডুলিপি এমনভাবে হারিয়ে গেল যে, হাজার খোঁজাখুজি এবং বার বার ঘোষণা করা সত্ত্বেও তা আর পাইনি। এ ঘটনায় মনোবল এতই ভেঙ্গে পড়ে যে, পুনরায় আর তা লিখতে পারিনি। এ কারণেই এই ভ্রমণ কাহিনীতে হেজাযের বিস্তারিত সফরনামা শামিল হয়নি।

এই ঘটনার পর দীর্ঘদিন যাবৎ হেজায ভিন্ন অন্য কোন দেশের উল্লেখযোগ্য কোন সফর করা হয়নি। ফলে সফরনামা লেখার কোন আগ্রহও সৃষ্টি হয়নি। কিন্তু 'মাসিক আল-বালাগ' পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণের পর হতে যে সকল সফর করতে হয়েছে, সেগুলো সম্পর্কে আমার অল্পস্বল্প প্রতিক্রিয়া উক্ত পত্রিকায় লিখতে থাকি। অবশেষে এমন এক সময় এলো, যখন সফর জীবনের অংশে পরিণত হয়ে গেল। ফলে একের পর এক দেশের ও বহির্দেশের সফরের ধারা এমনভাবে শুরু হলো যে, একবার আমার এক বন্ধু আমাকে বলেই ফেললেন যে, এখন তোমাকে Non-Resident Pakistani (পাকিস্তানের অনাবাসিক নাগরিক) সাব্যস্ত করা দরকার।

এ সকল ভ্রমণের সূচনা আলমে ইসলামের এমন সব ভূখণ্ড থেকে হয়েছে, যার সঙ্গে ইসলামী ইতিহাসের অতি মূল্যবান স্মৃতিসমূহ বিজড়িত এবং এ সব ভূখণ্ড দেখার অভিলাষ তখন থেকে মনে লালন

করে আসছিলাম, যখন থেকে ইসলামী ইতিহাস পাঠের হাতে খড়ি হয়েছে। তাই পুনরায় এ সব ভূ-খণ্ডের সফরের ইতিবৃত্ত লিপিবদ্ধ করার আগ্রহ এই কারণে জন্মে যে, এই উসীলায় ইতিহাসের হারিয়ে যাওয়া পৃষ্ঠাগুলো তুলে ধরার এবং অনেক গৌরবময় ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে আলোচনা করার মধুরতা নসীব হবে। সুতরাং আমি ইরাক, মিসর, আলজেরিয়া, জর্দান, সিরিয়া ও তুরস্ক প্রভৃতি রাষ্ট্রের সফরনামা এই আবেগ নিয়েই লিখতে থাকি এবং তা ধারাবাহিকভাবে 'আল-বালাগ' পত্রিকায় প্রকাশ পেতে থাকে।

যদিও বিভিন্ন ব্যস্ততার কারণে এই 'সফরনামা' দৌড়ের উপরই লেখা হয়েছে এবং স্থিরচিত্তে লেখার সুযোগ কমই পেয়েছি। যেহেতু এতে ভ্রমণ বৃত্তান্ত কম এবং ঐতিহাসিক ও ভৌগলিক বিষয়ের আলোচনা বেশী তাই পাঠক সমাজ খুব আগ্রহ নিয়েই এটি পাঠ করেন। সাথে সাথে আমার নিকট এমন পত্রাবলীর স্তূপ জমা হয়, যে সকল পত্রে এই 'সফরনামা'কে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করার প্রস্তাব খুব তাকীদ সহকারে করা হয়।

বক্ষ্যমান গ্রন্থ 'জাহানে দিদাহ' আমার সেই সকল হিতাকাংখীর আদেশ পালন মাত্র। এতে এ পর্যন্ত লিখিত আমার গুরুত্বপূর্ণ সফরনামাগুলো সন্নিবেশিত হয়েছে। এই সফরনামাগুলো সময়ের ক্রমধারায় বিন্যস্ত করা হয়নি, বরং প্রথমে আলমে ইসলামের সফরনামা উল্লেখ করে, পরে অমুসলিম রাষ্ট্রসমূহের সফরনামা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

স্নেহাস্পদ মাওলানা মাহমূদ আশরাফ উসমানী (সাল্লামাহু) এবং স্নেহের ভ্রাতুষ্পুত্র সাউদ আশরাফ উসমানী (সাল্লামাহু) লাহোরে নিজেদের তত্ত্বাবধানে এ গ্রন্থের 'কেতাবাতের' (কম্পোজের) কাজে যে আন্তরিকতা দেখিয়েছে তা উল্লেখ না করলে অকৃতজ্ঞতা হবে। 'কেতাবাতের' কাজ শেষ হওয়ার পর আমার বড় ছেলে স্নেহের ইমরান আশরাফ (সাল্লামাহু) এ বিষয়ে পীড়াপীড়ি করে যে, গ্রন্থের সঙ্গে এর নির্ঘন্ট (Index) থাকাও জরুরী। তাই সে স্নেহের মুহাম্মদ ইয়াহইয়া (সাল্লামাহু)কে সঙ্গে নিয়ে অতি সুন্দররূপে এর নির্ঘন্ট প্রস্তুত করে। যা কিতাবের সঙ্গে সংযোজিত হয়েছে। আল্লাহতা'আলা এই সফরনামাকে পাঠকদের জন্য মনোরঞ্জন, জ্ঞান বৃদ্ধি ও উপকারের উপকরণ বানিয়ে দিন। আমীন।

মুহাম্মাদ তাক্বী উসমানী

১৫ মুহাররম ১৪১০ হিজরী — দারুল উলূম করাচী-১৪

পথের সম্বল

একজন মুসাফির যখন দীর্ঘ কোন সফরে যাত্রা শুরু করে, সে সফর যত আগ্রহ ও উচ্ছাস সহকারেই হোক না কেন, তখন তার হৃদয়ে মিশ্র আবেগ-অনুভূতির এক বিচিত্র অবস্থা সৃষ্টি হয়। পরিবার-পরিজন ও দেশবাসীর বিচ্ছেদ, তাদের সুস্থতা ও নিরাপত্তার চিন্তা, সফরের বিভিন্ন ঘাঁটি অতিক্রমের উদ্বেগ, গন্তব্যস্থলের দূরত্বের উপলব্ধি, নতুন পরিবেশ ও নতুন দেশ সম্পর্কে বিভিন্ন অনুমান ও আশংকা, নিরাপদে ও সাচ্ছন্দে বাড়ী ফেরার ও পরিবার-পরিজনদেরকে সুখ-শান্তিতে ফিরে পাওয়ার আকাংখা, মোটকথা—না জানি এমন কত ধরনের উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার তরঙ্গ-সংঘাতে জর্জরিত অবস্থায় মানুষ বাড়ী থেকে যাত্রা শুরু করে।

বিভিন্ন চিন্তা ও অনুভূতির এই ভীড়ে যে বস্তুটি সর্বদা আমাকে শান্তি ও তৃপ্তি দান করে, মন চায়, সফরনামা শুরু করার পূর্বে উপঢৌকনরূপে তা পাঠক সমাজের নিকট পেশ করি। তাহলো—হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সেইসব পবিত্র ও প্রতিক্রিয়াশীল দু'আ, যা তিনি সফরে যাত্রা করার মুহূর্তে পাঠ করতেন। সত্য কথা এই যে, একজন মুসাফিরের অসংখ্য প্রয়োজনের এমন কোন দিক নেই, যা এই প্রভাবপূর্ণ দু'আর শব্দাবলির মধ্যে প্রবিষ্ট হয়নি। একজন মুসাফিরের মানবিক প্রকৃতি সম্পর্কে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তুলনায় অধিক অবগত আর কে আছে? তাই হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানব প্রকৃতির সে সকল প্রয়োজনের একটি দিকও এই দু'আয় তুলে ধরতে বাদ রাখেননি।

দু'আগুলোর আসল প্রতিক্রিয়া ও তার ভিতর সুপ্ত অর্থসমূহ ও তার অনুভূতির বিশুদ্ধ পরিস্ফুটন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখনিঃসৃত আরবী শব্দমালার মাঝেই হওয়া সম্ভব। কার সাধ্য যে, সে এর অর্থ ও ভাবসমূহ অন্য কোন ভাষায় রূপান্তর করে তবুও মূল বক্তব্য উদ্ধারের জন্য দু'আগুলোর সঙ্গে অর্থও দেওয়া হলো।

দু'আগুলো এই—

দু'আ-১ ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ وَاعْتَصَمْتُ بِاللّٰهِ وَتَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ

অর্থ ঃ আমি আল্লাহর নামে যাত্রা করছি, আল্লাহর সাহায্য গ্রহণ করছি এবং আল্লাহর উপর ভরসা করছি। আল্লাহ ভিন্ন কোন মা'বুদ নেই এবং আল্লাহই সর্ব মহান।

দু'আ-২ ঃ

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الصَّاحِبُ فِى السَّفَرِ وَالْخَلِيْفَةُ فِى الْاَهْلِ وَالْمَالِ وَالْوَلَدِ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! তুমিই আমার সফরের সঙ্গী এবং আমার অনুপস্থিতিতে আমার পরিবার-পরিজন, আমার ধন-সম্পদ ও আওলাদ-ফরজন্দের তুমিই রক্ষক।

দু'আ-৩ ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَاٰبَةِ الْمَنْظَرِ وَ سُوْءِ الْمُنْقَلَبِ فِى الْاَهْلِ وَالْمَالِ وَالْوَلَدِ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার আশ্রয় চাই সফরের কষ্ট-ক্লেশ ও বেদনাদায়ক দৃশ্য হতে এবং মন্দ অবস্থায় আমার পরিবার-পরিজন, ধন-সম্পদ ও আওলাদ-ফরজন্দের নিকট প্রত্যাবর্তন করা হতে।

দু'আ-৪ ঃ

اَللّٰهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا هٰذَا السَّفَرَ وَ اطْوِعَنَّا بُعْدَهٗ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমাদের জন্য এ সফরকে সহজসাধ্য করে দিন এবং এর দূরত্বকে সংকুচিত করে দিন।

দু'আ-৫ ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْأَلُكَ فِىْ سَفَرِىْ هٰذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوٰى وَ مِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضٰى-

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! এই সফরে আমি আপনার নিকট নেকী, তাকওয়া এবং এমন আমলের তাওফীক চাচ্ছি যাতে আপনি সন্তুষ্ট হন।

দু'আ-৬ ঃ

যা সোওয়ারীতে আরোহনকালে পাঠ করতেন—

سُبْحَانَ الَّذِى سَخَّرَلَنَا هٰذَا وَ مَاكُنَّا لَهٗ مُقْرِنِيْنَ وَ اِنَّآ اِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ -

অর্থ ঃ পবিত্র সেই সত্তা, যিনি আমাদের জন্য এই বাহনকে অনুগত করে দিয়েছেন। অথচ আমরা একে অনুগত করার শক্তি রাখি না। নিঃসন্দেহে আমরা আমাদের রবের নিকট প্রত্যাবর্তন করব।

দু'আ-৭ ঃ

নতুন কোন বসতি বা নতুন কোন নগরীতে অবস্থান করার উদ্দেশ্যে প্রবেশ কালে এই দু'আ পাঠ করতেন—

اَللّٰهُمَّ اِنِّى اَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ وَ خَيْرِ اَهْلِهَا وَ خَيْرِ مَا فِيْهَا وَ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّهَا وَ شَرِّ اَهْلِهَا وَ شَرِّ مَا فِيْهَا -

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট এই বসতির, এর অধিবাসীদের এবং এতে বিদ্যমান সকল বস্তুর কল্যাণ কামনা করছি এবং এই বসতি, এর অধিবাসীগণ এবং এতে বিদ্যমান যাবতীয় বস্তুর অনিষ্ট থেকে আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

যদি নয়ন-মন জাগতিক উপকরণের ওপারে দৃষ্টিদানের সামান্যতম যোগ্যতা থেকেও বঞ্চিত হয় তাহলে সেটা ভিন্ন কথা। অন্যথায় একজন মুসাফিরের জন্য এর চেয়ে উৎকৃষ্ট পাথেয় আর কি হতে পারে?

ফুরাত নদীর তীরে

[দক্ষিণ আফ্রিকা, সঊদী আরব ও ইরাক সফর]

সফরকাল ঃ রবিউল আওয়াল ১৪০৫ হিজরী
মোতাবেক নভেম্বর ১৯৮৪ ঈসায়ী

قافلۂ حجاز میں ایک حسینؓ بھی نہیں
گرچہ ہیں تابدار ابھی گیسوئے دجلہ و فرات

দজলা–ফুরাতের উন্মত্ত তরঙ্গমালা আজো উদ্ভাসিত
রয়েছে পূর্বের মতই কিন্তু হেজাযের কাফেলায়
হুসাইনের বড় অভাব।

ফুরাত নদীর তীরে

'সফরের' পুরো মাস এবং 'রবিউল আওয়ালের' কিছুদিন বহির্দেশে ভ্রমণে কাটে। পাঁচ সপ্তাহব্যাপী এই ভ্রমণে কেনিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, সউদী আরব, এবং ইরাক এই চারটি দেশে যাবার সুযোগ ঘটে। এই ভ্রমণের অনেক বিষয়ই পাঠকদের জন্য চিত্তাকর্ষক হবে—এতে সন্দেহ নেই। তাই এর সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও প্রতিক্রিয়া আপনাদের খেদমতে পেশ করছি।

আজ থেকে প্রায় দু' বছর পূর্বে মির্জা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানীর লাহোরী অনুসারীরা কেপটাউন (দঃ আফ্রিকা)এর সুপ্রিম কোর্টে মুসলমানদের বিপক্ষে এই অভিযোগ দায়ের করে যে, এখানকার মুসলমানরা আমাদেরকে তাদের মসজিদে নামায পড়তে এবং তাদের কবরস্থানে আমাদের মৃতব্যক্তির লাশ দাফন করতে বাধা দিয়ে থাকে এবং আমাদেরকে অমুসলিম আখ্যায় আখ্যায়িত করে। অথচ আমরা মুসলমান। এতে করে আমাদের মানহানী হচ্ছে। এ ব্যাপারে আমরা একটি আইনানুগ মোকদ্দমা সুপ্রিম কোর্টে দায়ের করতে চাই। কিন্তু এই মোকদ্দমার রায় হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত মুসলমানদের উপর সাময়িক নিষেধাজ্ঞা জারী করা হোক। যেন তারা এর মধ্যবর্তী সময়ে আমাদেরকে কাফের বলা থেকে এবং মসজিদ ও কবরস্থানসমূহ আমাদের জন্য নিষিদ্ধ করা থেকে বিরত থাকে। সে সময় সেখানকার সুপ্রিম কোর্ট এ জাতীয় একটি সাময়িক নিষেধাজ্ঞা জারিও করেছিল।

এই নিষেধাজ্ঞা তথ্য–প্রমাণের ভিত্তিতে অকাট্য প্রমাণ করার পর্যায় এলে সেখানকার মুসলমানদের আহবানে পাকিস্তান থেকে একটি প্রতিনিধি দল তাদের সাহায্যের জন্য যায়। তার মধ্যে আমি অধম লেখকও শামিল ছিলাম। আল্লাহর অপার অনুগ্রহে এ পর্যায়ে আদালত তার নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে নিয়ে মুসলমানদের পক্ষে রায় দেয়। যার বিস্তারিত ইতিবৃত্ত দু' বছর পূর্বে 'আল–বালাগ' পত্রিকার ১৪০৩ হিঃ সনের 'মুহররম' ও 'সফর' সংখ্যায় লিখেছি।

অতঃপর কাদিয়ানীরা সুপ্রিম কোর্টে মূল মোকদ্দমা দায়ের করে। সেখানকার বিচার বিভাগের কার্যধারা অনুযায়ী অভিযোগ, অভিযোগের

উত্তর এবং উভয় দলের পক্ষ হতে তাদের লিখিত ব্যাখ্যা প্রদান করতে প্রায় দুই বছর সময় লেগে যায়। অবশেষে ১লা নভেম্বর ১৯৮৪ ঈসায়ী মোকদ্দমা শুনানীর তারিখ ধার্য হয়।

এই মোকদ্দমার বিভিন্ন অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য পাকিস্তানে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছিল। এই পর্যায়ে কেপ টাউনের মুসলমানগণ এই কমিটি বরাবর পুনরায় আবেদন করেন যে, এই কমিটি যেন মোকদ্দমা শুনানীর নির্দিষ্ট তারিখের কিছুদিন পূর্বে সেখানে পৌছে তাদের সহযোগিতা করেন। এবং এমন দক্ষ সাক্ষীর ব্যবস্থাও করেন যারা প্রয়োজনের মুহূর্তে মুসলমানদের পক্ষ থেকে সাক্ষ্য দিতে সক্ষম। তাই এখান থেকে 'রাবেতা আল-আলম আল-ইসলামী'র ব্যবস্থাপনায় এবং জনাব মাওলানা জাফর আহমদ আনছারীর নেতৃত্বাধীনে এগার সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রতিনিধিদল প্রস্তুত করা হয়। এই প্রতিনিধি দলের মধ্যে দলীয় প্রধান এবং অধম লেখক ব্যতীত জনাব জাষ্টিস (অবঃ) মুহাম্মদ আফজাল চীমা সাহেব, জনাব রিয়াযুল হাসান জিলানী ডেপুটি এটর্নি জেনারেল পাকিস্তান, জনাব মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ লুধিয়ানভী, জনাব আল্লামা খালেদ মাহমূদ, জনাব মাওলানা আবদুর রহীম আশআর, জনাব হাজী গিয়াস মুহাম্মদ সাহেব সাবেক এটর্নি জেনারেল পাকিস্তান, জনাব প্রফেসর খোরশেদ আহমাদ সাহেব, জনাব ডঃ জাফর ইসহাক আনছারী এবং জনাব প্রফেসর মাহমূদ আহমদ গাজী সাহেব অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

২৫শে অক্টোবর বিকেল পাঁচটায় আমরা পি.আই.এ-এর প্লেনে করাচী থেকে যাত্রা করি। আবুধাবীতে এক ঘন্টা বিরতির পর রাত্রি ১১টায় নাইরোবী পৌছি। নাইরোবীতে রাত্রি কাটিয়ে ভোর সাতটায় বৃটিশ এয়ারওয়েজের প্লেনে পুনরায় যাত্রা করি। এবং স্থানীয় সময় দুপুর এগারটায় জোহান্সবার্গ পৌছি। জোহান্সবার্গে জমিয়তে উলামায়ে ট্রান্সুয়ালের পৃষ্ঠপোষক মাওলানা ইবরাহীম মিয়া ও তাঁর সঙ্গীগণ এবং অন্যান্য বন্ধুরা অভ্যর্থনা জানান। জুমআর নামাযের সময় নিকটবর্তী হওয়ায় প্রথমে জুমআর নামায আদায় করা জরুরী ছিল। সুতরাং মেজবানদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রতিনিধিদলের সদস্যদেরকে বিভিন্ন দলে

বিভক্ত করে বিভিন্ন মসজিদে পাঠানো হয়। আমি অধম লেখক কর্ক ষ্ট্রিটের মসজিদে জুমআর নামায পড়াই। এবং সেখানে ইংরেজীতে সংক্ষিপ্ত ভাষণও প্রদান করি।

জুমআর নামাযের পর প্রতিনিধি দলের সকল সদস্য মাওলানা ইবরাহীম মিয়া পরিচালিত মাদ্রাসা ও ইসলামী কেন্দ্র 'ওয়াটারফাল ইসলামিক ইন্সটিটিউটে' উপস্থিত হয়। সেখানে সকলে রাত অতিবাহিত করি। আমি এ সময়ে ইন্সটিটিউটের গ্রন্থাগার থেকে জ্ঞান আহরণ করতে থাকি। মাওলানা সাহেব এখানের এই সুদূর অঞ্চলে জ্ঞানশীর্ষক গ্রন্থসমূহের বেশ বড় ভাণ্ডার গড়ে তুলেছেন। সম্ভবতঃ এটি দক্ষিণ আফ্রিকাতে দ্বীনী কিতাবের সর্বোৎকৃষ্ট ভাণ্ডার।

২৭শে অক্টোবর সকাল দশটায় জোহান্সবার্গ থেকে যাত্রা করে আকাশ পথে দুই ঘন্টা চলার পর দুপুর ১২টায় কেপটাউনের বিমান বন্দরে পৌছি। যদিও দক্ষিণ আফ্রিকায় গ্রীষ্ম আসি আসি করছিল, তবুও আবহাওয়া খুব মনোরম এবং আমাদের জন্য কিছুটা শীতল ছিল। বিমান বন্দরে কেপটাউনের মুসলমানদের বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিনিধিগণ এবং বিরাট সংখ্যক মুসলিম জনতা অভ্যর্থনার জন্য উপস্থিত ছিলেন। তারা প্রতিবারের মত এবারেও তাদের ঐতিহ্যবাহী মেহমানদারীর অসাধারণ চিত্র হৃদয়ে অংকন করেন।

পূর্ব হতে ১লা নভেম্বর ১৯৮৪ ঈসায়ী মামলার তারিখ নির্ধারিত ছিল, কিন্তু বাদীর পক্ষ থেকে অতিরিক্ত চার দিন সময় চাওয়ায় আদালত সময় দিয়ে দেয়। ফলে ৪ঠা নভেম্বর মোকদ্দমা আরম্ভ হয়। মোকদ্দমার প্রথম দিনের শুনানীর জন্য কেপটাউন শহরের বাইরে শহরতলীর একটি আদালতকে নির্বাচন করা হয়। আদালতটি শহর থেকে প্রায় ত্রিশ মাইল দূরে অবস্থিত। মোকদ্দমার সঙ্গে মুসলিম জনসাধারণের এমন আন্তরিকতা ছিল যে, তারা কাকডাকা ভোর থেকে সেখানে পৌছতে আরম্ভ করেন।

যখন মোকদ্দমা শুরু হয় তখন শুধুমাত্র হলকক্ষই জনাকীর্ণ ছিল না বরং রাস্তায়ও তিল ধারণের জায়গা ছিল না। সম্মুখের বারান্দাতেও মুসলমানগণ কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়িয়ে তাকে জনসমুদ্রের রূপ দিয়েছিলেন। শুরুতে মুসলমান পক্ষের মাননীয় উকিল ইসমাঈল

মুহাম্মাদ সাহেব আদালত বরাবর দরখাস্ত করেন যে, মূল মোকদ্দমার কার্য আরম্ভ করার পূর্বে তিনি এ বিষয়ে আলোচনা করতে চান যে, এ মোকদ্দমার শুনানী এই আদালতের জন্য যথার্থ নয়। বিচারক সাহেব এ বিষয়ে আলোচনা করার বৈধতার দলীল উকিল সাহেবের নিকট তলব করেন। তখন তিনি এ বিষয়ে যুক্তি প্রমাণ পেশ করেন। পরে বিচারক সাহেব বাদীপক্ষের উকিল মিঃ ফার্লামের নিকট এ বিষয়ে তার মতামত জানতে চান। উত্তরে তিনি বলেন, মিঃ ইসমাইল মুহাম্মদ এ বিষয়ে আলোচনা করতে চাইলে আমার কোন আপত্তি নেই। তবে তাঁর আলোচনা সাক্ষী ছাড়া শুধু আলোচনাই হতে হবে। বিচারক সাহেব বললেন, প্রাথমিক এই আইনী ধারার উপর আলোচনা শোনা হবে কিনা, এ বিষয়ের ফয়সালা আমি আগামীকাল শোনাব। এ কথার উপর সেদিনের কার্যক্রম শেষ হয়।

পরদিন বিচারক সাহেব এই সিদ্ধান্ত দেন যে, মিঃ ইসমাঈল মুহাম্মাদকে প্রাথমিক ধারা নিয়ে আলোচনা করার অনুমতি দেওয়া হল। তবে তিনি তাঁর ধারা প্রমাণে শুধু বক্তব্য পেশ করবেন, কোন সাক্ষ্য পেশ করবেন না। এর ভিত্তিতে মিঃ ইসমাঈল মুহাম্মদ তার দাবীর পক্ষে বিকাল পর্যন্ত যুক্তি–প্রমাণ পেশ করতে থাকেন। মাশাআল্লাহ! তাঁর বক্তব্য এত প্রামাণ্য, গভীর, উদ্ধৃতিতে পরিপূর্ণ এবং উপস্থাপনার দিক থেকে এতই যাদুকরী ছিল যে, সারাদিন পার হয়ে যায়, কিন্তু সময়ের কথা মনেই হয়নি। মোকদ্দমার জন্য এ রকম পরিপূর্ণ প্রস্তুতি এবং তা উপস্থাপন করার এমন চিত্তাকর্ষক ও সুবিন্যস্ত পদ্ধতি প্রয়োগ করার ক্ষমতা খুব কম মানুষেরই ভাগ্যে জোটে।

৬ই নভেম্বর ১৯৮৪ ঈসায়ী বিপক্ষের এ্যাডভোকেট মিঃ ফার্লাম মিঃ ইসমাঈল মুহাম্মাদের প্রমাণাদির উত্তর দিতে শুরু করেন। তিনি তাঁর বক্তব্যে বিভিন্ন আইনী ধারা তুলে ধরে পেশাভিত্তিক দক্ষতার প্রমাণ দিয়ে বিশদ আলোচনা করেন। যা বিকাল তিনটা পর্যন্ত চালু থাকে। অতঃপর মিঃ ইসমাঈল মুহাম্মাদ প্রায় এক ঘন্টাব্যাপী উত্তরমূলক বক্তব্য পেশ করে মিঃ ফার্লামের আপত্তিসমূহের ধারাক্রমে আকর্ষণীয় উত্তর প্রদান করেন। পরিশেষে বিচারক সাহেব জানালেন, তিনি এ সকল প্রাথমিক আইনী ধারার ভিত্তিতে তার সিদ্ধান্ত সংরক্ষণ করছেন, এরপর আদালত বরখাস্ত হয়ে যায়।

এখন বাহ্যত পরিস্থিতি এই যে, এ সকল প্রাথমিক ধারার ভিত্তিতে আদালতের রায় জানুয়ারী ১৯৮৫ ঈসায়ীর মধ্যে প্রকাশ পাবে। যদি আদালত মিঃ ইসমাঈল মুহাম্মাদের ধারার সঙ্গে একমত পোষণ করে এবং এই সিদ্ধান্ত দেয় যে, আদালতের জন্য এই বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনায় যাওয়া যথার্থ হবে না, তাহলে কাদিয়ানীদের আবেদন শুনানীর অযোগ্য হয়ে খারেজ হয়ে যাবে। আর সিদ্ধান্ত যদি এই মোকদ্দমা শুনানীর পক্ষে হয়, তাহলে মোকদ্দমা বিস্তারিতভাবে চলতে থাকবে। সেক্ষেত্রে দীর্ঘদিন উভয় পক্ষের সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণের প্রয়োজন পড়বে।

মোকদ্দমা ও তার অতিরিক্ত প্রস্তুতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা বেঁচে থাকলে এবং যথার্থ মনে হলে মোকদ্দমার চূড়ান্ত রায় হওয়ার পর তুলে ধরব ইনশাআল্লাহ। তবে কেপটাউনে একপক্ষকাল সময় অবস্থান কালে সে অঞ্চলের মুসলমানদের দীনী জোশ–জজবার উল্লেখযোগ্য ও শিক্ষণীয় চিত্র হৃদয়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। কেপটাউনকে দক্ষিণে পৃথিবীর শেষ প্রান্ত মনে করা হয়। এই সুদূর অঞ্চলে, যা বহু শতাব্দী পাশ্চাত্য জাতির অধীনে ছিল, ফলে সেখানের প্রতিটি ক্ষেত্রে ধর্মহীনতা, ভোগ–বিলাস, অশ্লীলতা ও উলঙ্গপনার উপকরণাদি সর্বদা তৎপর, তা সত্ত্বেও এ সকল মুসলমান সেখানে তাদের ধর্মীয় ঐতিহ্যসমূহকে অনেকটাই সামলে রেখেছেন। সংখ্যালঘু হওয়া সত্ত্বেও তারা তাদের ধর্মীয় স্বাতন্ত্র বজায় রাখার জন্য জানবাজি রেখেছেন। কোন সময় ধর্মীয় কোন বিষয়ে সামান্য আঘাত আসলে তাদের যে অস্থিরতা সৃষ্টি হয়, তা দেখার মত।

এবারের মোকদ্দমার সময়েও দেশের তিন প্রদেশ ট্রান্সুয়াল, নেটাল এবং কেপ থেকে মুসলমানদের প্রতিনিধিগণ কেপটাউনে একত্রিত হন। তাদের মাঝে বিদ্যমান পারস্পরিক সহযোগিতার ঈর্ষণীয় আবেগ খোলা চোখে অনুভব করা যায়।

দ্বীনের নিখাদ জজবা সহকারে তারা পাকিস্তানী প্রতিনিধিদলের জন্য

যেমন করে নয়ন–মন বিছিয়ে দিয়েছেন এবং যেই ভালবাসা ও উষ্ণ আবেগের আচরণ করেছেন তা আমাদের সকলের জন্য এক অবিস্মরণীয় স্মৃতি হয়ে থাকবে।

কেপটাউন পৃথিবীর সুন্দরতম স্থানসমূহের অন্যতম। এখানে সমুদ্র, পাহাড়, ঝিল এবং সবুজ প্রান্তর সর্বপ্রকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বিদ্যমান। এই শহরের দক্ষিণেই প্রায় ৭০/৮০ কিঃ মিঃ দূরে সেই প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক টিলা রয়েছে, যাকে উর্দূতে 'রা'সে উম্মীদ' আরবীতে 'রা'সুররজা আচ্ছালেহ' ইংলিশে 'কেপ অব গুড হোপ' (উত্তম আশার চূড়া) বলা হয়। এটি দক্ষিণে পৃথিবীর জনবসতির শেষপ্রান্ত। এখান থেকেই ভাস্কদাগামা ভারতের পথ আবিস্কার করে। এখানেই পৃথিবীর দুই মহাসাগর আটলান্টিক মহাসাগর ও ভারত মহাসাগরের সেই সংগমস্থল ও চিত্তাকর্ষক দৃশ্য বিদ্যমান। যাকে পবিত্র কুরআন এভাবে উল্লেখ করেছে—

مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ - بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَّا يَبْغِيَانِ - (سورة الرحمن ١٩-٢٠)

অর্থাৎ, "তিনি পাশাপাশি দুই দরিয়া প্রবাহিত করেছেন। উভয়ের মাঝখানে রয়েছে এক অন্তরাল, যা তারা অতিক্রম করে না।"

ইতিপূর্বেও এখানে এসেছিলাম, কিন্তু তখন আবহাওয়া মেঘাচ্ছন্ন থাকার কারণে সাগরদ্বয়ের মধ্যবর্তী রেখা স্পষ্ট ছিল না।

এবার আবহাওয়া পরিচ্ছন্ন ছিলো, যার দরুন সেই পার্থক্য রেখা অনেক মাইল দূর পর্যন্ত দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল। পবিত্র কুরআন যাকে 'বাইনাহুমা বারযাখুল লা ইয়াব গিয়ান' বলেছে। এবং যা দেখে মানুষ স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে বলে উঠে— فَتَبَارَكَ اللّٰهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ অর্থাৎ, অতি মহান সুন্দরতম স্রষ্টা আল্লাহ।

সৌদী আরব

কেপটাউনের মোকদ্দমার কাজ থেকে অবসর হওয়ার পর জোহান্সবার্গ এবং আজাদবেলে একদিন অবস্থান করতে হয়। সেখানে পুরাতন বন্ধুদের সাথে সাক্ষাৎ ঘটে। ১৯৮৪ সালের ১১ই নভেম্বর বিকেলে ফিরতি পথে নাইরোবীর দিকে যাত্রা করি। রাত বারটায় নাইরোবী পৌছি।

সেখানে দুই ঘন্টা সময় ভি.আই.পি লাউঞ্জে কাটে। রাত্রি দু'টায় সৌদী এয়ারলাইন্সের প্লেনযোগে জেদ্দায় রওনা হই। সকাল সাতটার কাছাকাছি সময়ে জেদ্দা এয়ারপোর্টে প্লেন অবতরণ করে। এখানে রাবেতা আল–আলম আল–ইসলামীর প্রকৌশল অফিসার প্রতিনিধি দলকে স্বাগত জানানোর জন্য উপস্থিত ছিলেন। জেদ্দায় কয়েক ঘন্টা অবস্থান করার পর, পবিত্র মক্কা অভিমুখে যাত্রা করি এবং জোহর নামাযের বেশ পূর্বে পবিত্র মক্কায় পৌছি। আমরা নামাযের পূর্বেই ওমরা আরম্ভ করি। এবং নামাযান্তে তা শেষ হয়। দেড় বছর পর অধমের এখানে উপস্থিত হওয়ার সুযোগ ঘটল। আরেকবার এ কথার অনুভূতি হলো যে, এখানকার অবস্থা 'দেখার ! শোনার নয়'। আবহাওয়া খুব মনোরম ছিল। ভীড়ও ছিল কম। আল্লাহ তাআলা অত্যন্ত শান্ত ও এতামনানের সঙ্গে সেখানে হাজিরা দানের সৌভাগ্য প্রদান করেন। নিজের দূরাবস্থার প্রতি লক্ষ্য করে প্রতিবারের মত এবারও সর্বদা এই চিন্তা লেগে থাকে—(কবিতা)

کهاں میں؟ اور کهاں یه نکهت گل؟

نسیم صبح! تیری مهربانی

আমি অধম কি করে ফুলের সৌরভ পাই?
হে ভোরের মৃদুমন্দ বায়ু! এ তোমারই অনুকম্পা।

আল্লাহ তাআলা এ স্থানকে যে মর্যাদা দান করে নিজের অফুরন্ত নূর ও তাজাল্লীর অবতরণস্থল বানিয়েছেন, এর উচ্চ মর্যাদার দাবী তো ছিল, আমাদের মত পাপীদেরকে এখানে চোখের পাতা ফেলারও অনুমতি না দেওয়া। কিন্তু এটা সেই মহান আল্লাহর দয়া এবং রহমাতুল্লিল আলামীন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বদান্যতা যে, আমাকে বারবার এখানে হাজির হওয়ার সুযোগ প্রদান করা হয়। আল্লাহ তাআলা আমার এ হাজিরাকে একনিষ্ঠভাবে তাঁরই সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে করে দেন। এবং তাঁর মহান দরবারে কবুলিয়াতের মর্যাদায় ভূষিত করেন। আমীন, 'সুম্মা আমীন।

মক্কা মোকাররমায় একদিন অবস্থান করে, পরের দিন মদীনা তায়্যিবাতে যাত্রা করি। মক্কা মোকাররমা থেকে মদীনা তায়্যিবা যাওয়ার

জন্য সম্প্রতি যে নতুন সড়ক এ বৎসরই নির্মাণ করা হয়েছে, তা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হিজরতের পথ দিয়ে অতিক্রম করে 'কোবার' দিক দিয়ে মদীনা তায়্যিবায় প্রবেশ করেছে। তাই এর নাম দিয়েছে 'তরিকুল হিজরা'। এই সড়কের ফলে দূরত্বও কমে এসেছে। দ্বিমুখী প্রশস্ত হাইওয়ে হওয়ার কারণে ভ্রমণও দ্রুত হয়েছে। রাস্তায় অধিক বিরতি না হলে প্রায় চার ঘন্টাতেই মানুষ মদীনায় পৌছতে সক্ষম হয়। আমরা যখন মদীনায় পৌছি, তখন এশার আযান হচ্ছিল। সামানাপত্র গাড়ীতে রেখেই নামাযে শরীক হই। মসজিদে নববীর নূরানী পরিবেশ এবং শায়েখ হুজাইফীর সাদাসিধা অথচ অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী কুরআন তেলাওয়াতের কারণে মনে হচ্ছিল যেন বিশ্ব চরাচরের প্রতিটি অণুকণা পবিত্র কুরআনের নূরে আলোকিত এবং তার তেলাওয়াতের আনন্দে পুলকিত।

প্রতিনিধিদলের অন্যান্য সঙ্গীগণ পরের দিন ফিরতি পথে মক্কা মোকাররমা হয়ে পাকিস্তান চলে যান। ১৮ই নভেম্বর ইসলামী 'ফেকাহ একাডেমী'র সম্মেলনে আমার অংশগ্রহণের প্রোগ্রাম থাকায় আমার আরো কিছুদিন মদীনা তায়্যিবাতে অবস্থান করার সৌভাগ্য নসীব হয়। এ দিনগুলো যে অবস্থায় অতিবাহিত হয়, তা হযরত ওয়ালিদ সাহেবের ভাষায়—(কবিতা)

پھر پیشِ نظر گنبدِ خضرا ہے، حرم ہے
پھر نامِ خدا، روضۂ جنت میں قدم ہے
پھر منتِ دربان کا اعزاز ملا ہے
یہ اُن کا کرم، اُن کا کرم، اُن کا کرم ہے

অর্থ ঃ মসজিদে নববীর সবুজ গম্বুজ ও হারামে নববী আমার সম্মুখে, তাই আল্লাহর নাম নিয়ে জান্নাতের এ রওযায় পা রাখি। তারপর দ্বাররক্ষকের নিকট সনির্বন্ধ প্রার্থনা করার সম্মানে ভূষিত হই। এ তারই অনুকম্পা....। তারই অনুকম্পা......। তারই অনুকম্পা......।

পাঁচদিন পর লজ্জা ও অনুতাপের এই অনুভূতি সহ পবিত্র মদীনা থেকে বিদায় হই যে, এই মহামূল্যবান মুহূর্তগুলো—যা শুধুমাত্র আল্লাহ পাকের রহমতেই ভাগ্যে জুটেছিল—তার সঠিক মর্যাদা ও মূল্য অনুধাবন করে উপযুক্ত ক্ষেত্রে ব্যয় করতে পারিনি। তার পক্ষ থেকে রহমতের বারি বর্ষণে কোন কমতি ছিল না। কিন্তু মাটিতে সে বারি আহরণের যোগ্যতাই না থাকলে রহমতের কি দোষ? তবে তারই দয়ায় আশা বেঁধে আছি যে, যখন তিনি ফয়েজ-বরকতের এ উৎসে উপস্থিত হওয়ার তাওফিক দিয়েছেন, তখন তিনি এ সকল আযোগ্য হতভাগাদেরকে বঞ্চিত করবেন না—ইনশাআল্লাহ।

ইসলামী ফেকাহ একাডেমী

'তানজীমে ইসলামী কনফারেন্স' মুসলিম দেশসমূহের সেই একক সংগঠন যা বিগত কয়েক বৎসর যাবৎ আলমে ইসলামের একটি সম্মিলিত প্লাটফরমের কাজ করে আসছে। এ সংগঠনের অধীনে বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রপ্রধানদের কনফারেন্স এবং মুসলমান পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের কনফারেন্সসমূহ অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এবং তা মুসলিম দেশগুলোকে একত্রে বসে চিন্তা-ভাবনা করার সুযোগ করে দেয়, যা অনৈক্য ও বিশৃংখলার বর্তমান আবহাওয়ায় অতি বড় গনীমত। তাছাড়া এ সংগঠন—জেদ্দায় যার হেড কোয়ার্টার—এমন অনেক সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেছে, যার অধীনে মুসলিম দেশগুলো জীবনের বিভিন্ন শাখায় পারস্পরিক সহযোগিতা ও সম্মিলিতভাবে কাজ করে যাচ্ছে। আল্লাহর শুকরিয়া বিজ্ঞান, অর্থনীতি, ব্যবসা ও যোগাযোগ প্রভৃতি শাখায় পারস্পরিক সহযোগিতা ক্রমান্বয়ে প্রসার লাভ করছে।

আজ থেকে তিন বছর পূর্বে যখন তায়েফে মুসলিম দেশ প্রধানদের কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়, তখন বাদশাহ খালেদ মরহুম প্রস্তাব পেশ করেন যে, 'তানজীমে ইসলামী কনফারেন্সের' এমন একটি 'মাজমাউল ফিকহিল ইসলামী' (ইসলামী ফেকাহ কমিটি) প্রতিষ্ঠা করা দরকার। যার মধ্যে আলমে ইসলামের বিজ্ঞ ও সেরা উলামাগণ পরস্পর শলাপরামর্শ করে এবং সম্মিলিতভাবে ফেকাহ সংক্রান্ত এমন সকল সমস্যা নিয়ে

গবেষণা করবে, যেগুলো আন্তর্জাতিক গুরুত্ব রাখে। এমনিভাবে তারা ফেকাহ শাস্ত্রের পুরাতন ভাণ্ডারকে নতুন আঙ্গিকে তুলে ধরবেন। এর দ্বারা উপকৃত হওয়াকে সহজসাধ্য করবেন।

এই প্রস্তাব অনুসারে 'তানজীমে ইসলামী কনফারেন্স ফেকাহ একাডেমী' প্রতিষ্ঠা করার সিদ্ধান্ত নেয়। এবং তার নীতিমালা নির্ধারণের জন্য একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত করে। সেই সম্মেলনে একাডেমীর সংবিধানের পাণ্ডুলিপি প্রস্তত করা হয়, যা কয়েক পর্যায় অতিক্রম করে গতবছর গৃহীত হয়।

এই সংবিধানের দৃষ্টিতে একাডেমীর সদস্যপদের জন্য সদস্যকে ইসলামী ফেকাহ সম্পর্কে পারদর্শী এবং আরবী ভাষায় মনোভাব প্রকাশের যথার্থ শক্তির অধিকারী হওয়া আবশ্যক। এই সংবিধানে এও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, সমস্ত ইসলামী দেশ থেকে এরূপ যোগ্যতার অধিকারী ব্যক্তিদের মধ্যে হতে একজন করে সদস্য নেওয়া হবে। সকল দেশ থেকে তাদের নামের প্রস্তাব আসার পর একাডেমীর প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হবে। সেই অধিবেশনে পরস্পর আলোচনার মাধ্যমে একাডেমীর কর্মপদ্ধতি নির্ধারণ করা হবে। এ পর্যায়ে বিভিন্ন ইসলামী দেশ এবং সংখ্যালঘু মুসলিম দেশগুলো থেকে অধিক সদস্য মনোনীত করা যাবে। সুতরাং ২০শে নভেম্বর ১৯৮৪ ঈসায়ী 'মাজমাউল ফিকহিল ইসলামী'র প্রথম অধিবেশনের তারিখ নির্ধারণ করা হয়। পাকিস্তান থেকে অধমের নাম সদস্যরূপে প্রস্তাব করা হয়। তাই আমি ১৯শে নভেম্বর মদীনা তায়্যিবা থেকে মক্কা মোকাররমায় চলে আসি।

২০ নভেম্বর সকালে 'মাজমাউল ফিকহিল ইসলামী'র প্রথম উদ্বোধনী অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। বাদশা ফাহাদের প্রতিনিধিরূপে মক্কা মোকাররমার আমীর—মাজেদ বিন আবদুল আজিজ এতে সভাপতিত্ব করেন। তানজীমে ইসলামী কনফারেন্সের সেক্রেটারী জেনারেল জনাব হাবীব শাত্তী, 'রাবেতা আল–আলম আল–ইসলামীর' জেনারেল সেক্রেটারী শেখ উমর আবদুল্লাহ আন নাসীফ এবং 'মাজমাউল ফিকহিল ইসলামী'র প্রস্তাবিত সেক্রেটারী জেনারেল শেখ হাবীববলখুজাও (যিনি তিউনিসিয়ার বিশিষ্ট আলেমদের অন্যতম) মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন। তাদের সকলের

উদ্বোধনী ভাষণের পর এ অধিবেশন সমাপ্ত হয়।

এরপর 'মাজমাউল ফিকহিল ইসলামী'র সভাপতি, তিনজন সহ–সভাপতি এবং কার্যকরী পরিষদের সদস্য নির্বাচনের পালা। তাই বিকেলের অধিবেশনে নিম্নে উদ্ধৃত মনোনয়ন গৃহীত হয়—

১. সভাপতি ঃ

শেখ বকর আবু জায়েদ
উকিল ওজারাতুল আদল (সৌদী আরব)।

২. সহ–সভাপতি ঃ

(ক) ডঃ আবদুস সালাম আবাদী (জর্দান)।
(খ) ডঃ আবদুল্লাহ ইবরাহীম (মালয়েশিয়া)।
(গ) আলহাজ সাইয়েদ আবদুর রহমান বাহ (গিনিয়া)।

সংবিধানের ধারানুযায়ী কার্যকরী পরিষদ ছয় সদস্য বিশিষ্ট হওয়ার কথা, তাই একাডেমীর সেক্রেটারী জেনারেল ব্যতীত (যিনি পদাধিকার বলে কার্যকরী পরিষদের সদস্য) নিম্নলিখিত ছয় সদস্য বিশিষ্ট কার্যকরী পরিষদ গঠন করা হয়—

১. ডঃ সালেহ তাওগ—আ'মীদ–কুল্লীয়াতুশ্ শরইয়্যাহ, মরমারা ইউনিভার্সিটি (তুরস্ক)।
২. মুহাম্মাদ তাকী উসমানী (পাকিস্তান)।
৩. উস্তাদ সাইয়েদ রাওয়ান ভাই, মুদীর—আল মা'হাদুল ইসলামী (ডকার, সেনেগাল)।
৪. সাইয়েদ মুহাম্মাদ ইউসুফ জিরী—উপসাগরীয় রাষ্ট্রসমূহে মালের রাষ্ট্রদূত (মালে)।
৫. উস্তাদ আজীল জাসেম আন্ নাশামী, আমিদ—কুল্লিয়াতুশ্ শরীয়াহ কুয়েত (কুয়েত)।
৬. উস্তাদ আবদুর রহমান শাইবান, ধর্মবিষয়ক মন্ত্রী (আলজিরিয়া)।

চলতি সম্মেলনের মূল লক্ষ্য ছিল 'মাজমাউল ফিকহিল ইসলামী'র কর্মের পরিধি ও কর্ম পদ্ধতি নির্ধারণ করা। যেন আগামীতে সে অনুযায়ী কাজ শুরু করা যায়। সুতরাং সংবিধান অনুযায়ী একাডেমীর বিভাগ ত্রয়ের জন্য তিনটি কমিটি গঠন করা হয়। (১) পরিকল্পনা বিভাগ , (২)

গবেষণা ও আলোচনা বিভাগ, (৩) ইফতা বিভাগ।

লেখক তৃতীয় কমিটির অন্তর্ভুক্ত হয়। পরের দিন সারাদিন এর অধিবেশনসমূহ চলতে থাকে। আমি অধম এই বিভাগের কর্মপরিধি ও কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে নিম্নলিখিত প্রস্তাবসমূহ পেশ করি—

১. একাডেমীর পক্ষ থেকে কোন ফতোয়া জারী করার পূর্বে আলমে ইসলামের যারা একাডেমীর সদস্য নয় এমন সকল কেন্দ্র থেকে সংশ্লিষ্ট মাসআলার ব্যাপারে বিস্তারিত ফতোয়া তলব করা হবে। এবং আলমে ইসলামের দক্ষ উলামায়ে কেরামের ফতোয়া ও তার প্রমাণাদি সামনে আসার পর একাডেমীর পক্ষ থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

২. যে সমস্ত মাসআলার সম্পর্ক মুসলমানদের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনের সঙ্গে রয়েছে, সেগুলো সম্পর্কে চূড়ান্ত কোন ফতোয়া জারী করার পূর্বে, সংশ্লিষ্ট জ্ঞানে দক্ষ ব্যক্তিদের নিকট থেকে সঠিক পরিস্থিতির অনুধাবনে সাহায্য নেওয়া হবে।

৩. চার মাযহাবের ফতোয়া সংক্রান্ত যে সকল গ্রন্থ এখনো পর্যন্ত হস্তলিপিরূপে রয়েছে বা কখনো প্রকাশিত হলেও এখন তা দুষ্প্রাপ্য—একাডেমীর পক্ষ থেকে সেগুলো প্রকাশ করার ব্যবস্থা করা।

৪. ফেকাহ ও ফতোয়ার প্রকাশিত গ্রন্থসমূহের ক্রমধারা ও বিন্যাস আধুনিক পদ্ধতিতে করা।

৫. গুরুত্বপূর্ণ সকল ফিকাহর কিতাবের বিস্তারিত সূচীপত্র ও নির্ঘন্ট প্রস্তুত করার ব্যবস্থা করা। যার মাধ্যমে এ সকল কিতাব দ্বারা উপকৃত হওয়া এবং তা থেকে মাসআলা আহরণ করা সহজ হবে।

এ সকল প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। এবং একাডেমীর সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

পরবর্তীতে কমিটি ত্রয়ের সম্মিলিত অধিবেশন হয়। সেখানে প্রত্যেক কমিটির প্রস্তাবাবলী সম্পর্কে সম্মিলিত চিন্তা–ভাবনা করা হয়। যে বিষয়গুলোর পুনরাবৃত্তি ঘটেছে তা বাদ দেওয়া হয়। অতঃপর বিভাগ ত্রয়ের একটি পূর্ণাঙ্গ সংবিধান প্রস্তুত করা হয়। সংবিধানের সারকথা এই যে, ইসলামী ফেকাহ একাডেমী নিম্নলিখিত কর্মসমূহ সম্পাদন করবে—

১. ফেকাহর যে সকল মাসআলার সঙ্গে পুরা আলমে ইসলামের

সম্পর্ক রয়েছে, তার উপর গবেষণামূলক গ্রন্থ প্রণয়ন ও প্রবন্ধ প্রস্তুত করা।

২. ফিকাহর একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ বিশ্বকোষ প্রস্তুত করা। যার মধ্যে ফিকাহভিত্তিক সকল মাযহাবের বিস্তারিত আলোচনা, তার মূল প্রামাণ্য উৎস থেকে বিবৃত হবে, এবং ইতিপূর্বে প্রস্তুতকৃত সকল অসম্পূর্ণ বিশ্বকোষ পূর্ণাঙ্গ করা।

৩. যে সকল ফেকাহ গ্রন্থ অদ্যাবধি মুদ্রিত হয়নি বা দুষ্প্রাপ্য, তা যাচাই–বাছাই করে প্রকাশ করার ব্যবস্থা করা।

৪. প্রাচীন ফেকাহ গ্রন্থগুলো আধুনিক পদ্ধতিতে ক্রমনির্ধারণ, বিন্যাস ও সংশোধন করে প্রকাশ করার ব্যবস্থা করা।

৫. ফেকাহর প্রামাণ্য উৎসসমূহের বিস্তারিত সূচীপত্র ও নির্ঘন্ট প্রস্তুত করা। যার দ্বারা ফেকাহ সংক্রান্ত মাসআলা বের করা এবং তা থেকে উপকৃত হওয়া সহজ হবে।

৬. আন্তর্জাতিক পর্যায়ের ফেকাহ সংক্রান্ত প্রশ্নাবলীর সম্মিলিত চিন্তা–গবেষণার পর তার উত্তর তৎসংশ্লিষ্ট ফিকাহর বিস্তারিত মাসআলা সহকারে প্রস্তুত করা ও তা প্রকাশের ব্যবস্থা করা।

৭. ইসলামের পূর্ণাঙ্গ আইন সমষ্টি প্রস্তুত করা, যা সে সকল ইসলামী দেশের আইন হতে পারবে, যারা তাদের দেশে ইসলামী আইন বাস্তবায়ন করতে চায়।

এ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের লক্ষে প্রতি তিন মাস পরপর প্রতিষ্ঠিত বিভাগ ত্রয়ের অধিবেশন পর্যায়ক্রমে অনুষ্ঠিত হবে। এ সকল অধিবেশনে প্রতি আগামী তিন মাসের জন্য কাজ নির্ধারণ করে তা উপযুক্ত ব্যক্তিদের উপর বন্টন করে দেওয়া হবে। যে কাজটি পূর্ণতা লাভ করবে, পরিশেষে তা ইসলামী ফেকাহ একাডেমীর সাধারণ সমাবেশে উপস্থাপিত হবে। যার সম্মেলন বছরে কমপক্ষে একবার এবং প্রয়োজনে একাধিক বারও হবে। কার্যকরী পরিষদের বৈঠক বছরে কমপক্ষে দু'বার হবে। এই পরিষদ বিভাগ ত্রয় সহ সাধারণ পরিষদের কাজের ভিত্তি প্রস্তুত করবে।

কমিটির পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট সম্পূর্ণ হওয়ার পর সাধারণ পরিষদের অধিবেশনসমূহ পুনরায় আরম্ভ হয়, তাতে এই রিপোর্ট গৃহীত হয়।

তৎসঙ্গে একাডেমীর প্রাথমিক বুনিয়াদী বিষয় এবং বাজেট প্রভৃতি নিয়ে আলোচনা হয়, তারপর একাডেমীর সংবিধান তৈরীর এই প্রথম সম্মেলন সমাপ্ত হয়।

'ইসলামী ফেকাহ একাডেমী' যে সকল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য তার সামনে রেখেছে, সেগুলোর পূর্ণতা লাভ নিঃসন্দেহে যুগের অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনীয় বিষয়। যদিও আলমে ইসলামের বিভিন্ন অঞ্চলে অনেক ব্যক্তি ও সংস্থা আপন আপন উপকরণ পরিসরে ব্যক্তিগতভাবে এ কাজ করে যাচ্ছে, কিন্তু তারা বেশীর ভাগই উপকরণ স্বল্পতার শিকার। যদি এই আন্তর্জাতিক সংস্থা সকল প্রচেষ্টা সুসংহত করতে পারে এবং চাহিদা অনুপাতে উপকরণের সংস্থান করে এই কাজকে একটি পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনার অধীনে নিয়ে আসা যায়, তাহলে এর দ্বারা অত্যন্ত ফলপ্রসূ পরিণতি হাতে আসবে, তাতে সন্দেহ নেই। এতদ্ব্যতীত এমন অনেক কাজ রয়েছে যেগুলোর পূর্ণতা সাধন এ যুগের শক্তি সামর্থ্য ও যোগ্যতার অভাব ও ব্যস্ততার কারণে ব্যক্তিগতভাবে বড় দুস্কর। তেমনিভাবে এ কাজের জন্য বড় কোন সংস্থার পক্ষে যথার্থ ফলাফল অর্জন করা প্রকৃতপক্ষে তখনই সম্ভব, যখন এমন একনিষ্ঠ যোগ্য এবং খিদমতের মনোবৃত্তির অধিকারী ব্যক্তিবর্গ তার হাতে আসবে, যারা গুরুত্ব ও নিষ্ঠার সঙ্গে এর লক্ষ্যসমূহ পূর্ণ করতে একান্তভাবে আগ্রহ রাখে। সুনাম অর্জন, প্রদর্শনী ও লৌকিকতার পরিবর্তে আল্লাহর দ্বীনের খিদমত ও তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন করাই তাদের অন্যতম লক্ষ্য। যারা প্রচলিত পন্থার অনুসরণ ও বাহ্যিক জাঁকজমকের পরিবর্তে সত্যিকার অর্থেই কাজ করতে ইচ্ছুক।

সবচে' গুরুত্বপূর্ণ কথা তারা ইসলামী ফিকাহর খিদমত সেভাবেই করতে চায়, যেভাবে ফিকাহের মূলনীতি ও তার প্রকৃতির দাবী রয়েছে। স্বীয় কুপ্রবৃত্তির অবৈধ চাহিদা পূরণ করার জন্য ফিকাহকে সিঁড়িরূপে ব্যবহার করা থেকে তাঁরা বহু ক্রোশ দূরে অবস্থান করবে। যারা মুসলমানদের প্রকৃত প্রয়োজন এবং যুগের মিথ্যা প্রোপাগাণ্ডার মাঝে পার্থক্য করার যোগ্যতা রাখে। যাদের লক্ষ্য সত্যিকার অর্থেই আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ হয়, তারা এই পবিত্র নামকে শত্রুদের চিন্তাবৃত্তিক দাসত্বের দাবী পূরণার্থে ব্যবহার করবে

না। (যার প্রভাব প্রতিক্রিয়া ভবিষ্যতে সম্ভবতঃ সুদূর প্রসারী হবে) আল্লাহ তাআলা এমন নিষ্ঠাবান ব্যক্তিদেরই ব্যবস্থা করে দেন। তাদেরকে ইলম ও আমল সর্বদিক দিয়ে এই মহান কাজ সম্পাদনের প্রকৃত যোগ্যতা দান করেন। এবং তাদেরকে স্বীয় মালিক ও খালিক আল্লাহর সন্তুষ্টি অনুযায়ী এই সংস্থা পরিচালনা করার তাওফীক দান করেন। আমীন।

ইরাক সফর

ইরাকের সঙ্গে মুসলমানদের যে আন্তরিকতা ও হৃদ্যতা সর্বদা বিরাজমান, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। পবিত্র মদীনার পর আলমে ইসলামের প্রথম দারুল হুকুমাত ইরাকেই প্রতিষ্ঠিত হয়। ধর্মীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের যে কেন্দ্রিকতা পবিত্র মক্কা মদীনার পর এই ভূখণ্ড অর্জনে সক্ষম হয়, তা আলমে ইসলামের অন্য কোন ভূখণ্ডের ভাগ্যে জোটেনি। তাছাড়া বাগদাদ বহু শতাব্দী যাবত সমগ্র আলমে ইসলামের রাজনীতি, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সভ্যতার কেন্দ্র ছিল। বাগদাদের মাটি জীবনের প্রতিটি শাখায় যে সকল অতুলনীয় ব্যক্তিত্ব জন্ম দিয়েছে, তা আমাদের ইতিহাসের সোনালী অধ্যায়।

এ সকল কারণে ইরাককে এক নজর দেখার অভিলাষ দীর্ঘদিন ধরেই অন্তরে ছিল। তবে ইরাকের ওয়াকফ বিষয়ক মন্ত্রণালয় বিগত দিনে ইসলামী জ্ঞানশীর্ষক দুর্লভ ও দুষ্প্রাপ্য এমন সব গ্রন্থ প্রকাশ করে, যা এতদিন পর্যন্ত হস্তলিপিরূপে ছিল এবং ইতিপূর্বে কখনও মুদ্রিত হয়নি। যেমন ঃ 'আল মু'জামুল কাবীর লিত্ তাবরানী'। এ গ্রন্থের শুধুমাত্র উদ্ধৃতিই অন্যান্য গ্রন্থে পাওয়া যেত। মূল গ্রন্থ পাওয়া যেত না। ইরাকের ওয়াকফ বিষয়ক মন্ত্রণালয় গ্রন্থটি প্রথমবার প্রকাশ করে। মাঝের কয়েক ভলিউম বাদে (যার হস্তলিপি তারা পায়নি) এ পর্যন্ত এ কিতাবের ২৬টি ভলিউম প্রকাশিত হয়েছে। এ ধরনের আরও শতাধিক গ্রন্থ ওয়াকফ বিষয়ক মন্ত্রণালয় প্রকাশ করেছে। এ সকল গ্রন্থ সংগ্রহ করার বাসনা ইরাক ভ্রমণের তাৎক্ষণিক কারণ হয়। পবিত্র মদীনা থেকে আমার প্রিয় শ্রদ্ধাভাজন জনাব কারী বশীর আহমাদ সাহেবও এই ভ্রমণে সফরসঙ্গী হওয়ার জন্য প্রস্তুত হন।

ভ্রমণটি একান্ত ব্যক্তিগত ধরনের হবে বলে ধারণা করেছিলাম, কিন্তু ঘটনাক্রমে পবিত্র মক্কার 'মাজমাউল ফিকহিল ইসলামী'র অধিবেশন চলাকালে ইরাকের প্রতিনিধি ডঃ মুহাম্মাদ শরীফ সাহেব (ওয়াকফ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা) আমার ভ্রমণের ইচ্ছা সম্পর্কে অবগত হন। তিনি আমাদেরকে ইরাকের এই ভ্রমণে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আতিথ্য গ্রহণের জন্য পীড়াপীড়ি করেন। আমার স্বভাবসুলভ লাজুকতার কারণে তার এ প্রস্তাব একথা সে কথায় এড়িয়ে যাই। কিন্তু পরে তিনি জানান যে, টেলেক্সের মাধ্যমে মন্ত্রণালয়কে আমার আগমন সম্পর্কে তিনি অবহিত করেছেন। বিধায় তাদের আতিথ্য আমাকে গ্রহণ করতেই হবে।

সুতরাং ২৫শে নভেম্বর সন্ধ্যায় মাগরিবের সময় আমরা জেদ্দা এয়ারপোর্ট থেকে ইরাক এয়ারওয়েজের প্লেনে আরোহণ করি। ইরাক যে দুঃখজনক যুদ্ধে লিপ্ত, তার ফলে আমাদের সিট পর্যন্ত পৌঁছার পূর্বেই কয়েক স্থানে তল্লাশি করা হয়। হাতের ব্রিফকেসও অন্যান্য লাগেজের সঙ্গে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। যুদ্ধ চলাকালীন অবস্থায় তাদের বিমান চলাচল অব্যাহত থাকাই বিরাট প্রাপ্তি, তাই এ ধরনের অসাধারণ সতর্কতামূলক পদক্ষেপ আশ্চর্যের কিছু নয়।

প্রায় দুই ঘন্টা উড়ার পর আমরা বাগদাদ এয়ারপোর্টে অবতরণ করি। তখন সেখানে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সেক্রেটারী, সাধারণ যোগাযোগ বিভাগের মহাপরিচালক এবং আরও কিছু পদস্থ সরকারী কর্মকর্তা অভ্যর্থনা জানানোর জন্য উপস্থিত ছিলেন। বাগদাদের নতুন এয়ারপোর্ট অর্থাৎ 'সাদ্দাম বিমান বন্দর' তার বিস্তৃতি, সৌন্দর্য এবং আকর্ষণীয় নির্মাণশৈলী ও কমনীয়তায় পাশ্চাত্য দেশসমূহের কোন কোন বিমান বন্দরকেও হার মানায়। অভ্যর্থনা জানানোর জন্য আগত অফিসারগণ বিমান বন্দরের সকল ঘাঁটি কয়েক মিনিটে পার করে দিলেন এবং জানালেন যে, তারা পূর্ব থেকেই আমাদের জন্য থাকার স্থান, গাড়ি এবং একজন গাইডের ব্যবস্থা করে রেখেছেন। বিদেশে ব্যক্তিগত ভ্রমণে এ জাতীয় ব্যবস্থাপনা এমনিতেই বিরাট বড় নেয়ামত। তদুপরি আমার মেজবানগণ যেই উষ্ণ ভালবাসা ও আন্তরিকতা প্রদর্শন করেছেন, সেদিকে

লক্ষ্য করে তাদের এ আতিথ্যকে প্রত্যাখ্যান করা সৌজন্য পরিপন্থীও ছিল। তাই এ সকল ব্যবস্থাপনাকে অদৃশ্যের নেয়ামত মনে করে গ্রহণ করি। পরে বুঝতে পারি যে, এসব ব্যবস্থাপনা না হলে এই স্বল্প সময়ে যত বেশী কাজ সম্ভব হয়েছে তা আমার একার পক্ষে সম্ভব হতো না।

বাগদাদ মহানগরী থেকে সাদ্দাম বিমানবন্দর বেশ দূরে অবস্থিত। মেজবানগণ বাগদাদের বিখ্যাত ফাইভ ষ্টার হোটেল 'ফিন্দাক আর রশীদ'–এ আমাদের থাকার ব্যবস্থা করেন। হোটেলটি মূলতঃ জোট নিরপেক্ষ দেশ প্রধানদের কনফারেন্সের জন্য নির্মাণ করা হয়। কিন্তু এই কনফারেন্স বাগদাদে অনুষ্ঠিত না হওয়ায় তা বাণিজ্যিক হোটেলে পরিণত করা হয়। ফলে তার ভবন, আয়তন এবং আনুষাঙ্গিক সবকিছু অন্যান্য ফাইভ ষ্টার হোটেলের তুলনায় অধিক বিস্তৃত, প্রশস্ত এবং আরামদায়ক। তৎসংলগ্ন লেনটিও একটি স্বতন্ত্র পার্কের মত, যা সম্ভবত এক বর্গকিলোমিটার স্থান নিয়ে বিস্তৃত।

হোটেলের দশ তলায় আমাদের থাকার ব্যবস্থা করা হল। এখান থেকে বাগদাদের অর্ধেক এলাকা দেখা যায়। দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত বিস্তৃত বিক্ষিপ্ত আলোকমালা পৃথিবীর বুকে তারকাখচিত আকাশের দৃশ্যের অবতারণা করেছিল। রাত অনেক হয়েছিল, বিছানায় গা এলিয়ে দিলাম। স্মৃতিশক্তি বাগদাদ ইতিহাসের পাতা এক এক করে উল্টাতে শুরু করল। বাগদাদের মাটি মুসলিম জাতির উত্থান পতনের কত কাহিনী প্রত্যক্ষ করেছে। এই ভূখণ্ডে জ্ঞান–গরিমার কত না পর্বত আত্মপ্রকাশ করেছে। জ্ঞান–বিজ্ঞান ও সাহিত্যের কত না আসর এখানে সাজানো হয়েছে। খোদাভীতি ও পরহেযগারীর কত দৃষ্টান্তই না এর বুকে চিত্রিত হয়েছে এবং আজও এই মাটিতে আমাদের দীপ্তিময় ইতিহাসের কত যে রবি–শশী আত্মগোপন করে আছেন। আল্লাহু আকবর! আল্লাহ কত মহান!

মুসলমানরা যখন ইরাক জয় করে বাগদাদ তখন উল্লেখযোগ্য কোন নগরী ছিল না। পারস্য সম্রাট কিসরার রাজত্বকালে দজলা নদীর পশ্চিম তীরে এটি ছোট একটি বসতি ছিল। কথিত আছে, পারস্য সম্রাট কিসরা তার এক প্রতিমাপূজারী ক্রীতদাসকে জায়গীর স্বরূপ এ অঞ্চলটি প্রদান করেন। সেই ক্রীতদাস যে প্রতিমার পূজা করত তার নাম ছিল 'বাগ'।

তাই জায়গীরপ্রাপ্ত হয়ে সে বলল 'বাগদাদ' (বাগপ্রদত্ত)। অর্থাৎ বাগ প্রতিমা আমাকে এ অঞ্চল প্রদান করেছেন। এ কারণে অনেক আলেম 'বাগদাদ' বলতে পছন্দ করতেন না।

হযরত উমর (রাযিঃ)এর খেলাফতকালে কুফা এবং বসরার মত নগরীসমূহ প্রতিস্ঠা করা হলেও এ অঞ্চল পূর্বের মতই থেকে যায়। বনু আব্বাসের শাসনামলে খলীফা মনসূর কুফা এবং হায়রার মাঝামাঝি 'হাশেমীয়া' নামে একটি নগরী প্রতিস্ঠা করেন। কিন্তু রাবেন্দীদের বিদ্রোহের কারণে সেখানে নিজেদের অবস্থান দৃঢ় করতে পারেননি। কুফার বিদ্রোহ তো পূর্ব থেকেই প্রসিদ্ধ ছিল। তাই কুফাকেও দারুল হুকুমাত বানানো তাঁর পছন্দ ছিল না। পরিশেষে তিনি কুফা থেকে মু'সিল পর্যন্ত ভ্রমণ করে দেখে দজলা নদীর তীরের এ স্থানকে পছন্দ করে বলেন ঃ 'এ স্থানের একদিকে দজলা নদী অবস্থিত। এখান থেকে এই নদীপথে আমাদের এবং চীন দেশের মাঝে যোগাযোগ স্থাপনে কোন প্রতিবন্ধকতা নেই। অপরদিকে ফুরাত নদী অবস্থিত। সেখান থেকে সিরিয়া এবং রক্কার সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করাও সম্ভব হবে।

সুতরাং খলীফা মনসূরের সৈন্যবাহিনী দজলা নদীর পশ্চিম তীরে শিবির স্থাপন করে এবং তারই নির্দেশে ১৪০ হিজরীতে বাগদাদ নগরীর নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়। খলীফা মনসূরই এই নগরীর 'মাদীনাতুস্ সালাম' নামকরণ করেন। কারণ বাগদাদ নামে (যেমন পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে) শিরকের গন্ধ রয়েছে। এটাও এক বিস্ময়কর ব্যাপার যে, এই 'মাদীনাতুস্ সালাম' নগরী বহু শতাব্দী মুসলিম খলীফাদের রাজধানী ছিল। কিন্তু তাদের একজনেরও এ নগরীতে মৃত্যু হয়নি। শুধুমাত্র বাদশাহ হারুনুর রশীদের পুত্র আমীন সম্পর্কে প্রসিদ্ধ আছে যে, তিনি বাগদাদে নিহত হয়েছেন, কিন্তু খতীবে বাগদাদী (রহঃ) বর্ণনা করেন, প্রকৃতপক্ষে তিনিও বাগদাদে নিহত হননি। বরং বিনোদনের লক্ষ্যে দজলায় নৌকা ভাসিয়ে শহর থেকে দূরে চলে যান। সেখানেই তাঁকে বন্দী করে হত্যা করা হয়।

ক্রমান্বয়ে বাগদাদ মুসলমানদের সভ্যতা-সংস্কৃতি এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের এমন এক কেন্দ্রে পরিণত হয় যে, তৎকালীন পৃথিবীতে এর তুলনা মেলা দুস্কর ছিল। রূপলাবণ্য, নিয়ম-শৃঙ্খলা, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও

সভ্যতা সংস্কৃতির দিক দিয়ে এই নগরী এতই মনোলোভা ছিল যে, ইমাম শাফেয়ী (রহঃ)এর মত খোদাভীরু ফকীহ এবং বুযুর্গ ব্যক্তিও একদা স্বীয় সাগরেদ ইউনুস বিন আবদুল আলীকে জিজ্ঞাসা করেন যে, 'তুমি বাগদাদ দেখেছো কি? তিনি 'না' উত্তর দিলে ইমাম শাফেয় (রহঃ) বললেন, 'তাহলে তুমি তো পৃথিবীই দেখনি।' বর্তমানে বাগদাদ নগরী দজলা নদীর উভয় তীরে অবস্থিত। খলীফা মনসূর প্রথমে দজলার পূর্ব তীরে এ নগরী স্থাপন করেছিলেন। পরবর্তীতে তার পুত্র খলীফা মাহদী পশ্চিম তীরে তাঁর সেনা ছাউনী স্থাপন করেন। ক্রমান্বয়ে এ অংশও শহরের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায় এবং নদীর পূর্বের অংশকে 'কারখ' এবং পশ্চিম অংশকে 'রাসাফা' নামে নামকরণ করা হয়। উভয় অংশের এ নামই এখন পর্যন্ত প্রচলিত আছে। আমাদের ইতিহাসের অনেক খ্যাতনামা আলেমের নাম এ অংশদ্বয়ের সাথে সম্পৃক্ত হয়েই তাঁরা 'কারখী' এবং 'রাসাফী' নামে প্রসিদ্ধ হন।

পরের দিন ছিল রবিবার। নাস্তা পর্ব শেষ হওয়ার পর নিমন্ত্রণকারীদের প্রতিনিধি আবদুর রাজ্জাক সাহেব (প্রোটোকল অফিসার) হোটেলে পৌছেন। আমরা সর্বপ্রথম হযরত ইমাম আবু হানীফা (রহঃ), হযরত আবদুল কাদের জিলানী (রহঃ) ও অন্যান্য বুযুর্গের মাজার যিয়ারত করার ইচ্ছা প্রকাশ করি। তিনি কাজের সুবিধার দিকে লক্ষ্য করে প্রথমে হযরত শায়েখ আবদুল কাদের জিলানী (রহঃ)এর মাজারে যাওয়ার প্রোগ্রাম করলেন।

দিনের আলোতে বাগদাদের সড়ক ও ভবনসমূহ প্রথমবার দেখলাম। বাগদাদ বিংশ শতাব্দীর এক আধুনিক নগরী। ভবনসমূহ সুন্দর নয়নাভিরাম, সড়কগুলো পরিচ্ছন্ন ও প্রশস্ত, বিভিন্ন চৌরাস্তায় নির্মাণকৃত পুলসমূহ (ওভার ব্রীজ) এবং ভূগর্ভস্থ পথসমূহ (আণ্ডারপাস) একদিকে ট্রাফিক সমস্যার চমৎকার সমাধান করে দিয়েছে। অপরদিকে তাতে রাস্তার সৌন্দর্য চতুর্গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। বলা হয় যে, প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেনের যুগে বাগদাদ নগরীর যে নগরায়নিক উন্নতি ঘটেছে, তা নগরীকে অনেক সম্মুখে অগ্রসর করেছে। খতীবে বাগদাদী (রহঃ)

বাগদাদের ইতিহাসে লেখেন যে, খলীফা মনসূর যখন এ নগরী প্রতিষ্ঠা করেন, তখন এ নগর দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ উভয় দিকে দুই মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল এবং এটিই দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে সমানভাবে প্রতিষ্ঠিত বিশ্বের প্রথম নগরী। আর বর্তমানে তার এক একটি মহল্লাই কয়েক মাইলব্যাপী বিস্তৃত।

নতুন নগরীর বিভিন্ন এলাকা অতিক্রম করতে করতে পরিশেষে নগরীর এক প্রাচীন অংশে আমাদের গাড়ী প্রবেশ করে। তার অলিগলি থেকে প্রাচীনকালের গন্ধ আসছিল। অল্প পরেই এক আধাপাকা সড়কের পাশে গাড়ী থেমে গেল। এখানে বিশাল এক মসজিদের প্রাচীর দৃষ্টিগোচর হল। সামনেই একটি গলি,এই গলির মুখে মসজিদের ফটক অবস্থিত। ফটকটি প্রাচীন যুগের রাজপ্রাসাদের ফটকের মত অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণ। এটিই হযরত শায়েখ আবদুল কাদের জিলানী (রহঃ)এর মসজিদ এবং মাদরাসা। যার একাংশে হযরত শায়েখ স্বয়ং চিরনিদ্রায় শায়িত আছেন

মসজিদটি হযরত শায়েখের যুগ থেকেই এখানে প্রতিষ্ঠিত। তারই কেবলার দিকের প্রাচীরের পশ্চাতে হযরত শায়েখ (রহঃ)এর পবিত্র মাজার অবস্থিত। আমার সেখানে উপস্থিত হওয়ার সৌভাগ্য হয়। হযরত শায়েখ আবদুল কাদের জিলানী (রহঃ) উত্তর ইরানের পশ্চিম প্রদেশ জিলানে জন্মগ্রহণ করেন। একে দিলামও বলা হয়। কিন্তু তিনি ১৮ বছর বয়সে (প্রায় ৪৮৮হিজরীতে) বাগদাদ আগমন করেন। তারপর বাগদাদে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। হয়ত বা কেউ এটাকে একটি কাকতালীয় ব্যাপার বলতে পারে। কিন্তু এটা নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলার মহান হিকমতের ফলে হয়েছে। কেননা এ বৎসরই হযরত ইমাম গাযালী (রহঃ) বাগদাদকে বিদায় জানান। যেন শহরটি এক সংস্কারক থেকে বঞ্চিত হওয়ায় আল্লাহ তাআলা সঙ্গে সঙ্গেই হযরত শায়েখ আবদুল কাদের জিলানী (রহঃ) রূপে অপর এক মহান সংস্কারক তাকে দান করেন। এই মহল্লা, যেখানে হযরত আবদুল কাদের জিলানী (রহঃ)এর মাজার অবস্থিত, প্রাচীনকালে বাগদাদের নগর প্রাচীরের নিকটবর্তী ছিল এবং একে 'বাবুল আয্' বলা হত। হযরত শায়েখ আবদুল কাদের জিলানী (রহঃ)এর ওস্তাদ হযরত শায়েখ কাজী আবু সা'দ মাখরামী (রহঃ) এখানে ছোট একটি মাদরাসা স্থাপন করেছিলেন। ওস্তাদের মৃত্যুর পর মাদরাসাটি হযরত শায়েখ আবদুল কাদের জিলানী (রহঃ)এর হাতে অর্পণ করা হয়। হযরত (রহঃ) এ মাদরাসাকেই তাঁর বহুমুখী শিক্ষাদানের কেন্দ্র বানান। এখানেই অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, গ্রন্থ রচনা, ফতোয়া প্রদান এবং ওয়ায ও উপদেশের ধারা চালু রাখেন। শেষ পর্যন্ত এটি একটি বিরাট বড় মাদরাসার রূপ লাভ করে। এই মাদরাসার উপর হযরতের ফয়েয আজো অব্যাহত রয়েছে।

হযরত আবদুল কাদের জিলানীর জীবদ্দশায় মাদরাসাটি সর্বশ্রেণীর মানুষের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের কেন্দ্র ছিল। কেনই বা তা হবে না? হযরত শায়েখ স্বয়ং এখানে শিক্ষাদান করতেন। প্রত্যহ তাফসীর, হাদীস, ফেকাহ এবং খেলাফিয়াতের একটি করে ক্লাস তিনি নিজে পড়াতেন। সকাল ও সন্ধ্যায় তাফসীর, হাদীস, ফেকাহ এবং নাহু প্রভৃতির ক্লাস চলত। জোহর নামাযান্তে বিভিন্ন কেরাতে অনুযায়ী স্বয়ং কুরআন তেলাওয়াত করতেন। এতদ্ব্যতীত ফতোয়া প্রদানের ধারাও চালু থাকত। তিনি সাধারণত শাফেঈ এবং হাম্বলী মাযহাব অনুসারে ফতোয়া প্রদান করতেন।

ইমাম শা'রানী (রহঃ) উদ্ধৃত করেন যে, জনৈক ব্যক্তি একবার শপথ করে, সে এমন একটি ইবাদত করবে, যেই ইবাদত ঐ সময়ে ভূপৃষ্ঠের অন্য কোন ব্যক্তিই করছে না। তার এ শপথ পুরা করতে না পারলে তার স্ত্রী তিন তালাক। প্রশ্নটি বাগদাদের অনেক আলেমের নিকট নিয়ে যাওয়া হয়। সাধারণত আলেমগণ এ প্রশ্ন শুনে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, বাহ্যত এই ব্যক্তির তালাক থেকে বাঁচার কোন পথ নেই। কারণ এমন কোন্ ইবাদত আছে? যার সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায় যে, ভূপৃষ্ঠের কোন ব্যক্তিই তখন সে ইবাদত করছে না? শেষ পর্যন্ত এই প্রশ্ন হযরত শায়েখ আবদুল কাদের জিলানী (রহঃ)এর দরবারে নিয়ে যাওয়া হয়। তিনি তৎক্ষণাৎ সমাধান দেন যে, এই লোকের জন্য মক্কা শরীফের তাওয়াফের স্থান খালি করে দেওয়া হোক, এবং সে এমন অবস্থায় তাওয়াফ করুক, যেন তার সঙ্গে অন্য কোন ব্যক্তি শরীক না থাকে।

হযরত শায়েখ আবদুল কাদের জিলানী (রহঃ)এর অসংখ্য উপদেশ

বাণী শরীয়তের বিধান ও রাসূলে সুন্নাতের অনুগত হওয়ার এবং বিদআতকে পরিহার করার শিক্ষা ও উপদেশ দানের জ্বলন্ত প্রমাণ বহন করে। তাঁর ওয়ায দ্বারা প্রভাবিত হয়ে প্রায় প্রত্যেক মাহফিলে অনেক অনেক মানুষ পাপ পথ থেকে সৎপথে ফিরে আসে। ইমাম শা'রানী (রহঃ) হযরত শায়েখ (রহঃ)এর এ ঘটনাও উদ্ধৃত করেছেন যে, শায়েখ বলেন, একবার বিশাল এক নূর আমার সম্মুখে আত্মপ্রকাশ করল, যার দ্বারা সম্পূর্ণ দিগন্ত আলোকিত হয়ে গেল। তারপর সেই নূরের মধ্য থেকে একটি আকৃতি দেখতে পেলাম। সে আওয়াজ দিয়ে বলল, হে আবদুল কাদের! আমি তোমার রব, আমি আজ থেকে তোমার জন্য সমস্ত হারাম কাজ হালাল করে দিলাম। আমি সাথে সাথে বললাম ঃ অভিশপ্ত, দূর হয়ে যা। একথা বলতেই সেই নূর অন্ধকার হয়ে গেল এবং সে আকৃতি ধোয়ায় পরিণত হয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। তারপর পুনরায় আওয়াজ এল, হে আবদুল কাদের! তুমি আমার চক্রান্ত থেকে স্বীয় ইলেমের বদৌলতে বেঁচে গেলে। অন্যথায় আমি এ রকম চক্রান্ত দ্বারা সত্তরজন আল্লাহর পথের সাধককে পথভ্রষ্ট করেছি। উত্তরে আমি বললাম ঃ এসব কিছু আমার ইলেমের বদৌলতে নয় বরং শুধুমাত্র আল্লাহ তাআলার দয়া ও অনুগ্রহের বদৌলতে হয়েছে।

মাশায়েখগণ বলেন, শয়তানের দ্বিতীয় আক্রমণটি অধিক চক্রান্তপূর্ণ এবং মারাত্মক জটিল ছিল। কেননা প্রথম আক্রমণ থেকে ভালভাবে বেঁচে যাবার পর, সে তাঁকে তাঁর ইলেমের উদ্ধৃতি দিয়ে ইল্মেের অহংকারে লিপ্ত করার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু আল্লাহ তাআলা তাঁকে এই সূক্ষ্ম আক্রমণ থেকেও রক্ষা করেছেন।

এ সকল ঘটনা থেকে অনুমান করা যায় যে, শায়েখ আবদুল কাদের জিলানী (রহঃ)এর নিকট তরীকতের সঙ্গে সঙ্গে শরীয়তের এবং বাতেনী এলেমের সঙ্গে সঙ্গে জাহেরী এলেমের কত গুরুত্ব ছিল। তাই তিনি স্বয়ং জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ধর্মীয় জ্ঞানের শিক্ষাদান এবং ফতোয়া প্রদান প্রভৃতি কাজে লিপ্ত থাকেন।

درکفے جام شریعت درکفے سندان عشق
هر هوسنا کے نه داندجام وسندان باختن

"এক হাতে শরীয়তের পানপাত্র ও অপর হাতে প্রেম মদিরা, সকল উচ্চাভিলাষী ব্যক্তিই পানপাত্র ও মদিরা নিয়ে খেলতে জানে না।"

কিন্তু অন্যান্য অনেক ওলীর মাজারের মত শরীয়ত ও তরীকতের এই মহান ইমামের মাজারেও অজ্ঞতাপ্রসূত ভক্তির বহিঃপ্রকাশ বিদআতরূপে দৃষ্টিগোচর হলো। যে বহুমূখী গুণের অধিকারী ব্যক্তিত্বের সমগ্র জীবন শরীয়তের অনুসরণের শিক্ষাদানে ব্যয় হয়েছে। আজ তাঁরই মাজারে এসব শরীয়ত পরিপন্থী কর্মকাণ্ড তাঁর জন্য কতই না পীড়াদায়ক। এই অনুভূতিতে হৃদয় ভারাক্রান্ত হয়ে গেল।

পবিত্র মাজার থেকে বের হলে নিকটেই সেই মাদরাসা আজও দণ্ডায়মান, হযরত শায়েখ নিজেই যার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন। পরের দিন মাগরিব নামাযান্তে সেই মাদ্রাসেতেই একজন মহান বুযুর্গ শায়েখ মুহাম্মাদ আবদুল করিম আলমুদাররিছ (আল্লাহ পাক তাঁকে নিরাপদে রাখুন) এর সাক্ষাত ও নছীহত শ্রবণ করা ভাগ্যে জোটে। তিনি শায়েখ আমজাদ আয্যাহাবী (রাঃ)এর সঙ্গীদের অন্যতম। তিনি আধুনিক ইউনিভার্সিটি থেকে ডিগ্রী অর্জনের পন্থা অবলম্বন না করে, প্রাচীন পন্থায় পারদর্শী উস্তাদ এবং শায়েখদের নিকট থেকে দ্বীনী ইলমসমূহে পূর্ণতা অর্জন করেন। ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডক্টরেটের এই যুগে এমন আলেমদের মূল্যায়নকারীর সংখ্যা খুবই অল্প, কিন্তু সত্য কথা হলো, ইলমে দ্বীনের যেই ঘ্রাণ এবং শরীয়ত ও সুন্নাতের যে সুগন্ধী সহজ সরল জীবনের অধিকারী এই বুযুর্গদের নিকট অনুভূত হয়, তা সাধারণতঃ ইউনিভার্সিটির সুউচ্চ ভবনসমূহ এবং তার জৌলুষপূর্ণ পরিবেশে দৃষ্টিগোচর হয় না। তাই যেখানেই যাওয়ার সুযোগ ঘটে, সেখানেই এমন আলেমের সন্ধান করে থাকি।

উক্ত শায়েখ মাদ্রাসার এক কোণায় সাধামাটা এক ফ্লাটে বসবাস করেন, প্রাচীন আরবীয় ঢংয়ের উপবেশন, আশেপাশে কিতাবের স্তূপ, প্রত্যেক আগমনকারীর জন্য উন্মুক্ত দরজা, গোলাপ ফুলের মত সদা হাস্যোজ্জ্বল মুখমণ্ডল, কথাবার্তায় অসম্ভব রকম পবিত্রতা, অকপট ও অকৃত্রিম আচরণ, লৌকিকতা ও সুনাম অর্জনের মনোবৃত্তি থেকে বহু ক্রোশ দূরে যার অবস্থান, তাঁর সাক্ষাত লাভে প্রথম দৃষ্টিতেই অন্তর

আনন্দে ভরে যায়।

ডঃ মুহাম্মদ শরীফ সাহেব (ওয়াকফ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা) শায়েখকে পূর্বেই ফোনে আমাদের আগমন সম্পর্কে অবহিত করেছিলেন। শায়েখ এ কথা শুনে খুবই আনন্দিত ছিলেন যে, অধমেরও সেই প্রাচীন ধারার ধর্মীয় মাদরাসাসমূহ ও তার আলেমদের সঙ্গে খাদেমসুলভ নিসবাত (সম্পর্ক) রয়েছে। সুতরাং প্রাথমিক কুশল বিনিময়ের পর তাঁর প্রথম প্রশ্ন ছিল আমাদের মাদরাসাসমূহের পাঠ্যক্রম ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে। আমি যখন আমাদের পাঠ্যপুস্তকের মধ্য থেকে 'কাফিয়া', 'শরহে জামী', 'শরহে তাহযীব', 'নূরুল আনওয়ার' এবং 'তাওযীহ' প্রভৃতি কিতাবের নাম বললাম, তখন তিনি প্রায় চিৎকার করে উঠে অছীয়ত করেন যে, দৃঢ় যোগ্যতা সৃষ্টিকারী এই জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা কখনো পরিত্যাগ করবেন না। কারণ, আমরা এ শিক্ষা ব্যবস্থা ত্যাগ করার কুফল স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করছি। সাথে সাথে এ অসীয়তও করেন যে, ইরাক যে যুদ্ধে আক্রান্ত তা থেকে পরিত্রাণের জন্য দু'আ করতে ভুলবেন না। পাকিস্তানের অন্যান্য আলেমদের দ্বারাও এ ব্যাপারে দুআ করাবেন।

শায়েখ মূলতঃ কুর্দী বংশোদ্ভূত। তিনি কুর্দী এবং আরবী ভাষায় বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁর কুর্দী ভাষায় লিখিত অধিকাংশ গ্রন্থ কুর্দ অঞ্চলে ধর্মীয় শিক্ষা প্রচার প্রসারের দায়িত্ব উত্তমরূপে সম্পাদন করছে। কুর্দী ভাষা বুঝি না বিধায় সে সকল গ্রন্থ দ্বারা উপকৃত হওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাই শায়েখ আরবী ভাষায় লিখিত গ্রন্থসমূহের একটি সেট আমাদেরকে প্রদান করেন। তাঁর একটি গ্রন্থ 'উলামাউনা ফিল ইরাক' এতে ইরাকের কুর্দী আলেমদের আলোচনা রয়েছে, যা প্রায় আটশত পৃষ্ঠায় সম্পন্ন। অন্যান্য গ্রন্থগুলো ইলমে আকায়িদ বিষয়ে লিখিত।

শায়েখের নিকট থেকে বিদায় নিয়ে আমরা মাদরাসার গ্রন্থাগারে যাই। এই গ্রন্থাগারটিও হযরত শায়েখ আবদুল কাদির জিলানী (রহঃ)এর প্রতিষ্ঠিত। প্রায় ৪০ হাজার গ্রন্থ এই গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত আছে। এই গ্রন্থাগারের শুধুমাত্র হস্তলিপি গ্রন্থসমূহের পরিচিতি পাঁচটি বড় বড় ভলিউমে প্রকাশ পেয়েছে। জ্ঞানের সদা বসন্ত এই কানন থেকে জ্ঞানার্জনের জন্য মাসকে মাস সময় প্রয়োজন, তবে সংক্ষিপ্ত সময়ে

অনেক দুর্লভ হস্তলিপি গ্রন্থের দর্শন নসীব হয়। অনেক নতুন কিতাব সম্পর্কে জানতে পারি। তবে হস্তলিপি গ্রন্থসমূহের একটি গ্রন্থ দেখে মনে যে অবস্থা সৃষ্টি হয়, তা লিখে প্রকাশ করা কঠিন। আমি তাফসীর সংক্রান্ত একটি হস্তলিপি গ্রন্থ দেখছিলাম, ইত্যবসরে গ্রন্থাগার পরিচালক হঠাৎ আরেকটি হস্তলিপি গ্রন্থ আমার সম্মুখে তুলে ধরে সেদিকে মনোযোগ আকর্ষণ করেন। আমি তাকিয়ে ইমাম রাগিব ইস্পাহানীর মুফরাদাতুল কুরআন গ্রন্থটি দেখতে পেলাম। কোন কোন স্থান থেকে তার লেখা মিটে গেছে। মনে হয় তার উপর কখনো পানি পড়েছিল। আমি গ্রন্থটির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করার পূর্বেই গ্রন্থাগার পরিচালক তার প্রচ্ছদে লিখিত একটি বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করে তা পড়তে বলেন। আমি পড়ে দেখলাম তাতে লেখা আছে—

৫৫৬ হিজরীতে গ্রন্থটি দজলা নদীতে পড়ে থাকাবস্থায় আমি পাই। তাতারীগণ গ্রন্থটি সেখানে নিক্ষেপ করেছিল। আমি সেখান থেকে গ্রন্থটি উদ্ধার করি।

—ফকির আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মদ বিন আবদুল কাদির মাক্কী।

লেখাটি আমার মানসচক্ষে সাড়ে সাত শত বছর পূর্বের হৃদয়বিদারক ঘটনাবলীর চিত্র তুলে ধরল। ইতিহাসে পড়েছিলাম, তাতারীগণ বাগদাদ দখল করার পর মুসলমানদের কিতাব দ্বারা দজলা নদীর উপর বাধ নির্মাণ করেছিল। কিতাবের কালিতে দজলার রং পর্যন্ত পরিবর্তন হয়ে যায়। জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনেক ভাণ্ডারই এই বর্বরতা ও হিংস্রতার শিকার হয়। এর বিস্তারিত ঘটনা আল্লাহ ভিন্ন আর কেউ জানে না, তবে কলমে লেখা এই কপিটি সেই ঐতিহাসিক ঘটনার বাস্তবতা সম্পর্কে আজও সাক্ষ্য বহন করছে।

ওলীগণের মাজারে

হযরত শায়েখ আবদুল কাদের জিলানী (রহঃ)এর পবিত্র মাজার যিয়ারতের পর সেদিনই সন্ধ্যায় বাগদাদের 'মাকবারা বাবুদ দায়ের' নামীয় এক প্রাচীন কবরস্থানে গমন করি। এখানে ছোট একটি বেষ্টনীর মাঝে হযরত মা'রুফ কারখী (রহঃ), হযরত জুনায়েদ বাগদাদী (রহঃ) এবং

হযরত সিররী সাকতী (রহঃ)এর মাজার পাশাপাশি অবস্থিত। এ সময়ে বুযুর্গত্রয়ের মাজার যিয়ারতের সৌভাগ্য হয়।

হযরত মা'রুফ কারখী (রহঃ)

হযরত মা'রুফ বিন ফিরুজ কারখী (রহঃ) হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীর খ্যাতনামা ওলীগণের অন্যতম। তিনি হযরত আলী বিন মূসা আর–রযার (রহঃ)এর আযাদকৃত ক্রীতদাস ছিলেন। তাঁর বাণী ও উপদেশসমূহ সুফিয়ায়ে কেরামের জন্য সর্বদা আলোকবর্তিকা হিসেবে পরিগণিত হয়।

এক খৃষ্টান পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু তাঁর ভ্রাতা ঈসা বলেন ঃ আল্লাহ তাআলা ছোটকালেই তাঁকে তাওহীদের বিশ্বাসের জন্য মনোনীত করেছিলেন। আমি এবং মারুফ (রহঃ) একজন খৃষ্টান উস্তাদের নিকট পড়তাম। উস্তাদ আমাদেরকে 'পিতা ও পুত্রের' খৃষ্টীয় আকীদা শিক্ষা দিতেন, কিন্তু হযরত কারখী (রহঃ) উত্তরে 'আহাদ' 'আহাদ' বলতেন। এ কারণে উস্তাদ তাঁকে প্রহার করতেন। একবার উস্তাদ তাঁকে এত বেশী প্রহার করেন যে, তিনি পালিয়ে নিখোঁজ হয়ে যান। আমাদের মা কেঁদে কেঁদে বলতেন ঃ যদি আল্লাহ তাআলা মারুফকে আমার নিকট ফিরিয়ে দেন তাহলে তাকে তার ইচ্ছামত যে কোন ধর্ম গ্রহণ করতে দিবো আমরা এক্ষেত্রে বাধা দেব না।

কয়েক বছর পর তিনি ফিরে আসেন। তখন মা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ বেটা! তুমি কোন্ ধর্মের উপর আছ? তিনি উত্তর দিলেন ঃ ইসলাম ধর্মের উপর। এ কথা শুনে মাও মুসলমান হয়ে গেলেন এবং আমাদের পরিবারের সকলে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে ধন্য হলো।

যে সকল আল্লাহর ওলীগণ অধিক নফল নামায আদায় করা থেকে যিকির ফিকিরে বেশী লিপ্ত থাকতেন, তিনি তাঁদের অন্যতম ছিলেন। তাঁর সমসাময়িক একজন বর্ণনাকারী আবু বকর বিন আবু তালেব বলেন, একবার আমি হযরত মারুফ কারখী (রহঃ)এর সঙ্গে দেখা করতে তাঁর মসজিদে যাই। তিনি যখন আযান দিতে আরম্ভ করলেন, তখন আমি তাঁর উপর এক বিস্ময়কর কম্পমান অবস্থা বিরাজ করতে দেখলাম।

তিনি যখন আশহাদু আল্–লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলেন, তখন তার

দাড়ি ও ভুরুর পশম পর্যন্ত দাঁড়িয়ে যায় এবং তিনি নিয়ন্ত্রণহারা হয়ে এত বেশী কাঁদতে থাকেন যে, তিনি আযান শেষ করতে পারবেন কিনা এ ব্যাপারে আমার আশংকা হল।

একবার এক নাপিত হযরত মারুফ কারখী (রহঃ)এর ক্ষৌরকার্য সমাধা করছিল। তিনি তখনও তাসবীহ পাঠে রত ছিলেন, তাই নাপিত বলল, আপনি তাসবীহ পাঠ করতে থাকলে তো মোচ কাটা সম্ভব হবে না। উত্তরে হযরত বললেন ঃ তুমি তোমার লাভের কাজ করছ, আমি আমার লাভের কাজ করব না?

কেউ তাকে দাওয়াত করলে সুন্নাত হিসেবে তিনি দাওয়াত কবুল করতেন। একবার তিনি এক ওলীমার দাওয়াতে যান। সেখানে বাছাইকৃত উৎকৃষ্টমানের অনেক প্রকার খাদ্যের সমাহার ছিল। আরও একজন বুযুর্গ ব্যক্তি সেই মজলিসে উপস্থিত ছিলেন। এত উৎকৃষ্টমানের খাবার দেখে তিনি হযরত মারুফ কারখী (রহঃ)কে সম্বোধন করে বললেন ঃ আপনি লক্ষ্য করেছেন এগুলো কি? তার এ কথার উদ্দেশ্য ছিল এত উৎকৃষ্টমানের খাবার তৈরী করা ঠিক হয়নি। উত্তরে হযরত বললেন ঃ আমি এ খাবার প্রস্তুত করতে বলিনি। তারপর যতই অধিক খাবার আসছিল সে ব্যক্তি পূর্বের মত বারবার অভিযোগ করছিল। শেষে হযরত মারুফ কারখী (রহঃ) বললেন ঃ আমি তো একজন ক্রীতদাস, মনিব আমাকে যা খাওয়ান, আমি তাই খাই। যেখানে নিয়ে যান, সেখানে চলে যাই।

একবার তিনি কোথাও যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে এক ভিস্তিওয়ালাকে এই বলে আওয়াজ দিতে শুনলেন—

"আমার নিকট থেকে যে ব্যক্তি (কিনে) পানি পান করবে আল্লাহ পাক তার উপর রহমত নাযিল করবেন। তার আওয়াজ শুনে হযরত মারুফ কারখী (রহঃ) সম্মুখে অগ্রসর হলেন এবং পানি চেয়ে নিয়ে পান করলেন। জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল ঃ আপনি তো রোযা রেখেছিলেন? উত্তরে তিনি বললেন ঃ হাঁ, রোযা রেখেছিলাম। কিন্তু আমি চিন্তা করলাম হয়ত আল্লাহ তাআলা আমার জন্য তার দু'আ কবুল করবেন (রোযাটি নফল ছিল, পরে তা কাযা করে নিয়েছেন)।

একবার তিনি দজলা নদীর তীরে বসেছিলেন। সম্মুখ দিয়ে একটি নৌকা যাচ্ছিল। নৌকাতে উদাসীন কিছু যুবক গানবাদ্য করছিল। জনৈক ব্যক্তি হযরত মারুফ কারখী (রহঃ)কে বলল ঃ দেখুন! এরা নদীতেও আল্লাহর নাফরমানী থেকে বিরত থাকছে না। আপনি তাদের জন্য বদদু'আ করুন। তখন হযরত মারুফ কারখী (রহঃ) হাত উঠিয়ে দু'আ করলেন—

হে আল্লাহ! হে আমার প্রভু! আমি আপনার কাছে নিবেদন করছি যে, যেভাবে আপনি এই যুবকদেরকে ইহজগতে আনন্দ দান করেছেন, তেমনিভাবে তাদেরকে বেহেশতের আনন্দও দান করুন।

উপস্থিত লোকেরা বলল ঃ আমরা তো আপনাকে বদদু'আ করতে বলেছি। তিনি বললেন ঃ যদি আল্লাহ তাআলা এদেরকে আখিরাতের আনন্দ দান করেন, তাহলে তাদের দুনিয়ার পাপকর্ম থেকে তাওবা কবুল করবেন। এতে তোমাদের তো কোন ক্ষতি নেই।

হযরত মারুফ কারখী (রহঃ) ২০০ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। বাগদাদবাসীদের মধ্যে প্রসিদ্ধ ছিল যে, তাঁর মাজারে যে দু'আ করা হয় আল্লাহ তাআলা তা কবুল করে থাকেন। বিশেষভাবে দুর্ভিক্ষকালে বৃষ্টির জন্য দু'আ করলে তা কবুল হয়ে থাকে। আবু আবদুল্লাহ ইবনে আল হামেলী বলেন ঃ আমি মারুফ কারখী (রহঃ)এর কবর সম্পর্কে ৭০ বছর যাবত অবগত আছি যে, যে কোন দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ব্যক্তি সেখানে গিয়ে আল্লাহ তাআলার নিকট দু'আ করলে আল্লাহ তাআলা তার দু'আ কবুল করেন।

হযরত সিররী সাক্তী (রহঃ)

হযরত সিররী বিন মুফলিছ সাক্তী (রহঃ) (মৃত্যু ২৫১ হিজরী) হযরত মারুফ কারখী (রহঃ)এর বিশিষ্ট খলীফা ছিলেন। তিনি সে যুগের তাসাওফ ও আকাঈদের ইমাম ছিলেন। ইমাম শারানী (রহঃ) লিখেন ঃ বাগদাদে ইলমে তাওহীদ সম্পর্কে সর্বপ্রথম তিনিই কথা বলেন। ইমাম আবু নাঈম (রহঃ) তাঁর এ স্বর্ণবাণী বর্ণনা করেন যে, কেউ যদি এমন বাতেনী ইলেমের দাবী করে যা শরীয়তের কোন জাহেরী হুকুমের পরিপন্থী, তাহলে

বুঝতে হবে সে ভ্রান্ত।

হযরত সিররী সাকতী (রহঃ) এ ব্যাপারে বিশেষভাবে সতর্ক থাকতেন যে, ধর্মীয় কোন কাজের বিনিময়ে দুনিয়া উপার্জনের কোন গন্ধও যেন আসতে না পারে। তাই তিনি তার ভক্তদের নিকট থেকে কোনরূপ হাদীয়া কবুল করতেন না। এমনকি একবার তাঁর কাশি হলে তার এক ভক্ত স্বীয় পুত্রের হাতে কাশের ঔষধ হিসেবে একটি বড়ি পাঠিয়ে দেয়। বড়ি এনে তাঁকে দিলে তিনি জিজ্ঞাসা করেন, এর মূল্য কত? ছেলেটি উত্তরে বলল ঃ আমার আব্বা আমাকে মূল্য বলেননি। হযরত বললেন, তোমার আব্বাকে আমার সালাম বলবে এবং বলবে যে, আমি পঞ্চাশ বছর যাবত লোকদেরকে এ শিক্ষা দিয়ে আসছি যে, নিজের দ্বীনকে দুনিয়া উপার্জনের মাধ্যম বানিও না। আজ আমি নিজে আমার দ্বীনের বিনিময়ে কি করে দুনিয়া ভক্ষণ করব?

হযরত সিররী সাকতী (রহঃ) বলেন ঃ আল্লাহ তাআলা আমাকে যে ভাল অবস্থা দান করেছেন, তা সবই হযরত মারুফ কারখী (রহঃ)এর বরকতে লাভ করেছি। একদিন আমি ঈদের নামায পড়ে ফিরছিলাম। তখন হযরত মারুফ কারখী (রহঃ)কে দেখি, তিনি অবিন্যস্ত কেশধারী একটি শিশুকে সঙ্গে নিয়ে কোথাও যাচ্ছেন। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম ঃ এটি কে? তিনি বললেন ঃ আমি পথে দেখতে পেলাম, কিছু বালক খেলা করছে। আর এ বালকটি তাদের থেকে পৃথক হয়ে বিষন্ন মনে দাঁড়িয়ে আছে। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম ঃ তুমি কেন খেলছ না? সে উত্তর দিল ঃ আমি এতীম। হযরত সিররী সাকতী (রহঃ) বলেন ঃ আমি হযরত মারুফ কারখী (রহঃ)কে জিজ্ঞেস করলাম ঃ আপনি এ বালককে সঙ্গে নিয়ে কি করবেন? তিনি বললেন ঃ কোথাও থেকে কিছু বীচি সংগ্রহ করে তাকে দেব। সেগুলোর বিনিময়ে ছেলেটি আখরোট ক্রয় করে আনন্দিত হবে। আমি তখন বললাম ঃ ছেলেটিকে আমায় দিয়ে দিন। আমি তার দেখাশোনা করব। তিনি আমার নিকট হতে অঙ্গীকার নিলেন যে, সত্যি দেখাশোনা করব কিনা? আমি ওয়াদা করলাম। তিনি বললেন ঃ নিয়ে যাও। আল্লাহ তাআলা তোমার অন্তরকে ধনী করে দিন।

হযরত সিররী সাকতী (রহঃ) বলেন, হযরত মারুফ কারখী (রহঃ)এর

এই দু'আর বদৌলতে আমার অন্তরের অবস্থা এই হয়েছে যে, দুনিয়া আমার নিকট একটি তুচ্ছ বস্তুর তুলনায়ও তুচ্ছ মনে হয়।

এটিও হযরত সিররী সাকতী (রহঃ) এর ঘটনা, একবার তিনি অসুস্থ হলে কিছু লোক তাঁকে দেখতে আসে। হাদীসের দৃষ্টিতে রোগী দেখার সুন্নাত তরীকা এই যে, রোগীর সঙ্গে যার খোলামেলা সম্পর্ক নেই সে ব্যক্তি রোগীর নিকট অধিক সময় না থেকে বরং সংক্ষেপে রোগী দেখে চলে আসবে। যেন রোগীর কষ্ট না হয়। কিন্তু হযরত সিররী সাকতী (রহঃ)কে দেখতে আসা লোকগুলো দীর্ঘসময় তাঁর নিকট বসে থাকে। যাদের সঙ্গে খোলামেলা সম্পর্ক নাই এমন লোক রোগীর নিকট দীর্ঘ সময় বসে থাকলে স্বভাবতই রোগীর কষ্ট হয়ে থাকে। আগন্তুকদের দীর্ঘক্ষণ বসে থাকায় হযরতেরও কষ্ট হলো। বিদায়ের সময় তারা হযরতকে বলল, আমাদের জন্য দু'আ করুন। হযরত সাকতী (রহঃ) দু'আর জন্য হাত উঠিয়ে বললেন ঃ

হে আল্লাহ! আমাদেরকে রোগী দেখার আদব শিক্ষা দিন।

হযরত জুনায়েদ বাগদাদী (রহঃ)

বুযুর্গ শিরোমণি হযরত জুনায়েদ বিন মুহাম্মদ (রহঃ)এর পরিচয় দানের অপেক্ষা রাখে না। তিনি হযরত সিররী সাকতী (রহঃ)এর ভাগ্নে ও খলীফা ছিলেন। তাঁর পিতা ও পিতামহ 'নেহাদনদের' অধিবাসী ছিলেন। কিন্তু তার জন্ম ও প্রতিপালন ইরাকে হয়েছে। তিনি সুফীগণের নেতৃস্থানীয় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জাহেরী ইলেমেও অনেক বড় আলেম ছিলেন। তিনি ফেকাহ সংক্রান্ত বিষয়ে সাধারণতঃ ইমাম শাফেঈ (রহঃ)এর সাগরেদ ইমাম আবু সাওর (রহঃ)এর মাযহাব অনুসারে ফতওয়া প্রদান করতেন।

ইমাম আবু নাঈম ইস্পাহানী (রহঃ) তাঁর এ উক্তি বর্ণনা করেন যে, যে ব্যক্তির মধ্যে এই তিন গুণের সমাবেশ ঘটেনি সে অনুসরণযোগ্য নয়।

১. কুরআনের হাফেজ। ২. হাদীস লিপিবদ্ধ করার কাজে লিপ্ত থেকেছেন। ৩. ইলমে ফেকাহ অর্জন করেছেন।

তাঁর অসংখ্য বাণী ওলীআল্লাহগণ সংরক্ষণ করে আমাদের পর্যন্ত

পৌঁছিয়েছেন। যার মধ্যে ইলম, হিকমাত এবং ঈমানী ফারাসাতের (দূরদর্শিতা ও বিচক্ষণতা) ভাণ্ডার নিহিত রয়েছে। ইমাম আবু নাঈম ইস্পাহানী (রহঃ) তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'হুলিয়াতুল আউলিয়া'র দশম খণ্ডে ত্রিশ পৃষ্ঠাব্যাপী হযরত জুনায়েদ বাগদাদী (রহঃ)এর বাণী বর্ণনা করেছেন। সেখান থেকে দৃষ্টান্ত স্বরূপ কয়েকটি বাণী তুলে ধরা হলো ঃ

হযরত জুনায়েদ বাগদাদী (রহঃ)এর শ্রেষ্ঠ বাণী

১. যে ব্যক্তি মনে করে যে, সে আপন চেষ্টায় আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছবে, সে অনর্থক নিজেকে কষ্টে লিপ্ত রেখেছে এবং যে ব্যক্তি মনে করে যে, সে বিনা পরিশ্রমে আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছে যাবে, সে অলিক আশায় বিভোর।

—এ কথার অর্থ এই যে, আমল না করে শুধু শুধু আশা পোষণ করা এক ভ্রান্তি এবং চেষ্টা সাধনা করে সেজন্য অহংবোধ করা এবং শুধু তার উপর নির্ভর করে থাকাও আরেক ভ্রান্তি। সঠিক পথ হল চেষ্টায় লিপ্ত থাকার সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ তাআলার কাছে তার দয়া ও অনুগ্রহের অন্বেষী হওয়া, কেননা আল্লাহ তাআলার দয়া ও অনুগ্রহেই তাঁর নৈকট্য অর্জিত হয়।

২. তিনি বলেন ঃ যতক্ষণ তুমি কৃত পাপের জন্য সন্ত্রস্ত থাকবে এবং কদাচিত কোন পাপ হয়ে গেলে সেজন্য অনুতপ্ত হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত নিরাশ হয়ো না।

৩. তাঁর শায়েখ সিররী সাকতী (রহঃ) তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ শোকর (কৃতজ্ঞতা) এর প্রকৃত অর্থ কি? তিনি উত্তর দিলেন ঃ শোকর হলো ঃ আল্লাহ প্রদত্ত কোন নেয়ামতকে তার নাফরমানীর কাজে ব্যবহার না করা। হযরত সিররী সাকতী (রহঃ) তাঁর এ উত্তর শুনে অত্যন্ত আনন্দিত হলেন এবং পছন্দ করলেন।

৪. তিনি বলেন ঃ কোন মন্দ কাজ যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষের অন্তরে থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত তা কোন দোষের বিষয় নয়, তবে মনের এই কথা অনুযায়ী কাজে লিপ্ত হলে তা দোষণীয় ব্যাপার।

এ কথাটি হাকীমুল উম্মত হযরত থানভী (রহঃ)এর সেই বাণী ও ওয়াযের হুবহু অনুরূপ যাতে তিনি বলেন, মানুষ যতক্ষণ তার কুপ্রবৃত্তির

চাহিদা অনুযায়ী কাজ করবে না ততক্ষণ তার এ কুপ্রবৃত্তি ক্ষতির কারণ নয়।

৫. অন্যত্র তিনি এরশাদ করেন ঃ দুনিয়ার কোন ঘটনাই আমার কষ্টের কারণ হয়নি কেননা আমি মনে মনে এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি যে, পার্থিব জগত দুঃখ, দুর্দশা ও বিপদাপদের স্থান। তাই সে তো আমার নিকট অপ্রিয় বস্তু নিয়ে আসবেই—যদি কখনো সে পছন্দনীয় কোন বিষয় নিয়ে আসে তাহলে তা আল্লাহর দয়া। নইলে আসল কথা তো পূর্বেরটাই।

৬. একবার তাঁকে জিজ্ঞেস করা হল, দুনিয়া (যার থেকে দূরে থাকার তাকীদ করা হয়েছে) কি জিনিস? তিনি বললেন ঃ যা অন্তরে প্রবেশ করলে আল্লাহ থেকে গাফেল করে দেয়।

৭. একবার জনৈক ব্যক্তি তাঁকে জিজ্ঞেস করল, নফসের ব্যাধি স্বয়ং নফসের প্রতিষেধক কখন হয়? তিনি সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন ঃ যখন তুমি নফসের বিপরীত কাজ করবে, তখন তার ব্যাধিই তার প্রতিষেধক হয়ে যাবে। এখানে কয়েকটি উদাহরণ তুলে ধরা হলো মাত্র। নইলে তাঁর সকল বাণীই এ জাতীয় প্রজ্ঞাপূর্ণ ও জ্ঞানগর্ভ।

আবু বকর আত্‌তার (রহঃ) বলেন, হযরত জুনায়েদ বাগদাদী (রহঃ)এর মৃত্যুর সময় আমি তাঁর নিকট উপস্থিত ছিলাম। তিনি তখন বসে বসে নামায পড়ছিলেন। সেজদার সময় তাঁর পা ভাঁজ করে নিতেন। এক পর্যায়ে এ অবস্থাতেই তার পা থেকে প্রাণ বের হয়ে যায়, ফলে তা আর নাড়ানো সম্ভব হয় না। কিন্তু তিনি তখনও এবাদতে লিপ্ত থাকেন। জনৈক ব্যক্তি তাঁকে বলল ঃ আপনি শয়ন করলে ভাল হত। তিনি উত্তরে বললেন ঃ এটা তো আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে বিশেষ অনুগ্রহের মুহূর্ত। তারপর এ অবস্থাতেই তাঁর মৃত্যু হয়। আল্লাহু আকবার। তার মৃত্যু সন ২৯৭ হিজরী।

এই বুযুর্গ ত্রয়ের মাজার একই বেষ্টনীর ভিতরে অবস্থিত। তার আশে পাশে অনেক দূর পর্যন্ত কবরের ধারাবাহিকতা দৃষ্টিগোচর হয়। উক্ত বুযুর্গ ত্রয়ের মাজার সম্পর্কে তো অবগত হতে পারলাম, কিন্তু এই প্রাচীন কবরস্থানে জানি না জ্ঞান-গুণ পরহেযগারী এবং আমল ও সাধনার কত

রবি-শশী আত্মগোপন করে আছেন। বাগদাদ কয়েক শতাব্দী যাবত আলমে ইসলামের দারুল হুকুমাত এবং আলেম-ওলী, মুজাহিদ ও শহীদদের কেন্দ্র ছিল। তার কবরস্থানের প্রতিটি কোণ আলমে ইসলামের মহান ব্যক্তিদের নূরের আলোকে উদ্ভাসিত। কিন্তু পঞ্চদশ শতাব্দীর অপরিচিত এক মুসাফিরের জন্য সে সকল মহান ব্যক্তিদের সম্পর্কে অনুসন্ধান করে তাদের পরিচয় লাভ করা অসম্ভব ব্যাপার। শ্রদ্ধেয় আব্বাজানের একটি পংক্তি স্মরণ হলো—(কবিতা)

ڈھونڈیں ہم اب نقوش سبک رفتگاں کہاں؟

اب گردکارواں بھی نہیں کارواں کہاں؟

আমরা এখন পূর্বকালের মহান ব্যক্তিত্বদের পদচিহ্ন কোথায় অন্বেষণ করব?

কাফেলার পদধুলি ও অবশিষ্ট নেই কাফেলা কোথায় পাব?

তাই মোটামুটিভাবে কবরস্থানের সকল অধিবাসীদের জন্য ফাতেহা পাঠ করে বিদায় হওয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না।

কাজেমিয়্যাতে

উক্ত বুযুর্গদের মাজার জিয়ারতের পর আমরা হযরত মুসা আল কাজেম (রহঃ)এর পবিত্র মাজারে উপস্থিত হই। মাজারটি বাগদাদের পশ্চিমাংশ রাসাফাতে অবস্থিত। এই মাজার থাকার কারণে সম্পূর্ণ এলাকার নাম কাজেমিয়্যা হয়েছে। হযরত মুসা আল কাজেম (রহঃ) হযরত জাফর সাদিক (রহঃ)এর পুত্র। তিনি তাকওয়া, পরহেজগারী এবং জ্ঞান ও গুণে নবী পরিবারের গুণাবলীর ধারক বাহক এবং স্বীয় যুগে মুসলমানদের কেন্দ্রস্থল ও ইমাম ছিলেন। ইলমে হাদীস বিষয়েও তিনি ছিলেন উচ্চাসনের অধিকারী। ইমাম তিরমিযী (রহঃ) এবং ইমাম ইবনে মাজাহ্‌ (রহঃ) তাঁর হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি মদীনায় বসবাস করতেন। তৎকালীন খলীফা মাহদীর মধ্যে এই ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টি হয় যে, সম্ভবতঃ তিনি হুকুমতের বিপক্ষে বিদ্রোহ করবেন। ফলে খলীফা তাঁকে গ্রেফতার করেন। কিন্তু তাঁর গ্রেফতারী অবস্থায় হযরত আলী (রাঃ)এর

সঙ্গে স্বপ্নযোগে খলীফার সাক্ষাত হয়। খলীফা মাহদী স্বপ্নে দেখেন, হযরত আলী (রাযিঃ) মাহদীকে সম্বোধন করে এই আয়াত তেলাওয়াত করছেন—

فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَ تُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ

(سوره محمد۲۲)

অর্থ ঃ 'তোমাদের থেকে কি এরূপ প্রত্যাশা করব যে, তোমরা হুকুমাতের অধিকারী হলে পৃথিবীর বুকে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করবে।'

মাহদীর যখন ঘুম ভাঙল তখনও রাত্রের কিছু অংশ অবশিষ্ট ছিল। কিন্তু ভোর হওয়া পর্যন্ত তার অপেক্ষা করার সাহস হল না। সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রীকে ডেকে নির্দেশ দিলেন। এখনই হযরত মুসা কাজেমকে এখানে নিয়ে আস। তিনি আগমন করলে মাহদী সসম্মানে তাঁর সঙ্গে কোলাকুলি করলেন এবং পাশে উপবেশন করালেন। তারপর স্বপ্নের বৃত্তান্ত বর্ণনা করে বললেন যে, আপনি কি এ বিষয়ে আমাকে নিশ্চয়তা দিতে পারেন যে, আমি আপনাকে মুক্ত করে দিলে আপনি আমার বা আমার সন্তানদের বিপক্ষে বিদ্রোহ করবেন না? হযরত জবাব দিলেন ঃ আল্লাহর কসম, আমি কখনো এমন করিনি এবং তা আমার স্বভাবও নয়। একথা শুনে মাহদী তাঁকে তিন হাজার দিনার হাদীয়া পেশ করলেন এবং মুক্ত করে দিলেন। খলীফা মাহদীর উজির রবী' বলেন ঃ আমি রাতারাতি তাঁর এ নির্দেশ পালন করি এবং অন্য কোথাও কোন বাধার সৃষ্টি হতে পারে এ আশংকায় ভোরের আলো ফোটার পূর্বেই তাঁকে মদীনার পথে পাঠিয়ে দেই।

কিন্তু পরবর্তীকালে যখন হারুন-অর-রশীদ খলীফা হলেন, তখন তারও এ ধরনের ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টি হয়। ফলে তিনি যখন হজ্জ পালনের উদ্দেশ্যে হেজায যাত্রা করেন। তখন সেখান থেকে হযরত মুসা আল কাজেমকে সঙ্গে নিয়ে আসেন এবং দ্বিতীয়বার তাঁকে বাগদাদে বন্দী করে রাখেন। এই বন্দী অবস্থাতেই তাঁর মৃত্যু হয়। দ্বিতীয়বার বন্দীকালীন সময়ে তিনি হারুনুর রশীদকে সংক্ষিপ্ত যে পত্রটি লেখেন, তা সাহিত্য মান এবং

প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করার ক্ষেত্রে রাজকীয় ভূমিকা পালন করে এবং তা যতবারই পাঠ করা হয়, তার মধ্যে প্রজ্ঞা ও উপদেশের পূর্ণ এক জগত দৃষ্টিগোচর হয়। তাঁর এই পত্র—যার মধ্যে সাগরকে কলসে ভরা হয়েছে—প্রকৃত ভাব ও প্রতিক্রিয়া তো আরবী ভাষাতেই নিহিত রয়েছে, তবে বাংলায় তার ভাবার্থ নিম্নরূপ। তিনি বলেন ঃ

"আমার এ পরীক্ষার যে দিনটি অতিবাহিত হচ্ছে তা তোমার সুখ সাচ্ছন্দের একটি করে দিন সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছে। শেষ পর্যন্ত আমরা উভয়ে এমন এক দিবসে উপনীত হব, যা কখনই আর শেষ হবে না। সেদিন সেসব লোকের জন্য ধ্বংস অনিবার্য যারা ভ্রান্তির উপর আছে।"

হযরত মুসা কাজেম (রহঃ) কাশফ ও কারামতের অধিকারী এক বুযুর্গ ব্যক্তি ছিলেন। অধিক ইবাদত করার কারণে 'আল আবদুস সালেহ' (পুণ্যবান ব্যক্তি) তাঁর উপাধি প্রসিদ্ধ ছিল। তিনি দানশীলতার দিক দিয়েও এক অনন্য ব্যক্তিত্ব ছিলেন। যখন কারো সম্পর্কে অবগত হতেন যে, সে তাঁর গীবত করে তখন তার নিকট হাদীয়াস্বরূপ কিছু অর্থ পাঠিয়ে দিতেন। হারুন-অর-রশীদ কর্তৃক বন্দী অবস্থায় ৫ই রজব ১৬৩ হিজরীতে তিনি ইন্তেকাল করেন।

আল্লাহ তাআলা তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর মাজারকে এ সম্মানও দান করেছেন যে, বুযুর্গদের অভিজ্ঞতা এই যে, এখানে যে দু'আ করা হয়, আল্লাহ তাআলা তা কবুল করে থাকেন। আবু আলী খাল্লাল (রহঃ) বলেন ঃ আমার যখনই কোন সমস্যা দেখা দেয়, তখনই আমি হযরত মুসা বিন জাফর (রহঃ)এর মাজারে গিয়ে তাঁর উছীলা দিয়ে দু'আ করে থাকি। ফলে আল্লাহ তাআলা সব সময় আমার লক্ষ্য অর্জনকে সহজ করে দেন।

কবর যিয়ারত সংক্রান্ত বিষয়ে এতটুকু তো ঠিক আছে, কিন্তু এ বিষয়ের সীমারেখা সম্পর্কে অনবহিত ও নির্বোধ ভক্তরা এই মহান বুযুর্গ ব্যক্তির মাজারকে কি যে বানিয়েছে, তার শেষ নেই। সর্বদা সেখানে বিদআত ও ভ্রান্ত বিশ্বাসের এমন প্লাবন প্রবাহিত যে, সুন্নাত মোতাবেক কবর যিয়ারতকারীর জন্য সেখানে অল্পসময় অবস্থান করাও দুস্কর।

শিয়াদের নিকট হযরত মুসা কাজেম (রহঃ) দ্বাদশ ইমামের অন্যতম।

তাই তারা তাঁর মাজারের উপর যে সৌধ নির্মাণ করেছে, তা স্থাপত্য শিল্পের এক আদর্শ। তার মিনার ও দরজার উপর স্বর্ণগলানো পানির প্রলেপ দেওয়া হয়েছে। দূর থেকে তা জলজল করে। মাজারে সবসময় এক মেলার দৃশ্য বিরাজ করছে। কেউ মাজার সৌধের সৌন্দর্য অবলোকন করতে আসছে। কেউবা তাকে নিজের কাবা বানিয়েছে এবং মাজারের জাফরী চুম্বন করে করে তা প্রদক্ষিণ করছে। (আল্লাহ রক্ষা করুন) কেউ মাজারওয়ালাকেই অভাব মোচনকারী মনে করে তাঁর সমীপে স্বীয় উদ্দেশ্য প্রার্থনা করছে। মাজারের আশপাশে অনেক দূর পর্যন্ত যিয়ারতকারীদের অবস্থানের জন্য সব ধরনের হোটেল তৈরী হয়েছে। কিছু লোক মাজার জিয়ারত করানোর জন্য যথানিয়মে গাইড হয়ে আছে। কিছু লোক সেখানে ফুলের ব্যবসা করছে। মাজারে আগমনকারীরা তাদের নিকট হতে ফুল ক্রয় করে মাজারের নামে উৎসর্গ করছে। কিছু লোক নগদ অর্থ ও মুদ্রা মাজারের জালির ভিতর নিক্ষেপ করছে এবং একেই নিজের মুক্তির উপায় বলে বিশ্বাস করছে। অজ্ঞতা ও ভ্রান্ত বিশ্বাসের এই বন্যায় কারো জন্য একথা ভাবার অবকাশও নেই যে, মাজারে শায়িত ব্যক্তি এসব অসাড় কাজ থেকে মুক্ত ও পবিত্র। মৃত্যুর পর তাঁর ক্ষমতা থাকলে তাঁর মাজার সুন্নাত মোতাবেক সাদামাটা একটি কাঁচা কবর ছাড়া অন্য কিছু হতে পারত না। কবর পাকা হত না। তার উপর জৌলুসপূর্ণ সৌধ নির্মাণ হত না। কারো সেখানে বিদআত ও শিরকের সামান্যতম গন্ধযুক্ত কোন কাজে লিপ্ত হওয়ার সাধ্যও কারো হত না।

বিদআত ও প্রচলিত প্রথার এও একটি বৈশিষ্ট্য যে, বিশ্বব্যাপী তার নির্ধারিত কোন রূপ থাকে না। বরং প্রত্যেক অঞ্চলে তা ভিন্ন ভিন্ন রূপে দেখা দেয়। কুরআন ও হাদীসে যেহেতু বিদআত ও কুসংস্কারের জন্য কোন নির্ধারিত ভিত্তিই বর্ণিত হয়নি, (কারণ কুরআন-হাদীস তো আল্লাহর সন্তুষ্টির পথ বাতলে দেওয়ার জন্য আর বিদআত হলো আল্লাহর ক্রোধের পথে) বিধায় প্রত্যেক অঞ্চলের মানুষ তাদের মন মত কিছু প্রথা তৈরী করে নেয়। অনেক সময় অন্য অঞ্চলের মানুষের তা জানাও থাকে না। ফলে সে অঞ্চলের মানুষ অন্য কোন প্রথার অনুসারী হয়ে যায়। এ মাজারে প্রচলিত বিদআতসমূহের মধ্যেও এ বিষয়টি আমার দৃষ্টিগোচর

হল। ইরাকের মাজারগুলোতে এমন কিছু প্রথাও দেখতে পেলাম, যা আমাদের পাকিস্তান এবং হিন্দুস্থানেও দেখেছি এবং এমন নতুন কিছু প্রথাও দৃষ্টিগোচর হল, যা আমাদের দেশে প্রচলিত নেই। বুযুর্গদের মাজারে সংঘটিত এ সকল বাড়াবাড়ি দেখে এক অসহায় মুসাফির ব্যথিত হওয়া এবং যে সকল স্বার্থান্ধ, লোভী সহজ সরল ও অশিক্ষিত জনগণকে বুযুর্গদের প্রকৃত শিক্ষার সঙ্গে পরিচিত না করে বিদআত ও কুসংস্কারে লিপ্ত করে রেখেছে, তাদের জন্য হেদায়াতের দু'আ করা ছাড়া আর কিই বা করতে পারে?

ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ)এর মাজারে

হযরত মুসা আল-কাজেম (রহঃ)এর মাজারের বেষ্টনীর মধ্যেই দক্ষিণ দিকে 'জামে আবি ইউসুফ' নামে একটি মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে। ঐ মসজিদেরই একাংশে হযরত ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ)এর মাজার অবস্থিত। হযরত মুসা কাজেম (রহঃ)এর মাজার জিয়ারতের পর সেখানে গেলাম। হযরত ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) মুসলিম উম্মাহর সে সকল মহান কৃপাশীলদের অন্যতম, যাঁদের দয়া ও অনুগ্রহের বোঝায় এ উম্মাতের গর্দান চিরদিন অবনত থাকবে। বিশেষভাবে হানাফী মাযহাবের অনুসারীদের জন্য তাঁর খেদমত অবিস্মরণীয়। তিনি একজন ফকীহ হিসাবে তাঁর শায়খ হযরত ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)এর জ্ঞানধারা উম্মাতের নিকট স্থানান্তর করেছেন—শুধু তাই নয়, বরং প্রধান বিচারপতি হিসাবে এই ফিকাহকে নিরেট মতবাদের অবস্থান থেকে বের করে বাস্তব জীবনে তা প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

হযরত ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ)এর পিতা ইবরাহীম তাঁর বাল্যকালেই ইহজগত ত্যাগ করেন। তাঁর আম্মা জীবিকা নির্বাহের প্রয়োজনে তাঁকে এক ধোপার হাতে অর্পণ করেন। কিন্তু তাঁর লেখাপড়া করার প্রবল আগ্রহ থাকায় তিনি ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)এর ক্লাসে অংশগ্রহণ করতে থাকেন। তাঁর মা একথা জানতে পেরে তাঁকে ক্লাসে আসতে বারণ করেন, ফলে কয়েকদিন তিনি ক্লাসে অনুপস্থিত থাকেন। মেধাবী ও আগ্রহী ছাত্রের প্রতি শিক্ষকের মনোযোগ থাকা এক সহজাত

বিষয়। কয়েকদিন পর তিনি ক্লাসে উপস্থিত হলে ইমাম সাহেব তাঁর অনুপস্থিতির কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি পূর্ণ বৃত্তান্ত তুলে ধরেন। হযরত ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) ক্লাস শেষ হওয়ার পর তাঁকে নিকটে ডেকে নিয়ে একশত দিরহামে পূর্ণ একটি থলে তাঁর হাতে দিয়ে বললেন ঃ এগুলো দিয়ে কাজ চালাও, আর শেষ হয়ে গেলে আমাকে জানাবে। হযরত ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) নিজেই বলেন ঃ এর পর কখনো থলে শেষ হওয়ার কথা ইমাম সাহেবকে বলতে হয়নি, সর্বদা এমন হত যে, টাকা শেষ হয়ে গেলেই ইমাম সাহেব নিজে অতিরিক্ত টাকা দান করতেন। অবস্থা দৃষ্টে মনে হয় যে, আমার টাকা শেষ হওয়ার ব্যাপারে তাঁর নিকট ইলহাম হত। তাঁর মাতা সম্ভবতঃ একথা ভেবে যে, এই ধারা কতদিন চলতে পারে, উপার্জনের ভিন্ন এক ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন, তাই একবার তিনি ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)কে বললেন ঃ আমার এ সন্তান একটি ইয়াতীম বালক, আমি চাই সে কোন কাজ শিখে উপার্জন করার যোগ্য হউক। অতএব আপনি তাকে আপনার ক্লাসে অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত রাখুন। তখন হযরত ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) উত্তরে বললেন ঃ আপনার সন্তান তো পেস্তা ও ঘিয়ে তৈরী ফালুদা ভক্ষণ করার শিক্ষা অর্জন করছে। কথাটিকে রসিকতা ভেবে তাঁর মাতা চলে গেলেন।

তবে ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) নিজেই বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ তাআলা আমাকে এই ইলমের বদৌলতে প্রধান বিচারপতির সম্মানিত ও মর্যাদাপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত করেন। তৎকালীন খলীফা হারুনুর রশীদের দস্তরখানে অনেক সময়ই আমার খাদ্য গ্রহণের সুযোগ হত। একদিন আমি খলীফা হারুনুর রশীদের সঙ্গে বসা ছিলাম, তখন তিনি আমাকে একটি পেয়ালা দিয়ে বললেন ঃ এটি বিশেষ মূল্যবান একটি বস্তু, যা আমার জন্যও কদাচিত তৈরী করা হয়। আমি জিজ্ঞেস করলাম, আমিরুল মুমিনীন! এটি কি জিনিস? তিনি বললেন, এটি পেস্তা ও ঘি সহযোগে তৈরী ফালুদা। একথা শুনে আমি বিস্মিত হলাম এবং আমার হাসি পেল। খলীফা হারুনুর রশীদ আমার হাসির কারণ জিজ্ঞেস করলে, আমি পূর্ণ ঘটনাটি খুলে বললাম। তখন তিনি অবাক হয়ে বললেন ঃ আল্লাহ তাআলা ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)এর উপর রহমত বর্ষণ করুন।

তিনি স্বীয় জ্ঞানচক্ষু দ্বারা এমন কিছু দেখতেন, যা বাহ্যিক চোখ দ্বারা দেখা সম্ভব নয়।

আল্লাহ তাআলা হযরত ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ)কে হযরত ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)এর ছোহবতের বরকতে ইলম ও ফিকাহ শাস্ত্রে এমন মর্যাদা দান করেছিলেন, যা খুব কম লোকেই পেয়ে থাকে। ইলমে ফিকাহ ছাড়া ইলমে হাদীসেও তাঁর উচ্চাসন সর্বজন স্বীকৃত। এমন কি যারা ভুল বুঝাবুঝির কারণে হযরত ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) এবং ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ)এর উপর ইলমে হাদীস সম্পর্কে আপত্তি করে থাকে, তারাও হাদীস বিষয়ে ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ)কে নির্ভরযোগ্য (ছিকাহ) বলে স্বীকৃতি দানে বাধ্য হন। বরং ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহঃ) বলেন, আমি যখন ইলমে হাদীস শিক্ষা করতে ইচ্ছা পোষণ করলাম, তখন সর্বপ্রথম কাজী আবু ইউসুফ (রহঃ)এর নিকট গমন করি। তারপর অন্যান্য শায়েখদের নিকট থেকে ইলম হাসিল করি।

হযরত ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)এর মৃত্যুর পর তিনি প্রায় সতের বছর বিচারপতির (কাজী) গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, এবং ইসলামের ইতিহাসে 'কাজিউল কুজাত' (চিফ জাষ্টিস) উপাধি সর্বপ্রথম তাঁর জন্যই ব্যবহার করা হয়। হযরত ইয়াহইয়া ইবনে মুঈন (রহঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, প্রধান বিচারপতির দায়িত্বে ভীষণ ব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও তিনি তাঁর দায়িত্ব প্রতিদিন সুচারুরূপে পালনের সাথে সাথে দিন-রাতে প্রত্যহ দুইশত রাকাত নফল নামায আদায় করতেন।

হযরত ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ)কে সর্বপ্রথম খলীফা মূসা ইবনে মাহদী কাজী নিযুক্ত করেন। ঘটনাচক্রে একজন সাধারণ নগরবাসীর সঙ্গে একটি বাগান নিয়ে স্বয়ং খলীফারই বিবাদ সৃষ্টি হয়, তখন এ ব্যাপারে কাজী আবু ইউসুফ (রহঃ)এর নিকট মোকদ্দমা দায়ের করা হয়। খলীফা মূসার পক্ষ থেকে বাগানের উপর তাঁর মালিকানার সাক্ষ্য পেশ করা হয়। সাক্ষীদের সাক্ষ্য অনুযায়ী বাহ্যত খলীফার পক্ষেই রায় হওয়ার ছিল, কিন্তু ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ)এর কিছুটা সন্দেহ সৃষ্টি হয় যে, সাক্ষীদের সাক্ষ্য দ্বারা যেমনটি প্রকাশ পাচ্ছে, প্রকৃত সত্য হয়ত তার বিপরীত। তাই তিনি মূসা ইবনে মাহদীকে আদালতে তলব করে বললেন যে, আমিরুল

মুমিনীন! আপনার বিপক্ষের দাবী এই যে, আপনার সাক্ষীদের সাক্ষ্য সত্য হওয়ার ব্যাপারে আপনার নিকট থেকে শপথ নেওয়া হোক।

আদালতের সাধারণ আইনানুসারে বাদী তার দাবীর পক্ষে নির্ভরযোগ্য সাক্ষী পেশ করলে বাদীকে শপথ করতে বাধ্য করা যায় না, তাই খলীফা মূসা জিজ্ঞেসা করলেন ঃ আপনার মতে বাদীর নিকট থেকে এভাবে শপথ নেওয়া চলে কি? ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) উত্তর দিলেন ঃ কাজী ইবনে আবী লায়লা বাদীর নিকট থেকে শপথ নেওয়া জায়েয মনে করতেন। খলীফা এমন বৈষয়িক বিষয়ে শপথ করা পছন্দ করলেন না। তিনি বললেন ঃ আমি বাগানের ব্যাপারে বিবাদী থেকে আমার দাবী প্রত্যাহার করলাম।

সুতরাং বিবাদীকে সে বাগান দিয়ে দেওয়া হয়।

সতের বছর প্রধান বিচারপতির কঠিন দায়িত্ব পালন করার পর যখন মৃত্যুর সময় হল, তখন ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) একবার বলেন ঃ আমি সজ্ঞানে কোন মোকদ্দমায় অন্যায় বিচার করিনি। সর্বদা কুরআন ও হাদীসের আলোকে রায় প্রদানের চেষ্টা করেছি। কখনো কোন মাসআলায় জটিলতা দেখা দিলে ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)এর কথার উপর নির্ভর করেছি, কেননা আমার জানামতে তিনি আল্লাহ তাআলার বিধানের শ্রেষ্ঠতম ভাষ্যকার ছিলেন।

হযরত মারূফ কারখী (রহঃ) (যার কিছু আলোচনা এ সফরনামায় হয়েছে) ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ)এর সমসাময়িক ছিলেন। একদিন তিনি তাঁর জনৈক মুরীদকে বললেন ঃ ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) অসুস্থ। যদি তিনি মারা যান, তাহলে আমাকে অবশ্যই অবহিত করবে। (তাঁর জানাযায় অংশগ্রহণ উদ্দেশ্য ছিল)

সেই ব্যক্তি বলেন ঃ আমি ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ)এর পরিস্থিতি জানার জন্য তাঁর বাড়ী গেলে সেখান থেকে তাঁর জানাযা বের হতে দেখি। তখন আমি চিন্তা করলাম যে, হযরত মারূফ কারখীকে তাঁর মৃত্যুর সংবাদ জানাবো এবং তিনি জানাযায় অংশগ্রহণ করবেন, এত সময় আমার হাতে নেই। তাই আমি নিজে তাঁর জানাযা নামাযে শরীক হই এবং পরে হযরত মারূফ কারখী (রহঃ)কে সব ঘটনা খুলে বলি। হযরত

মারূফ কারখী (রহঃ) বারবার ইন্না লিল্লাহে ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন পড়তে থাকেন। এবং জানাযায় অংশগ্রহণ করতে না পারায় অত্যন্ত আফসোস প্রকাশ করতে থাকেন।

একজন আলিম ব্যক্তি যিনি দীর্ঘ সতের বছর প্রধান বিচারপতির গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। তাঁর সম্পর্কে সমসাময়িক লোকদের খারাপ ধারণা সৃষ্টি না হলেও অন্ততঃপক্ষে তাঁর বুযুর্গী এবং পরহেযগারী সম্পর্কে এমন মনোভাব অবশিষ্ট থাকে না যে, হযরত মারূফ কারখী (রহঃ)এর মত মহান বুযুর্গ তাঁর জানাযায় অংশগ্রহণ করতে না পারায় ব্যথিত হবেন। তাই বোধ হয়, মুরীদ লোকটি হযরত মারূফ কারখী (রহঃ)কে জিজ্ঞেস করল যে, তাঁর জানাযায় অংশগ্রহণ করতে না পারায় আপনার এত আফসোস হচ্ছে কেন? হযরত মারূফ কারখী (রহঃ) বললেন ঃ আমি (হয়ত স্বপ্নযোগে) দেখি যে, আমি যেন জান্নাতে গিয়েছি। সেখানে একটি মহল তৈরী করা হয়েছে, যার দরজায় পর্দা ঝুলানো রয়েছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম ঃ এ মহলটি কার? আমাকে উত্তর দেওয়া হল ঃ এটা কাজী আবু ইউসুফ (রহঃ)এর মহল। আমি জিজ্ঞেসা করলাম ঃ কোন্ আমলের বদৌলতে তিনি এমন মর্যাদা পেলেন? উত্তর দেওয়া হল ঃ তিনি মানুষকে সৎকাজ করার শিক্ষা দিতেন, নিজেও সৎকাজ করতে লালায়িত ছিলেন এবং মানুষ তাঁকে অনেক কষ্ট দিয়েছে।

হযরত ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)এর মাজারে

আমরা যখন হযরত ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ)এর মাজার থেকে বের হই, তখন সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়ার উপক্রম ছিল। হযরত ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)এর মাজারে যাওয়ার এক অদম্য বাসনা তখন আমাদের অন্তরে বিরাজ করছিল, কিন্তু এখান থেকে মাজার বেশ দূরে। আমাদের সৌভাগ্য যে, আমাদের ড্রাইভার শুধুমাত্র গাড়ীর ড্রাইভিংই করেনি, বরং মেহমানদের আতিথ্যের দায়িত্বও অতি নিষ্ঠা ও ভালবাসার সঙ্গে পালন করেছেন। তিনি আমাদেরকে মাগরিব নামাযের সময় 'জামে আল ইমাম আল আযম'–এ পৌঁছে দেন।

এখানে হযরত ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)এর মাজার অবস্থিত থাকায় সম্পূর্ণ অঞ্চল 'আযমীয়া' নামে প্রসিদ্ধ। বর্তমানে এ অঞ্চল তো শহরের জৌলুসপূর্ণ এলাকা, কিন্তু হযরত ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)এর যুগে এটি শুধু একটি কবরস্থান ছিল। খলীফার দাসী খাইজুরান এখানে সমাধিস্থ হওয়ায় কবরস্থান 'মাকবারায়ে খাইজুরান' নামে প্রসিদ্ধ। খতীবে বাগদাদী (রহঃ) স্বীয় প্রণীত তারীখে বাগদাদ গ্রন্থে লিখেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবন চরিতের বিখ্যাত রাবী মুহাম্মদ ইবনে ইসহাকও এই কবরস্থানে সমাধিস্থ আছেন। কিন্তু বর্তমানে অন্যান্য কবর নিশ্চিহ্ন হয়ে সেখানে জনবসতি গড়ে উঠেছে, তবে হযরত ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)এর মাজার এখনো অবশিষ্ট আছে।

নিকটেই 'জামে আল ইমাম আবি হানীফা' নামে এক বিশাল মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে।

আমরা যখন মসজিদের দরজায় পৌঁছলাম, তখন মাগরিবের আযানের মন মাতানো সমধুর আওয়াজ প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল। আমরা মাযারে যাওয়ার পূর্বে মাগরিব নামায মসজিদে আদায় করি। তারপর অন্তরে ভক্তি ও আবেগের তরঙ্গ নিয়ে মাজারে উপস্থিত হই। এমন মনে হচ্ছিল যেন, শান্তি, পুলক ও নূরানী আলো মূর্তিমান হয়ে পবিত্র মাজারের চতুর্পার্শ্বে বেষ্টনী সৃষ্টি করেছে। সম্মুখে সেই প্রিয়তম ব্যক্তিত্ব সুখনিদ্রায় শায়িত, যাঁর সঙ্গে বাল্যকাল থেকেই এমন হৃদ্যতা ও শ্রদ্ধাপূর্ণ গভীর সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত যে, তাঁর মহিমান্বিত নাম উচ্চারিত হতেই হৃদয়ে ভক্তি ও ভালবাসার অসংখ্য ফোয়ারা উৎসারিত হচ্ছে বলে অনুভূত হয়।

হযরত ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) কুফা নগরীতে যখন জন্মগ্রহণ করেন, তখন এই নগরী জ্ঞান-বিজ্ঞানের কেন্দ্রস্থল ছিল। তার প্রতিটি কোনায় বড় বড় মুহাদ্দিস ও ফকীহদের শিক্ষার আসর সজ্জিত ছিল। তৎকালে ইলমে হাদীসের কোন ছাত্র কুফার আলেমগণ থেকে অমুখাপেক্ষী হতে পারত না। হযরত ইমাম সাহেবের শ্রদ্ধেয় পিতার নাম 'ছাবেত'। ইমাম সাহেবের বাল্যকালেই তিনি ইন্তেকাল করেন। এক বর্ণনামতে তাঁর মা পরে হযরত জাফর ছাদিক (রহঃ)এর সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। এবং ইমাম সাহেব তাঁর প্রতিপালনে বড় হন।

প্রথম দিকে হযরত ইমাম সাহেব বেশীর ভাগ সময় ব্যবসায় লিপ্ত থাকার সঙ্গে সঙ্গে ইলমে আকায়িদ এবং ইলমে কালামের সঙ্গে সম্পর্ক রাখেন। হযরত আমের ইবনে সুরাহীল শা'বী (রহঃ) তাঁর মধ্যে মেধা ও প্রতিভার লক্ষণ প্রত্যক্ষ করে তাঁকে ইলম অর্জনে মনোযোগী হওয়ার জন্য উপদেশ দেন। উপদেশ কার্যকর হল। তিনি ব্যবসার কাজ পরিহার করে ইলম অর্জন করাকে নিজের সর্বস্বরূপে গ্রহণ করেন। এবং তৎকালীন বড় বড় শায়েখের নিকট থেকে জ্ঞান অর্জন করেন। এমনকি কেউ কেউ ইমাম সাহেবের উস্তাদ সংখ্যা ৪ হাজারও বলেছেন।

পরবর্তীতে আল্লাহ তাআলা হযরত ইমাম সাহেবের মাধ্যমে দ্বীন ও ইলমের যে খিদমত নিয়েছেন তা বলার অপেক্ষা রাখে না। আর তারই ফলে অর্ধেকেরও বেশী মুসলিম বিশ্ব কুরআন ও হাদীসের ব্যাখ্যা ও বিবৃতিতে তাঁকেই নিজেদের ইমাম এবং অনুসরণীয় স্বীকার করে নিয়েছে।

হযরত ইমাম সাহেব (রহঃ) প্রথম দিকে কুফাতেই অবস্থান করেন। কিন্তু কুফার শাসক ইবনে হুবায়রা রাজনৈতিক কিছু কারণে তাঁকে বন্দী করেও ক্ষান্ত হননি বরং অনেক প্রকার নির্যাতন নিপীড়নও করেছেন। অবশেষে তিনি বন্দী জীবন থেকে মুক্তি লাভ করে তার অত্যাচার উৎপীড়ন থেকে আত্মরক্ষার জন্য পবিত্র মক্কা অভিমুখে যাত্রা করেন এবং কয়েক বৎসর তিনি সেখানেই অবস্থান করেন। পরবর্তীতে ইরাকের অবস্থা অনুকূল হলে পুনরায় তিনি ইরাকে চলে আসেন। সে সময় আব্বাসী খেলাফতের সূচনা হচ্ছিল। প্রথম দিকে তিনি এই আশায় আব্বাসী খেলাফতকে স্বাগত জানান যে, তারা ধর্মীয় দিক থেকে বনী উমাইয়ার তুলনায় উৎকৃষ্ট প্রমাণিত হবে। কিন্তু যখন এই আশা ফলপ্রসূ হল না, তখন আব্বাসী খলীফাদের সঙ্গেও তার মতবিরোধ শুরু হয়। খলীফা মনসূর তার শাসনামলে চাইতেন যে, ইমাম সাহেব সরকারী কোন পদ গ্রহণ করুন। এতে করে তিনি জনগণের উপর তাঁর সমর্থন ও সহযোগিতার প্রভাব ফেলতে সক্ষম হবেন। কিন্তু হযরত ইমাম সাহেব (রহঃ) কোন পদ গ্রহণ করতে প্রস্তুত ছিলেন না। কারণ, তাতে করে শরীয়ত পরিপন্থী কিছু বিষয়ে সরকারী নির্দেশ পালন করতে হবে। পরিশেষে যখন অধিক পীড়াপীড়ি চলতে থাকে তখন তিনি বাগদাদের

রাজমিস্ত্রীদের তত্ত্বাবধান করা এবং ইট গণনা করার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে মনসুরের পক্ষ থেকে তাঁকে বিচারপতির পদ গ্রহণ করার জন্য পীড়াপীড়ি করা হয়। কিন্তু হযরত ইমাম সাহেব (রহঃ) কোনভাবেই তাতে রাজী হননি। যার প্রতিশোধে মনসুর তাঁকে কয়েদ করার সাথে সাথে ১১০টি বেত্রাঘাতও করেন। উপরন্তু কোন কোন বর্ণনা দ্বারা ইহাও জানা যায় যে, সেই বন্দী অবস্থাতেই তাঁর মৃত্যু হয়। আর কোন কোন বর্ণনা দ্বারা জানা যায়, তাঁর মুক্তি হয়েছিল ঠিকই তবে সরকারের পক্ষ থেকে ফতুয়া প্রদান করা এবং বাড়ীর বাহিরে লোকজনের সঙ্গে মেলামেশা নিষিদ্ধ করা হয়। এ অবস্থাতেই মৃত্যুর নির্ধারিত সময় এসে যায় এবং তিনি ইহধাম ত্যাগ করেন। এমনিভাবে বাগদাদের এই ভূখণ্ড তাঁর আরামকেন্দ্র হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করে।

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, যে জায়গায় ইমাম আযম (রহঃ)এর মাজার অবস্থিত, তা পূর্বে মাকবারাতুল খাইজোরান নামে একটি প্রসিদ্ধ কবরস্থান ছিল, কিন্তু ইমাম সাহেবকে দাফন করার পর তা 'আযমিয়া' নামে প্রসিদ্ধ হয়। হযরত ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)এর ভক্ত–অনুসারীগণ এখানে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন, এবং সেখানে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার কাজ আরম্ভ করেন। এই মসজিদই বিস্তৃত হতে হতে বিশাল এক মসজিদের রূপ লাভ করে। এই মসজিদের পৃথক ও পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রয়েছে। মসজিদের বর্তমান ইমাম সাহেব সে সম্পর্কে একটি গ্রন্থও প্রণয়ন করেছেন। হযরত ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)এর মাজার সর্বদা সকল শ্রেণীর মানুষের লক্ষ্যস্থলে পরিণত হয়। বরং খতীবে বাগদাদী (রহঃ) ইমাম শাফেয়ী (রহঃ)এর এ উক্তি তাঁর পছন্দের বলে বর্ণনা করেন—

انی لا تبرک بابی حنیفة، واجیئ الی قبره فی کل یوم یعنی زائرا - فاذا عرضت لی حاجة صلیت رکعتین، وجئت الی قبره وسألت الله تعالی الحاجة عنده فما تبعد عنی حتی تقضی - (تاریخ بغداد ۱/۱۲۳)

অর্থ ঃ আমি ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)এর বরকত অর্জনের লক্ষ্যে প্রত্যহ তাঁর কবরে গমন করি এবং আমার কোন প্রয়োজন দেখা দিলে দু' রাকাত নামায পড়ে তাঁর কবরে গিয়ে আল্লাহ তাআলার নিকট আমার অভাব মোচনের জন্য দু'আ করি, আল্লাহ তাআলা অতিসত্বর আমার অভাব মোচন করে দেন।

এ কথাটি তো খুবই প্রসিদ্ধ যে, একদা ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) হযরত ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)এর মাজারে গমন করে তাঁর মাযহাবের বিপরীত দু'আ কুনুত না পড়েই ফজর নামায আদায় করেন। কারণ হযরত ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) ফজর নামাযে দু'আ কুনুত পাঠ করতেন না। হযরত ইমাম সাহেবের মাজারে বসে এমন পুলক ও প্রশান্তি অনুভূত হল, যেমন কোন শিশু তার মায়ের ক্রোড়ে গিয়ে শান্তি লাভ করে। মন চাচ্ছিল এ অবস্থা দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হোক, কিন্তু অনেক সময় হয়েছিল তাই না উঠে গত্যন্তর ছিল না। ফলে ভারাক্রান্ত হৃদয়ে সেখান থেকে বিদায় নেই।

বিভিন্ন কুতুবখানায়

রাত হয়ে গিয়েছিল। ইমাম সাহেবের মাজার জিয়ারতের পর স্থানীয় বাণিজ্যিক কুতুবখানা থেকে এমন কিছু কিতাব ক্রয় করার ইচ্ছা ছিল, যেগুলো পাকিস্তানে পাওয়া যায় না। তাই সেখান থেকে বাগদাদের সর্বাধিক জৌলুসপূর্ণ এবং কেন্দ্রীয় এলাকা 'আল বাবুশ শারকী' যাই। অনেক দিন হতে আমার ধারণা ছিল যে, বাগদাদের জগদ্বিখ্যাত কুতুবখানা 'মাকতাবাতুল মুছান্না' বিশ্বের সর্বাধিক আরবী গ্রন্থ সংগ্রাহক। পাকিস্তানে থাকতে আমি এই কুতুবখানার গ্রন্থ তালিকা চেয়ে পাঠিয়েছিলাম। তালিকাটি ছিল শত শত পৃষ্ঠা সম্বলিত। তাই আমরা আমাদের গাইড আবদুর রাজ্জাক সাহেবের নিকট সেখানে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করি। আমাদের ধারণা ছিল যে, এই কুতুবখানা থেকেই আমরা এত অধিক কিতাব পেয়ে যাব যে, আর অন্য কোথাও যাওয়ার আবশ্যক হবে না। কিন্তু ঠিকানা জিজ্ঞাসা করতে করতে মাকতাবা আল মুছান্নাতে পৌছে আমাদের বিস্ময়ের অন্ত রইল না। কারণ এটি ছিল ছোট্ট একটি

দোকান। যার ভিতর গ্রন্থের চেয়ে বিক্রয়ের জন্য ষ্টেশনারী সামগ্রীই ছিল বেশী। আমার ধারণা হল হয়ত আমরা ভুল জায়গায় চলে এসেছি। কিন্তু খোঁজ নিয়ে জানতে পারলাম, মাকতাবা আল মুছান্নার এখন আর সেই পূর্বের অবস্থা নেই। সম্ভবতঃ মূল মালিক মৃত্যুবরণ করেছে এবং উত্তরাধিকারীদের মধ্যে তা ভালভাবে সামলানোর মত কেউ নেই। ফলে তা লোপ পেতে পেতে নভেল, কাহিনী ও ষ্টেশনারী সামগ্রীর দোকানে পরিণত হয়েছে। যুগের পালাবদলের এ দৃশ্য এতই শিক্ষণীয় ছিল যে, দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত হৃদয়ে এর প্রভাব বিদ্যমান থাকে, মানুষ জগতের কোন্ বস্তুর উপর ভরসা করতে পারে?

আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন ঃ

مَا عِنْدَكُمْ يَنفَدُ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ بَاقٍ –

"তোমাদের নিকট যা কিছু আছে তা ধ্বংস হয়ে যাবে এবং আল্লাহর নিকট যা কিছু আছে তা চিরদিন থাকবে।" —আল কুরআন

তারপর আশপাশের কুতুবখানাসমূহ থেকে কিছু কিতাব ক্রয় করি কিন্তু যখন জানতে পারলাম যে, ইরাকের এক দীনারের সরকারী মূল্য ৪ ডলার, অর্থাৎ, পাকিস্তানী ৬৫ রুপিয়া। তখন আর অধিক ক্রয় করার সাহস রইল না। তবে সুবর্ণ সুযোগ এই ছিল যে, অধমের সফরসঙ্গী জনাব কারী বশীর আহমাদ সাহেব সৌদীর খোলা বাজার থেকে কিছু ইরাকী দীনার, প্রতিটি প্রায় এক ডলার মূল্যে ক্রয় করে এনেছিলেন। তাই যেসব কিতাব ক্রয় করেছি, তাতে খুব বেশী লোকসান হয়নি, উপরন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং কাজের কিছু কিতাব আমরা ক্রয় করি, কিন্তু অধিক ক্রয় করলে দাম বেশী পড়ে যাবে—তাছাড়া অন্যান্য কুতুবখানা ঘুরে দেখার পর এও অনুমান হল যে, সম্ভবত যুদ্ধের কারণে কিতাবের তেমন বৃহৎ ভাণ্ডার এখন আর বাগদাদে নেই, বিধায় সামান্য কিছু কিতাব ক্রয় করে তাতেই সন্তুষ্ট হয়ে হোটেলে ফিরে আসি।

ওয়াকফ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে

পরদিন সকাল দশটায় নিমন্ত্রণকারীগণ আমাদেরকে ওয়াকফ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে দাওয়াত করেছিল। সেখানে ইরাকের ওয়াকফ বিষয়ক মন্ত্রী আবদুল্লাহ ফাজেল সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাত হয়। তিনি অত্যন্ত ভদ্র, হাসি-খুশী, মিশুক এবং জ্ঞানবন্ধু ব্যক্তিত্ব। ইতিপূর্বে তিনি পাকিস্তান এলে দারুল উলূমেও এসেছিলেন। আল্লাহর দয়ায় এখানকার অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা পদ্ধতি এবং সুব্যবস্থাপনার কারণে তিনি অত্যন্ত প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন। তিনি অত্যন্ত ভালবাসা ও হৃদ্যতাপূর্ণ ব্যবহার করেন।

ইরাকের ওয়াকফ বিষয়ক মন্ত্রণালয় এই প্রেক্ষিতে মুসলিম বিশ্বের সকল মন্ত্রণালয়ের মধ্যে বিশেষ এক মর্যাদার অধিকারী যে তারা দুষ্প্রাপ্য ও দুর্লভ ধর্মীয় ও জ্ঞানসমৃদ্ধ কিতাবসমূহ অতি যত্নসহকারে প্রকাশ করে তার বিরাট ভাণ্ডার প্রস্তুত করেছে। এ পর্যন্ত তারা শতাধিক দুর্লভ ও দুষ্প্রাপ্য এমন সব কিতাব প্রকাশ করেছে, যা ইতিপূর্বে হস্তলিপির আকারে ছিল এবং সাধারণ জ্ঞানজগত তা থেকে উপকৃত হতে পারছিল না। এ সকল কিতাবের মধ্যে ইমাম তাবরানী (রহঃ) প্রণীত 'আল মু'জামুল কাবীর', ইমাম খাচ্ছাফ (রহঃ) প্রণীত 'আদাবুল কাজী'-এর হযরত ছদর শহীদ (রহঃ) প্রণীত ব্যাখ্যা গ্রন্থ, ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) প্রণীত 'আলখিরাজ' গ্রন্থের ভাষ্যগ্রন্থ 'আর রিতাজ', ইমাম যুগদী প্রণীত 'আন্নাতফু ফিল ফাতাওয়া' এবং আল্লামা কাসেম ইবনে কতলু বাগা প্রণীত 'মুজিবাতুল আহকাম' প্রভৃতি কিতাব বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইরাককে যদি যুদ্ধের সম্মুখীন না হতে হত, তাহলে প্রকাশনার এই ধারা কতই না এগিয়ে যেত।

এর মধ্য থেকে অনেক কিতাবই প্রকাশ হওয়ার পর শেষ হয়ে গেছে। যে সকল কিতাব বর্তমান ছিল, তিন কার্টুনে ভরা তার একটি সেট মন্ত্রী মহোদয় অধমকে উপহার দেন, তা এ অধমের জন্য এক অমূল্য উপঢৌকন ছিল। আর সত্য কথা হল, এ সকল কিতাব সংগ্রহ করাও আমার ইরাক সফরের এক বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল। আল্লাহ তাআলা তাঁদেরকে উত্তম প্রতিদান দিন।

মাদায়েন

ওয়াকফ বিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে বিদায় নিয়ে আমরা মাদায়েন অভিমুখে যাত্রা করি। বাগদাদ থেকে মাদায়েন প্রায় ৫০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। বাগদাদ থেকে বের হয়ে যখন আমরা মাদায়েনের সড়ক ধরে এগিয়ে চলছি, তখন সড়কের উভয় দিকে বিস্তৃত খেজুর বাগানের ধারা দৃষ্টির সম্মুখে উদ্ভাসিত হতে থাকে। তবে দেশটি যুদ্ধরত থাকায় এবং এখান থেকে ইরান সীমান্ত নিকটবর্তী হওয়ায় জায়গায় জায়গায় সেনা ক্যাম্প ও চেকপোষ্ট দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল। সেগুলোতে অস্ত্রসজ্জিত সৈন্যরা কামান বাগিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

ইরাকে প্রবেশ করার পর এই প্রথমবারের মত দেশটি যুদ্ধরত বলে অনুভব হল। অন্যথায় বাগদাদের হৈহুল্লোড়, রাত্রিকালীন আলোর বন্যা এবং যথানিয়মের গতিময় জীবন দেখে অনুমান করা যায় না যে, দেশে কোন প্রকার যুদ্ধবিগ্রহ চলছে।

কিন্তু এ সকল চেকপোষ্ট ও সেনা ক্যাম্প এবং তথাকার সেনাবাহিনী ও তাদের অস্ত্রশস্ত্র দেখে অত্যন্ত অনুশোচনা জাগল যে, প্রকৃত শত্রু কে আর যুদ্ধ চলছে কার সঙ্গে? ইরাক ও ইরান উভয়ে মুসলিম দেশ হওয়ার দাবীদার। বিশ্বের সকল সাম্রাজ্যবাদী শক্তি উভয় দেশেরই শত্রু। এরা উভয়ে সম্মিলিতভাবে যদি সে সকল শত্রুশক্তির মোকাবেলা করত, তাহলে এ সকল অস্ত্র, সৈন্য এবং যুদ্ধের রসদসামগ্রী এই উম্মাতের সংরক্ষণ, তার নিরাপত্তা এবং সম্মান ও স্বাধীনতা রক্ষার জন্য ব্যবহৃত হত। কিন্তু তা না করে উভয় দেশ পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে দুর্বলতর হয়ে যাচ্ছে। উভয় পক্ষ থেকে প্রত্যহ কোটি কোটি টাকা এক অনর্থক যুদ্ধে খরচ হচ্ছে। উভয় দেশের কত পরিবার প্রত্যহ তাদের অভিভাবককে হারিয়ে চলছে। এবং ইসলামের শত্রুশক্তি মজা করে এ তামাশা উপভোগ করছে। এখন তো এসব দেশে এমন কোন পরিবার পাওয়া দুস্কর, যার কোন না কোন প্রিয়জন অর্থহীন এ যুদ্ধের শিকার হয়নি।

কে এই যুদ্ধের সূত্রপাত ঘটাল, এ বিষয়ে উভয় দেশের বিবৃতি ভিন্নরূপ। কিন্তু যুদ্ধের সূত্রপাতের এই মারাত্মক ভ্রান্তি যদি ইরাকের পক্ষ থেকেই হয়ে থাকে, তবুও কিছুদিন যাবৎ ইরাক নিঃশর্ত যুদ্ধ বিরতির

চেষ্টা চালাচ্ছে, তা গ্রহণ করে সমঝোতার মাধ্যমে বর্তমান সমস্যার সমাধান করা সম্ভব, কিন্তু ইরানের বর্তমান সরকার কোন মূল্যেই যুদ্ধ বন্ধ করতে প্রস্তুত নয়। আল্লাহই জানেন, তাদের সম্মুখের গন্তব্য কত দূর এবং ধ্বংসাত্মক এই যুদ্ধ চালু রাখার পিছনে তাদের উদ্দেশ্য এবং যুক্তিই বা কি রয়েছে? আমি এই চিন্তায় বিভোর ছিলাম। এমতাবস্থায় মাদায়েনের জনবসতির দেখা পেলাম।

দেখতে দেখতে গাড়ী মাদায়েন শহরে প্রবেশ করল। বর্তমানে মাদায়েন একটি উপশহর মাত্র। কিন্তু সাসানী হুকুমাত চলাকালে এটি ইরানের রাজধানী ছিল। তখন কিসরা এই শহরেই অবস্থান করতেন। সে যুগে দজলা নদী এ শহরের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত ছিল। নদীর পশ্চিমাংশকে 'বাহরাশের' এবং পূর্বাংশকে 'মাদায়েন' বলা হত। বর্তমানে নদীটি শহর থেকে দূরে সরে গেছে। এখন শুধু তার পূর্বাংশে শহর বিদ্যমান আছে।

ইরান নরপতিগণ উৎকৃষ্ট জলবায়ু এবং চমৎকার অবস্থান কেন্দ্রের ভিত্তিতে মাদায়েনকে তাদের দারুল হুকুমাত (রাজধানী) বানায়। এবং সেখানে এমন এক সুদৃঢ় দূর্গ নির্মাণ করে, দৃঢ়তার কারণে যাকে অজেয় দূর্গ মনে করা হত। কিন্তু আরবের সেই মরুবাসী, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরশ পাথরতুল্য সংশ্রবের বরকতে আল্লাহ পাক তাদের হাতে কায়সার ও কিসরার জুলুম থেকে মানবতার মুক্তি নির্ধারণ করে রেখেছিলেন। বাহ্যতঃ তাঁরা সম্বলহীন অবস্থায়, জীর্ণ পোশাকে এবং ধারবিহীন তরবারী হাতে এখানে পৌছে। প্রথমে কিসরা তাঁদেরকে গুরুত্বহীন প্রতিপক্ষ মনে করে এড়িয়ে যায়। কিন্তু 'কাদেসিয়ার' বিপদজনক যুদ্ধ কিসরার মেরুদণ্ড চূর্ণ করে দেয়। তারা মাদায়েনে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে, তারা মনে করত যে, তাদের অজেয় দূর্গ এবং তার সম্মুখে প্রবাহিত দজলা নদী মুসলমানদের আক্রমণ থেকে তাদেরকে রক্ষা করবে। কিন্তু আল্লাহর যে সকল বান্দা পৃথিবীর বুকে আল্লাহর নাম সমুন্নত করার লক্ষ্যে বের হয়েছেন, কোন সাগর বা কোন পর্বত তাদের অভিযানের পথ রোধ করতে সক্ষম নয়। পরিশেষে মাদায়েনের সেই অজেয় নগরী থেকে কিসরার দাপট ও প্রতাপের পতাকা এমনভাবে ভূলুণ্ঠিত হলো যে,

সেখানে আর কোনদিন তা উড্ডীন হতে পারেনি। সে দিনের পর থেকে আজ পর্যন্ত এই শহর মুসলমানদের কর্তৃত্বাধীন রয়েছে।

মাদায়েনে প্রবেশ করে সর্বপ্রথম একটি মসজিদ দেখা যায়। এই জামে মসজিদের সীমানার ভেতরে তিনজন সাহাবী সমাধিস্থ আছেন। তাঁরা হলেন, হযরত সালমান ফার্সী (রাযিঃ), হযরত হুযায়ফা (রাযিঃ) এবং হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জাবের (রাযিঃ)। সাহাবীত্রয়ের মাযারে উপস্থিত হয়ে তাঁদেরকে সালাম করার সৌভাগ্য লাভ হয়।

হযরত সালমান ফার্সী (রাযিঃ) মূলতঃ ইরানের অধিবাসী এবং অগ্নিপূজক পরিবারের সদস্য ছিলেন। কিন্তু সত্যান্বেষণ তাঁকে অগ্নিপূজা থেকে বিতঃশ্রদ্ধ করে দেয়। তখন স্বীয় অগ্নিপূজক পিতাকে পরিত্যাগ করে, তিনি সিরিয়া গমন করেন। সিরিয়া এবং ইরাকের বিভিন্ন খৃষ্টান পণ্ডিতের সংশ্রব অবলম্বন করেন। পরিশেষে উমুরিয়ার এক খৃষ্টান পাদ্রীর নিকট গিয়ে তাঁর সংশ্রবে থাকতে আরম্ভ করেন। এই পাদ্রীর মৃত্যু আসন্ন হলে হযরত সালমান ফার্সী (রাযিঃ) তাঁকে জিজ্ঞেস করেন—'আমি এ পর্যন্ত অমুক অমুক পাদ্রীর সংশ্রবে ছিলাম, এখন আমি কার সংশ্রবে যাব?'

উত্তরে সেই খৃষ্টান পাদ্রী বললেন ঃ 'আমি তোমাকে এমন কোন আলেমের সন্ধান দিতে অক্ষম, যে পরিপূর্ণরূপে সঠিক পথে অবিচল রয়েছে। তবে এখন একজন নবীর আবির্ভাবের সময় আসন্ন। তিনি হযরত ইবরাহীম (আঃ)এর ধর্মাবলম্বী হবেন। তিনি আরব ভূখণ্ডে প্রেরিত হবেন। এবং এমন এক অঞ্চলে হিজরত করবেন, যা খেজুর বাগানে পূর্ণ থাকবে। তোমার জন্য সে নবীর নিকট গমন করা যদি সম্ভব হয়, তাহলে অবশ্যই সেখানে যাবে। সেই নবীর তিনটি নিদর্শন থাকবে—

১. তিনি সদকার মাল ভক্ষণ করবেন না।

২. তিনি হাদীয়া গ্রহণ করবেন।

৩. তাঁর উভয় স্কন্ধের মধ্যবর্তী স্থানে নবুওতের মোহর থাকবে।

সেই খৃষ্টান পাদ্রীর মৃত্যুর পর হযরত সালমান ফার্সী (রাযিঃ) একটি কাফেলার সঙ্গে আরব অভিমুখে যাত্রা করেন। কিন্তু কাফেলার অন্যান্য সঙ্গীরা পথিমধ্যে তাঁকে এক ইহুদীর হাতে ক্রীতদাসরূপে বিক্রি করে দেয়।

ইহুদী মদীনার অধিবাসী ছিল। সে হযরত সালমান ফার্সী (রাযিঃ)কে মদীনায় নিয়ে আসে। এ অঞ্চলের খেজুর বাগান দেখার পর তিনি প্রায় নিশ্চিত হন যে, এটিই সেই স্থান, যার সম্পর্কে খৃষ্টান পাদ্রী তাঁকে জানিয়েছিলেন। এই ইহুদীর নিকট ক্রীতদাসরূপে কাজ করা অবস্থায় দীর্ঘদিন অতিবাহিত হয়। একদিন তিনি এক বৃক্ষে আরোহণ করে কাজ করছিলেন এবং তাঁর ইহুদী মনিব সেই বৃক্ষের নিচে বসেছিল। এমতাবস্থায় ইহুদীর এক চাচাত ভাই সেখানে এসে বলল ঃ আল্লাহ বনী কায়লা (আনসার)কে ধ্বংস করেন। কেননা তারা কোবা পল্লীতে মক্কা থেকে আগত এক ব্যক্তির নিকট একত্রিত হয়েছে, এবং তাঁকে নবী ও পয়গাম্বর বলে আখ্যায়িত করছে।

হযরত সালমান ফার্সী (রাযিঃ) নিজেই বলেন ঃ এ কথাগুলো শ্রুতিগোচর হতেই আমার দেহে বিদ্যুৎ খেলে যায়। মনে হচ্ছিল যেন আমি গাছ থেকে স্বীয় মনিবের উপরেই পড়ে যাবো।

মনকে সামলে নিয়ে বৃক্ষ থেকে অবতরণ করলাম। ইহুদী মনিবের নিকট বিস্তারিত জানতে চাইলাম। উত্তরে ইহুদী মনিব আমাকে একটি থাপ্পড় মারল। থাপ্পড় খেয়ে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিতির আশা মনেই রয়ে গেল। সন্ধ্যায় কাজ থেকে অবসর লাভের পর আমার সামান্য পুঁজিসহ কোবা পল্লীতে গমন করি। সেখানে পৌঁছে আমার সেই পুঁজি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে পেশ করে নিবেদন করলাম—'আপনারা অভাবী লোক, তাই আমি আপনার ও আপনার সাথীদের জন্য কিছু সদকা দিতে চাই।' হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর নিজের জন্য সদকা গ্রহণ করতে অস্বীকার করলেন এবং তা সাহাবীদেরকে গ্রহণের জন্য অনুমতি দান করলেন। হযরত সালমান ফার্সী (রাযিঃ)এর নিকট প্রথম নিদর্শনটি প্রকাশ পেল।

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোবা থেকে মদীনায় আগমন করলেন, তখন হযরত সালমান ফার্সী (রাযিঃ) পুনশ্চ দরবারে উপস্থিত হলেন এবং সদকার পরিবর্তে কিছু হাদীয়া পেশ করলেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা গ্রহণ করলেন। হযরত সালমান ফার্সী

(রাযিঃ)এর জন্য এটি দ্বিতীয় নিদর্শন ছিল।

দু' চার দিন পর হযরত সালমান ফার্সী (রাযিঃ) পুনরায় যখন দরবারে উপস্থিত হন, তখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি জানাযার সঙ্গে 'বাকী' গমন করেছিলেন। সাহাবাদের একটি জামাত তাঁর সঙ্গে ছিল। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁদের মাঝে বসা ছিলেন। হযরত সালমান ফার্সী (রাযিঃ) সম্মুখে গিয়ে সালাম করলেন এবং তৃতীয় নিদর্শন অর্থাৎ 'মহরে নবুওয়াত' দেখার জন্য সম্মুখ থেকে পিছনে এসে বসলেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর পিছনে যাওয়ার উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে পবিত্র পৃষ্ঠের চাদর সরিয়ে নিলেন। হযরত সালমান ফার্সী (রাযিঃ) 'মহরে নবুওয়াত' দেখামাত্রই তা চিনে ফেলেন। সত্যের অন্বেষার দীর্ঘ বন্ধুরপথ অতিক্রমের পর আজ সেই অভিষ্ঠ লক্ষ্য সম্মুখে বিরাজমান ছিল। যেই মহান সত্তার প্রতীক্ষায় মুসাফেরী জীবন থেকে শুরু করে দাসত্বের জীবন পর্যন্ত কত না দুঃখ-যাতনা সহ্য করতে হয়েছে। আজ সেই মহান ব্যক্তিত্ব তাঁর দৃষ্টির সম্মুখে স্বর্গ হয়ে দেখা দিয়েছে। কত বছরের অক্লান্ত অধ্যবসায়ের ফল অকস্মাৎ শান্তি ও তৃপ্তির রূপে দৃষ্টির সম্মুখে আজ উদ্ভাসিত। তাই হৃদয়ে লালিত দীর্ঘদিনের আবেগের বাধভাঙ্গা বন্যা অশ্রুধারারূপে বিগলিত হয়ে নয়নযুগল থেকে প্রবাহিত হচ্ছিল। সম্মুখে অগ্রসর হয়ে 'মহরে নবুওয়াত' চুম্বন করলেন এবং বহু বছরের লালিত ভক্তি-ভালবাসার অশ্রু-সওগাত পেশ করলেন।

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ক্রন্দন অনুভব করতে পেরে সম্মুখে ডেকে নিয়ে তাঁর উপাখ্যান জানতে চাইলেন। হযরত সালমান ফার্সী (রাযিঃ) নিজের জীবনের আদ্যপান্ত বর্ণনা করে শুনালেন এবং হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র হাতে ইসলামে দীক্ষিত হলেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর এই মুসাফেরী জীবন বরণ করা এবং ইসলামের পথে অসংখ্য কষ্ট সহ্য করার যে পুরস্কার দান করলেন, তার জন্য হযরত সালমান ফার্সী (রাযিঃ) আপন জন্মভূমি ও পরিবারই শুধু নয়, বরং মহাবিশ্ব ও তার অভ্যন্তরের সকল সুখ-সামগ্রী কুরবান করতেও দ্বিধা করতেন না।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেন—

سلمان منا اهل البيت

"সালমান আমাদেরই পরিবারের একজন।"

আল্লাহর কী লীলা! একদিকে হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালমান (রাযিঃ)কে তাঁর পরিবারভুক্ত হওয়ার মর্যাদা ও সম্মানের উচ্চতর সোপানে অধিষ্ঠিত করলেন, অপরদিকে তিনি এখনো এক ইহুদীর ক্রীতদাসই রয়েছেন। তাই হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে পরামর্শ দিলেন যে, ইহুদীকে মুক্তিপণ দিয়ে দাসত্ব থেকে তুমি মুক্তিলাভ কর। হযরত সালমান ফার্সী (রাযিঃ) এ ব্যাপারে ইহুদীর সঙ্গে কথা বললেন। সে মুক্তিপণের জন্য যেসব শর্ত আরোপ করল, তা পূরণ করা প্রায় অসম্ভব ছিল। সে বলল ঃ চল্লিশ আউকিয়া স্বর্ণ দিবে এবং তিনশত খেজুর বৃক্ষ রোপণ করে দিবে। সে সব বৃক্ষে ফল এলে তবে তুমি মুক্তিলাভ করবে। তিনশত খেজুর বৃক্ষে ফল আসার জন্য এক দীর্ঘকাল প্রয়োজন, কিন্তু হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবাদেরকে খেজুর চারা দিয়ে হযরত সালমান ফার্সী (রাযিঃ)কে সহযোগিতা করতে অনুপ্রাণিত করলেন, ফলে সাহাবায়ে কেরামের সহযোগিতায় তিনশ' চারা জমা হল।

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত সালমান (রাযিঃ)কে চারা রোপণের জন্য গর্ত তৈরী করতে বললেন। গর্ত তৈরী হলে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং সেখানে গমন করে আপন হস্তে সবগুলো চারা রোপণ করলেন এবং বরকতের দু'আ করলেন। সেই পবিত্র হাতে চারা রোপণ হল, যে পবিত্র হাত অন্তরের বিরাণ ভূমিকে করেছিল সজীব এবং যে হাত সামান্য কয়েক বছর সময়ে সত্যের বৃক্ষ উৎপন্ন করেছিল। সেই মোবারক হাতের মোজেযা প্রকাশ পেল। মাত্র এক বছরেই সবগুলো খেজুর গাছেই ফল এসে গেল। এভাবে হযরত সালমান ফার্সী (রাযিঃ)এর মুক্তিলাভের সর্বকঠিন শর্তটি পুরা হল।

এখন চল্লিশ আওকীয়া স্বর্ণ পরিশোধের শর্তটি অবশিষ্ট ছিল। একদা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট কোথাও থেকে স্বর্ণ এল।

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা হযরত সালমানের হাতে দিলেন যেন এর বিনিময়ে তিনি মুক্তিলাভ করতে পারেন। বাহ্যতঃ স্বর্ণ চল্লিশ আওকীয়া থেকে অনেক কম ছিল। কিন্তু হযরত সালমান ফার্সী (রাযিঃ) ওজন করলে তা পুরা চল্লিশ আওকীয়া হল। এমনিভাবে রাহমাতুল্লিল আলামীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বদৌলতে তিনি দাসত্বের জীবন থেকে মুক্তিলাভ করেন। দাসত্বের কারণে হযরত সালমান ফার্সী (রাযিঃ) বদর ও ওহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারেননি।

তিনি সর্বপ্রথম খন্দকের যুদ্ধে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে অংশগ্রহণ করেন এবং তাঁর দেওয়া পরামর্শের ভিত্তিতেই এই যুদ্ধে পরিখা খনন করা হয়।

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের পর তিনি অব্যাহতভাবে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে থাকেন। বিশেষ করে হযরত ওমর ফারুক (রাযিঃ)এর যামানায় যখন ইরানে সেনা অভিযান হয়, তখন তিনি তাতে উল্লেখযোগ্য একজন সেনাপতির দায়িত্ব পালন করেন। শত শত নয় বরং হাজার হাজার আরব মুসলমান তাঁর কমাণ্ডে জিহাদ করতে থাকেন। তিরমিযী শরীফের এক বর্ণনা অনুযায়ী ইরানের কোন দূর্গ আক্রমণের পূর্বে হযরত সালমান ফার্সী (রাযিঃ) তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিতেন এবং তিনি বলতেন ঃ "আমি ইরানী হওয়া সত্ত্বেও ইসলামের জন্য আজ আরবদের আমীর হয়েছি।"

ইরান বিজয়ের পর মাদায়েনকে তিনি নিজের বাসস্থান বানান। কিছুদিন তিনি সেখানকার গভর্নরও ছিলেন। কিন্তু তিনি গভর্নরীর যুগেও এমন সাদামাটা জীবন যাপন করতেন যে, কেউ তাঁকে দেখে মাদায়েনের গভর্নর বলে বুঝতেই পারত না।

একবার সিরিয়ার এক বণিক কিছু সামগ্রী নিয়ে মাদায়েন আসে। তখন হযরত সালমান ফার্সী (রাযিঃ) একজন সাধারণ মানুষের মত রাস্তায় ঘোরাফেরা করছিলেন। সিরিয়ার সেই বণিক তাঁকে শ্রমিক মনে করে তার বোঝা বহন করতে বলল। হযরত সালমান ফার্সী (রাযিঃ) নির্দ্বিধায় ও নিঃসঙ্কোচে বোঝা উঠিয়ে নিলেন। কিছুক্ষণ পর মাদায়েনের

লোকেরা তাঁকে বোঝা বহন করতে দেখে সিরিয়ার সেই বণিককে বলল ঃ ইনি তো মাদায়েনের গভর্নর। একথা শুনে বণিক লোকটি অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হল এবং লজ্জিতও হল এবং হযরত সালমান ফার্সী (রাযিঃ)এর নিকট মিনতি করে বোঝা নামিয়ে রাখার জন্য বললো। কিন্তু হযরত সালমান ফার্সী (রাযিঃ) তাতে সম্মত হলেন না। তিনি বললেন ঃ আমি একটি নেককাজ করার সংকল্প করেছি। তা পুরা না হওয়া পর্যন্ত আমি এ বোঝা নামাব না। অতএব তিনি সেই বোঝা গন্তব্যস্থলে পৌছে দিয়েই ক্ষান্ত হলেন।

হযরত সালমান ফার্সী (রাযিঃ)এর ইন্তেকাল হযরত উসমান (রাযিঃ)এর খিলাফতকালে মাদায়েনেই হয়। এখানেই তাঁকে কবরস্থ করা হয়। তাঁর পবিত্র কবরে আজও এই হাদীস খোদাইকৃত আছে—

سلمان منا اهل البيت

অর্থ ঃ 'সালমান আমাদের পরিবারেরই একজন।'

হযরত হুযাইফা বিন ইয়ামান (রাযিঃ)

হযরত সালমান ফার্সী (রাযিঃ)এর সমাধির অদূরেই আরও দুটি সমাধি রয়েছে। তার একটি হযরত হুযাইফা বিন ইয়ামান (রাযিঃ)এর এবং অপরটিতে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জাবেরের নাম লিখিত রয়েছে।

হযরত হুযাইফা ইবনে ইয়ামান (রাযিঃ) অতি মর্যাদাবান বিখ্যাত সাহাবীদের অন্যতম। তিনি বনু আবাছ কবিলার লোক। স্বদেশেই পিতার সঙ্গে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। তার পিতার প্রকৃত নাম হাসাল এবং উপাধি ইয়ামান ছিল। ইসলাম গ্রহণের পর তাঁরা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে যাওয়ার উদ্দেশ্যে বাড়ী থেকে রওয়ানা হন। ঘটনাচক্রে সময়টি ছিল হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বদর যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণের সময় এবং তার মোকাবেলার জন্য আবু জাহেল বাহিনী যখন পবিত্র মক্কা থেকে রওয়ানা হয় ঠিক তখন।

পথিমধ্যে হযরত হুযাইফা ইবনে ইয়ামান (রাযিঃ) এবং তার পিতার আবু জাহেলের বাহিনীর সঙ্গে সামনাসামনি দেখা হয়ে যায়। তারা উভয়কে বন্দী করে বলে, তোমরা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামের নিকট যাচ্ছ। তাঁরা উত্তর দিলেন ঃ আমরা তো মদীনায় যাচ্ছি। তখন আবু জাহেলের লোকেরা তাঁদেরকে বলল ঃ ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা তোমাদের ছাড়ব না, যতক্ষণ না তোমরা আমাদের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হবে যে, তোমরা শুধু মদীনায় যাবে, কিন্তু আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে তাঁদের সঙ্গী হবে না। বাধ্য হয়ে তাঁরা ওয়াদাবদ্ধ হলেন। তারপর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে গিয়ে সমস্ত ঘটনা জানালেন।

সে সময় সত্য ও মিথ্যার সর্বপ্রথম যুদ্ধ সম্মুখে ছিল। অস্ত্র–শস্ত্র সজ্জিত কোরাইশের কাফের বাহিনীর সঙ্গে মুসলিম বাহিনীর প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল। তাদের সংখ্যাও ছিল মুসলমানদের তিন গুণেরও অধিক। তাই মুসলমানদের জন্য এক–একজন লোক ছিল অত্যন্ত মূল্যবান। কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন সঙ্কটাপন্ন অবস্থাতেও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করাকে মেনে নেননি। তিনি বলেছেন, আমরা তাদের প্রতিশ্রুতি পুরা করব এবং কাফেরদের বিপক্ষে আল্লাহ তাআলার নিকট সাহায্য কামনা করব।

তাই তাঁরা বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারেননি। আমানত ও প্রতিশ্রুতি পূরণের এমন উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত অন্য কোন জাতির ইতিহাসে পাওয়া যাবে কি?

ওহুদের যুদ্ধে হযরত হুযাইফা বিন ইয়ামান (রাযিঃ) অংশগ্রহণ করেন। কিন্তু এক দুঃখজনক ভ্রান্তিতে তাঁর শ্রদ্ধেয় পিতা হযরত ইয়ামান (রাযিঃ) স্বয়ং মুসলমানদের হাতেই শহীদ হন। দুর্ঘটনাটি ভুল বুঝাবুঝির কারণে হয়েছিল বলে হযরত হুযাইফা বিন ইয়ামান (রাযিঃ) তাঁর মুসলমান ভাইদের রক্তপণও মাফ করে দেন।

খন্দকের যুদ্ধে হযরত হুযাইফা বিন ইয়ামান (রাযিঃ) উজ্জ্বল ভূমিকা সম্পাদন করেন। খন্দক যুদ্ধের শেষ রজনীতে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে কাফের বাহিনীর সংবাদ সংগ্রহের জন্য প্রেরণ করেন। তিনি অত্যন্ত বীরত্ব, নির্ভীকতা ও বিচক্ষণতার সাথে এবং সুকৌশলে এই গুরুত্বপূর্ণ বিপদসংকুল কর্ম সম্পাদন করেন। শেষ পর্যন্ত কাফের বাহিনী সেখান থেকে পলায়ন করে।

একবার হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলমানদের আদম

শুমারীর দায়িত্বও তাঁর উপর অর্পণ করেন। তিনি উত্তমরূপে তা সম্পাদন করেন। সে সময় মুসলমানদের সংখ্যা ছিল দেড় সহস্র।

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে ভবিষ্যতকালীন ফিৎনাসমূহের অনেক কথাই বলেছিলেন। অনেক মুনাফিককে চিহ্নিত করে দিয়েছিলেন। তাই তাঁকে 'সাহিবুস্ সিত্‌র' (রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভেদজান্তা) বলা হত। এমনকি একবার হযরত উমর (রাযিঃ) কসম দিয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, আমার নাম তো মুনাফিকদের তালিকায় নেই? হযরত হুযাইফা বিন ইয়ামান (রাযিঃ) অস্বীকার করলেন।

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের পরও তিনি অব্যাহতভাবে যুদ্ধে লিপ্ত থাকেন। দায়নুর অঞ্চল তারই পবিত্র হাতে বিজিত হয়। ইরাক এবং ইরানের বিজয়ধারাতেও তিনি অসাধারণ কৃতিত্ব দেখান। কিসরার দরবারে তিনিই সেই উৎসাহব্যঞ্জক ও সাহসদীপ্ত ভাষণ দান করেন যা সরার প্রাসাদে কম্পন সৃষ্টি করে।

ইরান বিজয়ের পর হযরত উমর (রাযিঃ) তাঁকে মাদায়েনের গভর্নর নিযুক্ত করেন। তিনি কিসরার রাজধানীর গভর্নর নিযুক্ত হয়ে একটি গাধায় আরোহণ করে সেখানে পৌঁছেন। তার গদির সাথে সামান্য পাথেয় রাখা ছিল। মাদায়েনবাসী তাকে স্বাগত জানালেন এবং নিবেদন করলেন যে, আমরা আপনার সকল বাসনা পূর্ণ করতে প্রস্তুত। তিনি উত্তর দিলেন, আমার জন্য খাবার এবং আমার এই গাধার জন্য কিছু ঘাস প্রাপ্তিই যথেষ্ট।

দীর্ঘদিন পর্যন্ত হযরত হুযাইফা বিন ইয়ামান (রাযিঃ) এমনি সরলতার সঙ্গে মাদায়েনের গভর্নররূপে কাজ করতে থাকেন। একবার তিনি মাদায়েন থেকে মদীনায় আসেন, হযরত উমর (রাযিঃ) পূর্ব থেকেই তাঁর আসার পথে আত্মগোপন করে বসে থাকেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল মাদায়েন থেকে কোন ধনসম্পদ আনলে তা যেন তিনি অবগত হতে পারেন। কিন্তু দেখা গেল তিনি যে অবস্থায় গিয়েছিলেন সে অবস্থাতেই ফিরে এসেছেন। হযরত উমর (রাযিঃ) এ অবস্থা দেখে তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন।

হযরত হুযাইফা বিন ইয়ামান (রাযিঃ) শেষ জীবনে মাদায়েনেই অবস্থান করেন। তিনি হযরত উসমান (রাযিঃ)এর শাহাদাতের চল্লিশ দিন পর এখানেই ইন্তেকাল করেন। (আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তাঁকেও সন্তুষ্ট করেছেন।)

হযরত আবদুল্লাহ বিন জাবের (রাযিঃ)

হযরত হুযাইফা বিন ইয়ামান (রাযিঃ)এর পাশেই অপর সমাধিতে, সমাধিস্থ ব্যক্তির নাম আবদুল্লাহ বিন জাবের (রাযিঃ) লেখা আছে। অধম তাঁর পরিচিতি ও তাঁর সম্পর্কে পূর্ণ তথ্য উদ্ধারে সক্ষম হয়নি। তবে হযরত আবদুল্লাহ বিন জাবের (রাযিঃ)এর বিষয়ে যতদূর জানা যায়, তিনি একজন বিখ্যাত আনসার সাহাবী ছিলেন। কিন্তু তিনি মদীনাতেই বসবাস করতেন এবং সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়।

কিতাবে আবদুল্লাহ বিন জাবের নামে দু'জন সাহাবীর উল্লেখ পাওয়া যায়। একজন আবদুল্লাহ বিন জাবের আল আনছারী আল বায়াজী (রাযিঃ)। অপরজন আবদুল্লাহ বিন জাবের আল আবদী (রাযিঃ)। কিন্তু এই মহান ব্যক্তি দ্বয়ের জীবন বৃত্তান্ত আমার হস্তগত হয়নি এবং তাঁরা কোথায় মৃত্যুবরণ করেছেন তাও জানা যায়নি।

এরূপ সম্ভাবনাও আছে যে, তিনি বিখ্যাত সাহাবী হযরত জাবের বিন আবদুল্লাহ (রাযিঃ)এর পুত্র আবদুল্লাহ বিন জাবের (রাযিঃ)। যিনি মাদায়েনে এসে বসবাস শুরু করেন। কিন্তু মামুলী অনুসন্ধানে অধম হযরত জাবের বিন আবদুল্লাহ (রাযিঃ)এর পুত্রের জীবনী সম্পর্কে এমন কোন আলোচনা পায়নি, যার দ্বারা এ সম্ভাবনাকে সত্য বা মিথ্যা সাব্যস্ত করা যেতে পারে। যা হোক, এ অঞ্চলে তিনি একজন সাহাবী ছিলেন বলে প্রসিদ্ধ রয়েছে।

একটি বিস্ময়কর ঈমানদীপ্ত ঘটনা

বর্তমান শতাব্দীতেই হযরত হুযাইফা বিন ইয়ামান ও হযরত আবদুল্লাহ বিন জাবের (রাযিঃ)এর সমাধির সঙ্গে এক বিরল ও বিস্ময়কর ঈমানদীপ্ত ঘটনা ঘটে। যে ঘটনা সম্পর্কে বর্তমানে খুব কম

মানুষই অবগত। ঘটনাটি আমি প্রথমে জনাব মাওলানা জাফর আহমাদ সাহেব আনছারী (মুঃ যিঃ আঃ)এর নিকট থেকে শ্রবণ করি। তারপর বাগদাদের ওয়াকফ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সাধারণ যোগাযোগ বিভাগের মহাপরিচালক জনাব খায়রুল্লাহ হাদীসীও বিষয়টি সংক্ষেপে আলোচনা করেন।

১৯২৯ খৃষ্টাব্দের ঘটনা—ইরাকে তখন রাজতন্ত্র ছিল। সে সময় হযরত হুযাইফা বিন ইয়ামান ও হযরত আবদুল্লাহ বিন জাবের (রাযিঃ)এর কবরদ্বয় এখানে (জামে মসজিদ সালমানের সীমানায় অবস্থিত) ছিল না। এখান থেকে বেশ দূরে দজলা নদী এবং মসজিদে সালমানের মধ্যবর্তী কোন এক স্থানে ছিল। ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি স্বপ্নে দেখেন যে, হযরত হুযাইফা বিন ইয়ামান ও হযরত আবদুল্লাহ বিন জাবের (রাযিঃ) তাকে বলছেন ঃ 'আমাদের কবরে পানি আসছে, আপনি যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করুন।' রাষ্ট্রপতি তখন নির্দেশ দিলেন—দজলা নদী ও কবরদ্বয়ের মধ্যবর্তী কোন স্থান গভীরভাবে খনন করে দেখা হোক যে, ভিতর দিয়ে দজলার পানি প্রবাহিত হচ্ছে কিনা। নির্দেশ মোতাবেক খনন করে পানি প্রবাহিত হওয়ার কোন লক্ষণ দেখা গেলনা। রাষ্ট্রপতি বিষয়টিকে একটি স্বপ্ন মাত্র মনে করে আর গুরুত্ব দিলেন না। কিন্তু তারপর পুনরায় সম্ভবতঃ একাধিকবার তিনি সেই স্বপ্ন দেখেন। যে কারণে বাদশাহ অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়েন। তাই তিনি আলেমদেরকে একত্র করে ঘটনা ব্যক্ত করলেন। এমন মনে পড়ে যে, সে সময় ইরাকের একজন আলেমও হুবহু একই স্বপ্ন দেখেছেন বলে জানান। তখন শলাপরামর্শের পর সিদ্ধান্ত হয় যে, উভয় বুযুর্গের কবর খনন করে দেখা হোক। যদি পানি জাতীয় কিছু সেখানে আসছে দেখা যায়, তাহলে তাঁদের দেহ স্থানান্তর করা হবে। সে যুগের আলেমগণও এ সিদ্ধান্তে ঐক্যমত পোষণ করেন। ইসলামের প্রথম যুগের মহান দুই বুযুর্গ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীর কবর খননের এটি ইতিহাসের প্রথম ঘটনা হওয়ায় ইরাক সরকার এ বিষয়ে অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করেন। এ কাজ সম্পাদনের জন্য বিরাট ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। এর জন্য একটি তারিখও নির্ধারণ করেন। যেন উৎসাহী লোকেরা এ

কাজে অংশগ্রহণ করতে পারে। ঘটনাক্রমে তারিখটি হজ্জ মওসুমের নিকটবর্তী সময়ে ছিল। এই খবর যখন হেজাজে পৌছল তখন সেখানে হজ্জ পালনের উদ্দেশ্যে আগত মুসলমানগণ ইরাক সরকারের নিকট উল্লেখিত তারিখ কিছুদিন পিছানোর জন্য আবেদন জানায়, যেন হজ্জ শেষ করে যারা ইরাকে আসতে ইচ্ছুক তারা এসে পৌছতে পারে। বিধায় ইরাক সরকার হজ্জ পরবর্তী একটি তারিখ নির্ধারণ করেন।

বলা হয় যে, নির্ধারিত তারিখে শুধু ইরাকেরই নয়, বরং অন্যান্য দেশের মানুষেরও এত ভিড় হয় যে, সরকার এর দৃশ্য প্রদর্শনের জন্য দূর-দূরান্ত পর্যন্ত বড় বড় পর্দার টিভি স্ক্রীন আয়োজন করেন। যে সকল মানুষ কবরের নিকটবর্তী হয়ে সরাসরি এ দৃশ্য দেখতে সক্ষম হবে না তারা যেন এসব পর্দার ভিতর তার প্রতিবিম্ব দেখতে পারে।

এই বিরাট ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করার পর পবিত্র কবরদ্বয় খনন করা হয়। সেখানে উপস্থিত বিরাট জনসমুদ্র এ বিস্ময়কর দৃশ্য স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করে যে, তেরশ' বছর অতিবাহিত হওয়ার পরেও উক্ত বুযুর্গদ্বয়ের পবিত্র দেহ অক্ষত এবং সজীব রয়েছে। বরং চক্ষু বিশেষজ্ঞ বিধর্মী এক ডাক্তার সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি পবিত্র দেহ দেখে বলেন—তাঁদের চোখে আজও জীবিত মানুষের ন্যায় জ্যোতি বিদ্যমান, অথচ মৃত ব্যক্তির চোখের এ জ্যোতি মৃত্যুর অল্প পরেই নষ্ট হয়ে যায়। এ দৃশ্য দেখে তিনি মুসলমান হয়ে যান।

পবিত্র দেহদ্বয় স্থানান্তর করার জন্য পূর্বেই হযরত সালমান ফার্সী (রাযিঃ)এর কবরের পাশেই কবর তৈরী করা হয়েছিল। সেখানে নিয়ে যাওয়ার জন্য পবিত্র দেহ খাটিয়ায় রেখে তার সঙ্গে লম্বা লম্বা বাঁশ বাঁধা হয়। হাজার হাজার মানুষ তা কাঁধে বহন করার সৌভাগ্য অর্জন করে। এমনিভাবে সেই মহান বুযুর্গদ্বয়ের সমাধি বর্তমান স্থানে স্থানান্তর করা হয়।

হযরত মাওলানা জাফর আহমদ সাহেব আনছারী (মুঃ যিঃ আঃ) বলেন ঃ ১৯২৯ খৃষ্টাব্দের এই বিস্ময়কর ঘটনা আমার খুব ভাল স্মরণ আছে। ঘটনাটি ঐ সময়ের পত্র-পত্রিকায় দারুণ আলোড়ন সৃষ্টি করে। সে সময় হিন্দুস্থানের এক সাহিত্যিক দম্পতি ইরাকে গিয়েছিলেন, তারা

স্বচক্ষে ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করেন। সম্ভবতঃ মহিলাটিই ইরাকের এই ভ্রমণ কাহিনী তার এক সফরনামায় লিপিবদ্ধ করেন, যা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। তার এক কপি আমার নিকটও সংরক্ষিত আছে।

সেই ভ্রমণ কাহিনীতে এ কথাও উল্লেখ আছে যে, সে সময় কোন এক বিদেশী পর্যটক ক্যামেরা দ্বারা পুরো ঘটনাটির দৃশ্য সংরক্ষণ করেন। বিশেষ করে অনেক অমুসলিমও বিস্ময়কর এ ঘটনা দেখতে আসে। তারা প্রভাব সৃষ্টিকারী সেই দৃশ্যে শুধু প্রভাবান্বিতই হননি বরং অনেকে তা দেখে মুসলমান হয়ে যান।

আল্লাহ তাআলা স্বীয় নিপুণ শক্তিমত্তা এবং দ্বীনের অম্লান সত্যতার এমন মোজেযা কদাচিত দেখিয়ে থাকেন।

এ প্রসঙ্গে এ বিষয়টিও উল্লেখযোগ্য যে, যদি আবদুল্লাহ বিন জাবের (রাযিঃ) সাহাবী হযরত জাবের (রাযিঃ)এরই সাহেবজাদা হয়ে থাকেন, তবে এটি একটি বিস্ময়কর ও দুর্লভ ব্যাপার যে, হযরত মুয়াবিয়া (রাযিঃ)এর জামানায় তাঁর দাদার সঙ্গেও ঠিক এমনই এক ঘটনা ঘটেছিল।

আরেক বিস্ময়কর ঘটনা

ঘটনাটি এই যে, হযরত জাবের (রাযিঃ)এর পিতা আবদুল্লাহ (রাযিঃ) ওহুদ যুদ্ধে সর্বপ্রথম শহীদ হন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে হযরত উমর বিন জামুহ (রাযিঃ)এর সঙ্গে একই কবরে কবরস্থ করেন। সে সময় মুসলমানদের এমন দরিদ্র অবস্থা ছিল যে, শহীদদের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ কাফনের কাপড়েরও ব্যবস্থা ছিল না। বিধায় হযরত আবদুল্লাহ (রাযিঃ)কে একটি মাত্র চাদরে কাফন দেওয়া হয়। যার দ্বারা তাঁর মুখমণ্ডল ঢেকে দেওয়া হলেও পদযুগল খোলা থেকে যায়। ফলে ঘাস দ্বারা তা আবৃত করা হয়। ঘটনাক্রমে কবরটি ভাটি অঞ্চলে ছিল। চল্লিশ বছর পর হযরত মুয়াবিয়া (রাযিঃ)এর খেলাফতকালে এক প্লাবন হয়। তাছাড়া কবরের পাশ দিয়েই একটি খাল খনন করার প্রয়োজনও দেখা দেয়। তখন হযরত জাবের (রাযিঃ)এর উপস্থিতিতে কবরটি খনন করা হলে বুযুর্গ দ্বয়ের দেহ সম্পূর্ণ অক্ষত ও সতেজ অবস্থায় পাওয়া যায়।

একটি বর্ণনায় এমনও আছে যে, তাঁদের পবিত্র মুখমণ্ডলে যে ক্ষত ছিল, সে ক্ষতের উপর তাঁদের হাত রাখা ছিল। লোকেরা ক্ষতস্থান থেকে হাত সরালে তাজা রক্ত বেরিয়ে আসতে থাকে। ক্ষতস্থানে পুনরায় হাত রাখলে রক্তের প্রবাহ বন্ধ হয়ে যায়।

কিসরার রাজপ্রাসাদ

সাহাবায়ে কেরামের পবিত্র মাজার যিয়ারত করার পর আমরা সম্মুখে অগ্রসর হই। মাদায়েন শহরের প্রায় শেষ প্রান্তে কিসরার রাজপ্রাসাদের একটা প্রাচীর শিক্ষার জীবন্ত সাক্ষর হয়ে আজও দাঁড়িয়ে আছে। এটি তৎকালীন বিশ্বের পরাশক্তি কিসরার সেই প্রাসাদের ভগ্নাংশ, যার সুউচ্চ চূড়াসমূহ দোজাহানের সর্দার হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শুভ জন্মের প্রাক্কালে ভূপাতিত হয়েছিল। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খন্দকের যুদ্ধে পরিখা খননের সময় কোদালের বিচ্ছুরিত আলোতে তাদের শান-শওকত দেখিয়ে সুসংবাদ প্রদান করেছিলেন যে, এই প্রাসাদ মুসলমানদের হস্তগত হবে। এই সুসংবাদ দানকালে স্বয়ং মুসলমানদের অবস্থা এত নাজুক ছিল যে, আরবের বিভিন্ন গোত্রের সংঘবদ্ধ ও সম্মুখ আক্রমণে স্বয়ং মদীনা তায়্যিবার কলিজাই ওষ্ঠাগত ছিল। দোজাহানের সর্দার হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং তাঁর পবিত্র হস্তে পরিখা খননের কর্ম সম্পাদনে সক্রিয় ছিলেন। ক্ষুধার তীব্রতায় সাহাবায়ে কেরাম পেটে পাথর বেঁধেছিলেন। স্বয়ং রহমাতুল্লিল আলামীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও তাঁর পবিত্র উদরে দু'-দুটি পাথর বেঁধেছিলেন। কেউ কি কল্পনাও করেছিল যে, সহায় সম্বলহীন ও নিরস্ত্রপ্রায় এই সৈনিকেরাই বিশ্বের পরাশক্তি কিসরার দম্ভকে মাটিতে মিশিয়ে দেবে।

কিন্তু পৃথিবী প্রত্যক্ষ করেছে, এ ঘটনার পর ১৫ বছরও পূর্ণ হয়নি, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সেই সঙ্গীরাই আল্লাহর নাম নিয়ে দাঁড়িয়ে এমন এক পরাশক্তির সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়, যার দোর্দণ্ড প্রতাপে এক সময় রোমের প্রাসাদ পর্যন্ত প্রকম্পিত হত। কিসরার প্রাসাদের এই প্রাচীর ১৪ শত বৎসরের অধিককালের ঝড়ঝাপ্টা সহ্য করা

সত্ত্বেও আজও তা অতীত প্রভাব প্রতিপত্তির প্রতিচ্ছবি হয়ে আছে। এর নীচে দাঁড়িয়ে আজও কোন ব্যক্তি তার সেই দোর্দণ্ড প্রতাপ থেকে প্রভাবমুক্ত থাকতে পারে না। এখনো সেই প্রাচীরের উপরস্থ অনেক কক্ষ অক্ষত আছে। প্রাচীরের মাঝে মেহরাব সদৃশ সুউচ্চ তোরণ রয়েছে। তা পেরোলে প্রশস্ত এক হল কক্ষের নিদর্শন পরিলক্ষিত হয়। দেখে মনে হয়, এটি কিসরার দরবার কক্ষ অথবা মহলের অন্য কোন গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল। এক বর্ণনা মতে, মাদায়েন বিজয়ের সময় এই প্রাসাদের গেটে টানানো পর্দায় অগ্নিসংযোগ করা হয়। পরে তা থেকে দশ লক্ষ ভরি স্বর্ণ উদ্ধার হয়। যার মূল্য ১ কোটি দিরহাম (রৌপ্য মুদ্রা)।

এই জীর্ণ শীর্ণ অবস্থাতেও যখন এমন প্রভাব বিদ্যমান, তাহলে যৌবনকালে তার শান-শওকত কেমন ছিল? তৎকালে এর আকাশছোয়া প্রাচীর যে অজেয় ছিল তা বলাই বাহুল্য। তৎকালীন সময়ে দজলা নদী এই প্রাচীরের পাদদেশ দিয়ে প্রবাহিত ছিল। বিরাট এই নদী পার হয়ে প্রাচীরে আরোহণ করা এবং তা জয় করা বিশেষতঃ যখন প্রাচীরের প্রতি পায়ে পায়ে প্রহরী দণ্ডায়মান এবং প্রতি মুহূর্তে তীর, বর্শা ও ফুটন্ত তেলের বৃষ্টি চলছিল—সিংহের দুধ আনার চেয়ে কম ছিল না।

কিন্তু হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুগত সাহাবীগণ কি পরিমাণ উৎসাহ ও উদ্দীপনা এবং কি ধরনের ঈমানী শক্তি নিয়ে আক্রমণ করেছিল যে, প্রবল প্রতাপের অধিকারী সকল প্রাসাদও সে আক্রমণ প্রতিরোধ করতে সক্ষম হয়নি। ঐতিহ্যবাহী ইরানের বহু শতাব্দীর প্রাচীন ঐতিহ্য মুহূর্তের মধ্যে ধুলায় মিশে যায় এবং তার দিগন্তজোড়া প্রতাপ মুজাহিদদের পথের ধূলায় চিরতরে হারিয়ে যায়।

মুসলমানগণ কিসরার এই রাজপ্রাসাদ এক শিক্ষণীয় স্মৃতিরূপে রেখে দিয়েছেন। খলীফা মনসুর একবার তা ভেঙ্গে ফেলার ইচ্ছা করলে তার ইরানী উপদেষ্টা পরামর্শ দেয় যে, আপনি প্রাসাদটিকে ঠিক রাখলে দর্শনার্থীরা এই প্রতিক্রিয়া গ্রহণ করবে যে, নিশ্চয় মুসলমানদের সঙ্গে আল্লাহ তাআলার সাহায্য ছিল। অন্যথায় আরবের সহায় সম্বলহীন মরুচারীরা এমন প্রাসাদ কস্মিনকালেও জয় করতে সক্ষম হত না। মনসুর তার পরামর্শ শ্রবণ করলেন। কিন্তু পরে তার মনে এরূপ ধারণার

উদয় হয়, হয়ত এই উপদেষ্টা ইরানী হওয়ার কারণে তার বাপ–দাদাদের স্মৃতি অক্ষুন্ন রাখার জন্য এই পরামর্শ দিচ্ছে। তাই খলীফা তার পরামর্শের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করে তা ভেঙ্গে ফেলার নির্দেশ দেন। কিন্তু প্রাসাদ ভাঙ্গা শুরু করে অল্প দূর এগুতেই বুঝতে পারেন যে, এটি ভাঙতে এত বেশী অর্থ ব্যয় হবে, যার খুব অল্প পরিমাণই এই প্রাসাদের মালমসলা দ্বারা উশুল হবে, এতে করে প্রচুর জাতীয় সম্পদ বিনষ্ট হবে। তখন মনসুর সেই উপদেষ্টাকেই পুনরায় ডেকে এনে পরামর্শ করলে তিনি বললেন—আমি পূর্বেই আপনাকে এটি না ভাঙ্গার পরামর্শ দিয়েছিলাম কিন্তু এখন আমি আপনার জন্য লজ্জাজনক মনে করি যে, মানুষ বলবে, ইরানীরা এমন প্রাসাদ নির্মাণ করেছিল, যা আপনারা ভাঙ্গতেও সক্ষম হননি। তাই এখন আমার পরামর্শ এই যে, এটি অবশ্যই ভাঙ্গা হোক। খলীফা মনসূর পাঁচ–সাত ভেবে পরিশেষে ভাঙ্গার কাজ বন্ধ করার সিদ্ধান্তই গ্রহণ করেন। কারণ এতে করে অনেক সম্পদ নষ্ট হয়ে যাবে। এর পর থেকে প্রাসাদটি এভাবেই রয়ে গেছে।

আরবী ভাষার বিখ্যাত কবি বুহতারী এই প্রাসাদের চিত্র তুলে ধরে আলোড়ন সৃষ্টিকারী এক কাব্য গাঁথা রচনা করেন। সেই কাব্য সম্পর্কে মন্তব্য করা হয় যে, আরবী ভাষায় এর চেয়ে উৎকৃষ্ট 'কাসিদায়ে সীনিয়া' রচিত হয়নি। বুহতারীর এ ধরনের দুইটি কাব্য রয়েছে। একটি কিসরার রাজপ্রাসাদের চিত্রাঙ্কন করে এবং অপরটি খলীফা মুতাওয়াক্কিল কর্তৃক এক পুষ্করিণীর স্তুতি গাঁথা সম্বলিত। যদি সে এই দুই কাব্য ছাড়া অন্য কিছু রচনা নাও করত, তবুও তার কাব্যের শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণস্বরূপ এ দুটিই যথেষ্ট ছিল। কিসরার রাজপ্রাসাদ সম্পর্কে তার কাব্যগাঁথার প্রথম চরণগুলো এই—

صنت نفسی عما یدنس نفسی

و ترفعت عن جدا کل جبس

و کان الایوان من عجب الصنر

عتر جوب فی جنب آرعن جلس

কিসরার রাজপ্রাসাদের নীচে দাঁড়িয়ে বিগত ১৪ শতাব্দীর অগণিত ঘটনা প্রবাহের এক চলমান চিত্র মনে উদয় হতে থাকে। কল্পনার চক্ষুতে কখনো সেই মুকুট দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল, যার রাজ্যাধীনে সূর্যাস্ত হত না। কখনো বা ঔদ্ধত্য ও অহমিকার সেই মূর্ত প্রতীককে দেখছিলাম, যে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র পত্র ছিঁড়ে ফেলার দুঃসাহস করেছিল। আবার কখনো এই প্রাসাদের স্বর্ণখচিত কক্ষগুলোতে হযরত হুযাইফা বিন ইয়ামান (রাযিঃ) এবং হযরত রিবায়ী বিন আমের (রাযিঃ)এর গুরুগম্ভীর ভাষণ শ্রুতিগোচর হচ্ছিল। আবার কখনো বা এই প্রাচীরে আরোহণরত সেসব মস্তক উৎসর্গকারী মুজাহিদ বাহিনী দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল, যাঁদের হাতে এই ঔদ্ধত্য ও অহমিকার মূলোৎপাটন অবধারিত ছিল। কখনো এখানে সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস (রাযিঃ), খালিদ বিন উরফুতা (রাযিঃ) এবং তাঁর সঙ্গী সাথীদের মস্তক বিজয়ের কৃতজ্ঞতায় সিজদা অবনত দেখা যাচ্ছিল।

মোটকথা অতীতের মনোমুগ্ধকর বহু চিত্র অল্প সময়ের মধ্যে মানসচক্ষে উদ্ভাসিত হতে থাকে। কিন্তু পুনরায় যখন কল্পনার জগৎ থেকে বাস্তবে ফিরে আসি, তখন মনমুগ্ধকর সেসব কল্পনার যাবতীয় প্রাসাদ মাটিতে মিশে যায়। আমি বাস্তব জগতে এমন এক মাটিতে দাঁড়িয়েছিলাম, যা মাদায়েন বিজয়ীদের উত্তরসূরীদের জন্য সংকীর্ণ হয়ে আসছিল। যেখানে সেসব মরুচারীদের আমাদের মত অযোগ্য সন্তানেরা উপায় উপকরণের প্রাচুর্য থাকা সত্ত্বেও ঈমান ও বিশ্বাসের সেই সম্পদ থেকে বঞ্চিত হয়ে চলেছে, যা রোম ও ইরানকে পদানত করার সাহস যোগাত। পরিণামে তারা কায়সার ও কিসরার অধুনা স্থলাভিষিক্তদের চোখে চোখ রেখে কাজ করার পরিবর্তে তাদের দাপটের সম্মুখে আত্মসমর্পণকারীরূপে দণ্ডায়মান এবং জিন্দেগীর প্রত্যেক ক্ষেত্রে তাদের পদাঙ্ক অনুসরণের জন্য প্রস্তুত।

এই বিরাট বেদনাদায়ক বৈপরিত্বের কল্পনায় হৃদয় কেঁপে উঠল, বিস্ময়ও জাগল। কিন্তু পরমুহূর্তে সকল সন্দেহের উত্তর কবিতার এক পংক্তিতেই পেয়ে গেলাম—

حیرت نہ کربدن کومرے چور دیکھ کر

ان رفعتوں کو دیکھ جہاں سے گراتھامیں

"আমার চূর্ণ দেহ দেখে অবাক হয়ো না,
সেই উচ্চতাকেও লক্ষ্য করো যেখান থেকে আমি পতিত হয়েছি।"

ইরাক সরকার মাদায়েন শহরেই এক বিরল ও বিস্ময়কর যাদুঘর (দেওয়াল চিত্র) নির্মাণ করেছে। সে যাদুঘরে কাদেসিয়া যুদ্ধের দৃশ্য এমনভাবে দেখানো হয়েছে যে, দর্শনার্থী ঠিক যুদ্ধের প্রান্তরে দাঁড়িয়ে সকল দৃশ্য স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করছে বলে অনুভব করতে থাকে। যাদুঘরটি প্রায় সাততলা বিশিষ্ট একটি ভবন। এর সিঁড়িতে আরোহণকালে মনে হয় যেন প্রশস্ত কোন মিনারে আরোহণ করছি। সর্বশেষ সিঁড়িটি গম্বুজ সদৃশ একটি হলকক্ষে গিয়ে শেষ হয়েছে। সেখানে পৌঁছেই মানুষ অনুভব করে সে যেন সুউচ্চ দূর্গের উপরস্থ কোন কক্ষে দাঁড়িয়ে আছে। তার সম্মুখে দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত বিস্তৃত একটি প্রান্তর। প্রান্তরের শেষ মাথায় প্রাচীন ধাচের একটি দূর্গ। এটিই সেই 'কাদিস' দূর্গ, যেখান থেকে হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস (রাযিঃ) কাদিসিয়ার যুদ্ধ পরিচালনা করেন। দূর্গের তিন দিকে মুসলমান এবং কিসরার সৈন্যদের যুদ্ধরত দেখা যায়।

মূলতঃ এই হলঘরের দেয়ালের উপর ছাদ পর্যন্ত তিন স্তর বিশিষ্ট চিত্র তৈরী করা হয়েছে, যেগুলোর ভূমি, আকাশ ও মহাশূন্যের রঙ প্রকৃত রঙের সঙ্গে এত বেশী মিল রয়েছে যে, সেগুলো প্রাকৃতিক আকাশ, মহাশূন্য এবং ভূমি বলেই অনুভূত হয় এবং স্তরগুলোতে এমনভাবে রং ব্যবহার করা হয়েছে যে, এসবের দূরত্ব প্রকৃত দূরত্ব বলেই দৃষ্টিগোচর হয়। আদিগন্ত বিস্তৃত এ প্রান্তরে কাদেসিয়া যুদ্ধের যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার দৃশ্য দেখানো হয়েছে। পারস্য বাহিনীর হস্তিসমূহের আক্রমণ, মুসলমানদের পক্ষ থেকে সেগুলোর শূড় কর্তনের দৃশ্য এবং প্রতি উত্তরে মুসলিম বাহিনীর বোরকাবৃত উটের আক্রমণ এবং হযরত কা'কা (রাযিঃ)এর মেধাপ্রসূত তদবীর অনুযায়ী চতুর্দিগন্তের শত শত বীর অশ্বারোহীর তরঙ্গায়িত বাহিনী, যা কিছুক্ষণ পর পর দিগন্তের কোন এক

দিক থেকে আত্মপ্রকাশ করছিল। পারস্য ফৌজের অদক্ষতা, জায়গায় জায়গায় ছটফটকারী লাশসমূহ এবং দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত বিস্তৃত রণাঙ্গনের বিভিন্ন প্রকারের অস্ত্র প্রত্যক্ষ করে কবি আনিসের এই কবিতা স্মরণ হল—

بے رخ کمانیں تیروں سے، چلّے کماں سے دور

مرغانِ تیر سہمے ہوئے آشیاں سے دور

برچھی سے پھل گرے ہوئے نیزے سناں سے دور

پیروں سے عقل دور، تہوّر جواں سے دور

تیغوں کی کچھ خبر تھی، نہ ڈھالوں کا ہوش تھا

نیزہ ہر اک سوار کو اک بارِ دوش تھا

"দিকচ্যুত তীর ধনুক থেকে দূরে
ধনুকের রশি ধনুক থেকে দূরে
তীরবিদ্ধ পাখি বাসা থেকে দূরে
বর্শা থেকে ফলা পতিত, তীর ধনুক থেকে দূরে
বৃদ্ধ থেকে জ্ঞান দূরে, যুবক থেকে গর্ব দূরে
না তরবারীর খবর ছিল, না ঢালের চেতনা ছিল
প্রত্যেক আরোহীর বর্শা তার কাঁধের বোঝা ছিল।"

মোটকথা যাদুঘরটি এ বিষয়ের এক আজব সৃষ্টি। কিন্তু হায়! যদি এর নির্মাণকারীরা লক্ষ্য করতো যে, কাদেসিয়া যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের অধিকাংশই সাহাবায়ে কিরাম ছিলেন। তাঁদের কাল্পনিক চিত্র তৈরী করা শরীয়ত পরিপন্থী তো বটেই উপরন্তু তাঁদের মর্যাদায় ধৃষ্টতারও শামিল। মহান আল্লাহ আমাদের ক্ষমা করুন।

ইরাকের পর্যটন মন্ত্রণালয় কিসরার রাজপ্রাসাদের নিকটবর্তী একটি প্রান্তরে প্রাচীন ধাচের বিস্তৃত ও প্রশস্ত একটি ক্যাম্প তৈরী করেছে। ক্যাম্পের তাঁবুগুলো প্রাচীন যুগে সেনাবাহিনী প্রধানগণ কোথাও অবস্থানকালে যেরূপ তাঁবু ব্যবহার করতেন ঠিক তার অনুরূপ। তাঁবুর অভ্যন্তরে এমনভাবে প্রাচীন আরবীয় সভ্যতার চিত্রাঙ্কন করা হয়েছে যে,

তাতে প্রবেশ করা মাত্রই মনে হয় যেন, আমরা শত শত বছর পূর্বের যুগে ফিরে গেছি। প্রাচীন ধাচের কার্পেট ও গালিচা, তার উপর স্থাপিত পুরাতন গদি ও বালিশ, চর্ম নির্মিত জলপাত্র, মৃত্তিকা ও কাষ্ঠনির্মিত বিভিন্ন পাত্র, পাথরের চুলা এবং অভ্যন্তরে উপবেশনকারী আরব লোকদের দেহে প্রাচীন যুগের বেদুঈন আরবদের পোশাক। মোটকথা প্রতিটি বস্তু প্রাচীন আরব সভ্যতার দর্পণ। আমরা তাঁবুতে প্রবেশ করলে এখানে উপবেশন করা বেদুঈন সদৃশ আরবেরা তাদের ঐতিহ্যবাহী অতিথিপরায়ণতার প্রমাণ দিয়ে উষ্ণ স্বাগতম জানাল, পীড়াপীড়ি করে ইরাকের কফি পেশ করল, যার তিক্ততা এখনও স্মৃতি থেকে মুছে যায়নি। সৌদী আরব সহ অন্যান্য উপসাগরীয় দেশগুলোতে কফির প্রচলন রয়েছে, তার তিক্ততায় অভ্যস্ত হতেও মুখ ও রসনার যথেষ্ট সময় লেগেছে। কিন্তু এই কৃষ্ণবর্ণ ইরাকী কফি তিক্ততায় পূর্বের গুলো থেকে অনেক এগিয়ে। যতদূর মনে হল, এতে অভ্যস্ত হওয়া আমাদের মত লোকের সাধ্যের বাইরে।

মাদায়েন নগরীর দর্শনীয় স্থানসমূহ দেখা শেষ হলে সালমান ফার্সী (রাযিঃ) জামে মসজিদে জোহর নামায আদায় করে দজলা নদীর তীরে মনোরম একটি হোটেলে দ্বিপ্রহরের খাবার খাই। হোটেলের দালানের পাশ দিয়েই পূর্ণ জাঁকজমকের সাথে দজলা নদী প্রবাহমান। এই সেই দজলা, যাকে মাদায়েনের পারসিক শাসকরা মুসলমানদের আক্রমণের মুখে সর্বাধিক মজবুত দূর্গ মনে করেছিল। তাদের ধারণা ছিল যে, ইসলামের মুজাহিদদের অশ্বসমূহ, যা আরব ও ইরাকের বিশাল মরুপ্রান্তর অতিক্রম করে এসেছে। এই তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ নদীর মুখে অসহায় হয়ে পড়বে এবং কিসরার রাজধানী পর্যন্ত তারা পৌছতে সক্ষম হবে না। কিন্তু ইসলামের মুজাহিদদের সেই কাফেলা, যা আল্লাহর কালিমা সুউচ্চে প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে বিশ্বকে আয়ত্বাধীন করার অলৌকিক মনোবল নিয়ে এসেছিল, দজলা তাদের জন্য স্বীয় ভালবাসার ক্রোড় উন্মুক্ত করে দিল। তাঁরা নদীর স্রোত ও তরঙ্গের হাতে তাঁদের অশ্বসমূহ ন্যস্ত করল এবং পূর্ণ বাহিনী শান্তি ও নিরাপদে নদী পার হয়ে গেল।

কুফা ভ্রমণ

পরের দিন সকাল নয়টার কাছাকাছি সময়ে আমরা প্রাইভেট কার যোগে বাগদাদ থেকে কুফা অভিমুখে রওনা হই। কুফা নগরী বাগদাদ থেকে প্রায় দেড় শ' কিলোমিটার দক্ষিণে অবস্থিত। কুফা নগরীতে যাওয়ার জন্য বাগদাদ থেকে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন ও প্রশস্ত সড়ক পথ রয়েছে। পথের উভয় দিক সবুজ শ্যামল খেজুর বৃক্ষে পরিপূর্ণ। খেজুর ইরাকের বিশেষ উৎপাদিত শস্য। বলা হয়ে থাকে যে, বিশ্বের সর্বাধিক খেজুর এখানেই উৎপন্ন হয়। পথিমধ্যে অল্প অল্প ব্যবধানে ছোট ছোট বস্তি এবং ছোট ছোট শহর দেখা যায়। এর মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ 'হিল্লা' শহর, যা ইরাকের ঐতিহাসিক শহরগুলোর অন্তর্ভুক্ত। হিল্লার পাশেই পৃথিবীর প্রাচীনতম ঐতিহাসিক 'বাবেল' নগরী অবস্থিত। বাবেল 'কালদানি' সভ্যতার বৃহত্তম কেন্দ্র ছিল। কথিত আছে যে, হযরত নূহ (আঃ) মহাপ্লাবনের পর এ নগরী আবাদ করেছিলেন। এখান থেকে তাঁর ও তাঁর সঙ্গীদের বংশ বিস্তার লাভ করে। তাঁরা দজলা ও ফুরাতের আশে পাশে অনেক নগরী গড়ে তুলেন। এমনকি তারা দজলার তীর ধরে 'কসকার' পর্যন্ত এবং ফুরাত তীরের কুফা থেকে 'বাবরে' পর্যন্ত পৌছে যায়। এই পুরা অঞ্চল 'সাওয়াদ' নামে প্রসিদ্ধ ছিল।

'আদ'–এর বংশধরদের মধ্যে কালাদানিদের জন্ম হয়। তাদেরকে এ বংশের সিপাহী বলে গণ্য করা হত। কালক্রমে তারা সেখানকার শাসক বনে যায়। কালদানি শাসনের পূর্বে বাবেল নগরীর নাম 'খায়তারেছ' ছিল। কালদানিরা এর বাবেল নামকরণ করে। তাদের ভাষায় বৃহস্পতি গ্রহকে বাবেল বলা হত। সেই নামে এই নগরীর নামকরণ করা হয়। বলা হয় যে, বাবেল নগরী তার উত্থানকালে বার ক্রোশ বিস্তৃত ছিল। এ নগরীকে সে যুগের নির্মাণ শিল্পের শ্রেষ্ঠতম নিদর্শন মনে করা হত। এই শহরকে কেন্দ্র করে অনেক তেলেসমাতি কাহিনীও প্রসিদ্ধ রয়েছে এবং যাদুকরদের আধিক্য হেতু এটি 'মাদীনাতুছ ছেহের' (যাদু নগরী) নামে খ্যাতি লাভ করে।

পবিত্র কুরআনের সূরা বাকারাতেও বাবেল নগরীর আলোচনা করে এরশাদ হয়েছে যে, সেখানে হারুত ও মারুত দুই ফেরেশতা প্রেরিত

হয়েছিল। তাদেরকে বিশেষ এক বিদ্যা শিক্ষা দিয়ে বাবেলের অধিবাসীদের পরীক্ষার নিমিত্তে প্রেরণ করা হয়। এখানের জুব্বে দানিয়াল (আঃ) নামে প্রসিদ্ধ একটি অন্ধ কূপ সম্পর্কে বলা হয় যে, এটি সেই হারুত–মারুতের কূপ। বাবেল নগরীর ভগ্নাংশ সে অঞ্চলে এখনো পাওয়া যায়। কূফাগামী সড়ক থেকেও তার কিছু নিদর্শন দৃষ্টিগোচর হয়।

পরবর্তীতে এ অঞ্চলেই ৪৯৫ হিজরীতে সাইফুদদৌলাহ সাদাকাহ বিন মনছুর 'হিল্লা' শহর আবাদ করেন। তাঁর শাসনকালে শহরটি ইরাকের সুন্দরতম শহরগুলোর অন্যতম ছিল। অনেক আলেমের নাম এই শহরের সাথে সম্পৃক্ত। বর্তমানে এটি ছোট্ট একটি জেলা শহর।

কূফা নগরী এখান থেকে দক্ষিণ পূর্বে অবস্থিত। হিল্লা ছেড়ে বের হওয়ার অল্প পরেই তার নিদর্শন আরম্ভ হয়।

কূফা নগরী, প্রথম শতাব্দীর ইসলামী ইতিহাসের অতীব গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র ছিল। প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দীতে এ নগরী ছিল কেন্দ্রের বিপক্ষে রাজনৈতিক আন্দোলনের উৎস। ইতিহাসের নাজানি কত বিপ্লব এ নগরী প্রত্যক্ষ করেছে। সাথে সাথে হযরত আলী (রাযিঃ), হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাযিঃ) ও আরো অন্যান্য সাহাবায়ে কেরাম এখানে অবস্থান করার কারণে এটি জ্ঞান–বিজ্ঞানেরও অতীব গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রের রূপ লাভ করে। এই কেন্দ্র থেকে হযরত ইমাম আবু হানীফা (রহঃ), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক (রহঃ), হযরত ওকি' বিন জাররাহ (রহঃ) আরো নাজানি ইলম ও আমলের পর্বতসম কত ব্যক্তিত্ব আত্মপ্রকাশ করেন। তাই আমার মত একজন তালেবে ইলমের জন্য কূফা নগরীর সঙ্গে হৃদয়ের বিশেষ সম্পর্ক থাকা এক সহজাত বিষয়। ফলে ইরাক ভ্রমণে যে সকল স্থান বিশেষভাবে দেখার আগ্রহ ছিল, তার মধ্যে কূফা নগরী ছিল শীর্ষে।

হযরত উমর (রাযিঃ)এর শাসনকালে ইরাক বিজয়ী হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস (রাযিঃ) সেনাছাউনীরূপে কূফা নগরী প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে আরবের বিভিন্ন গোত্র নিজ নিজ মহল্লা তৈরী করে। ইতিপূর্বে এ অঞ্চলকে 'সুবেস্তান' বলা হত। প্রথম দিকে এটি একটি সেনাছাউনী থাকায় এখানকার অধিবাসীরা পাকা গৃহ নির্মাণের পরিবর্তে বাঁশ ও খেজুর

পাতার অস্থায়ী গৃহ নির্মাণ করেন। কোথাও যুদ্ধে যেতে হলে এই গৃহ ভেঙ্গে এর বিভিন্ন সামগ্রী দান করে যেতেন। ফিরে এসে তা পুনঃ নির্মাণ করতেন। হযরত মুগিরা বিন শু'বা (রাযিঃ) যখন এখানকার গভর্নর নিযুক্ত হন, তখন তাঁর যুগে এখানে ইট দ্বারা পাকা গৃহ নির্মাণ করা হয়।

হযরত উমর (রাযিঃ) কূফা নগরী আবাদ করার পূর্বে 'বসরা' শহর আবাদ করেন। একবার আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ানের রাজ–দরবারে উভয় নগরীর তুলনামূলক আলোচনা শুরু হয়। তখন হাজ্জাজ বিন ইউসুফ বললেন ঃ 'আমীরুল মুমিনীন! উভয় শহর সম্পর্কে আমি ভালরূপে অবগত আছি।' (হাজ্জাজ ইতিপূর্বে উভয় নগরীর গভর্নর ছিলেন)।

আবদুল মালিক বললেন ঃ 'তাহলে তুমি উভয় নগরীর প্রভেদ সঠিকরূপে তুলে ধর।'

তখন হাজ্জাজ সেই প্রসিদ্ধ প্রবাদটি বললেন ঃ 'কূফা অলংকার ও সাজসজ্জাশূন্য এক কুমারী নারীর মত, আর বসরা এমন এক বৃদ্ধা সমতুল্য, যার কেশ এলোমেলো, মুখ ও বগল থেকে দুর্গন্ধ বের হয়, কিন্তু সে সর্বপ্রকার অলংকার ও সাজসজ্জায় সজ্জিতা।'

কূফা নগরী তার অবস্থান কেন্দ্রের কারণে আশেপাশের বিভিন্ন গোত্র ও সম্প্রদায়ের কেন্দ্রের রূপ লাভ করে এবং দিনে দিনে তার বসতি বিস্তার লাভ করতে থাকে। এখানে মুজাহিদ ও নবমুসলিমদের বিরাট সংখ্যক লোক ও বসতি স্থাপন করে। কিন্তু প্রথম দিকে তাদেরকে ধর্মীয় শিক্ষাদানের জন্য এখানে এমন কোন ব্যক্তিত্ব ছিলেন না, যিনি শিক্ষাদানকে একমাত্র লক্ষ্য বানিয়ে তাদের শিক্ষা–দীক্ষা দান করবেন। হযরত উমর (রাযিঃ) এ উদ্দেশ্যে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিঃ)কে এখানে প্রেরণ করে কূফাবাসীকে লিখে পাঠালেন যে, এর ব্যাপারে আমি তোমাদেরকে নিজের উপর প্রাধান্য দিয়েছি, অর্থাৎ, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদকে প্রয়োজন ছিল আমার, কিন্তু তোমাদের প্রয়োজনের ভিত্তিতে আমি ত্যাগ স্বীকার করে তাঁকে তোমাদের নিকট পাঠিয়ে দিলাম।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) এ নগরীকে জ্ঞান ও গুণে

উদ্ভাসিত করেন। তাঁর সাগরেদগণ তাঁর নিকট হতে ইলম হাসেল করে এখানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেন এবং মক্কা–মদীনার পর হাদীস ও ফিকাহ শাস্ত্রের এটি সর্ববৃহৎ কেন্দ্রের রূপ লাভ করে। যখন হযরত আলী (রাযিঃ) কুফায় আগমন করেন, তখন তিনি জ্ঞান–বিজ্ঞানের এই চর্চা প্রত্যক্ষ করে বলেন ঃ 'আল্লাহ তাআলা ইবনে উম্মে আব্‌দ (হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ)এর উপর রহমত নাযিল করুন। তিনি এই নগরীকে ইলম দ্বারা পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন।'

হামভী লেখেন, কুফা নগরী তার উত্থানকালে (প্রায় ২৬৪ হিজরীতে) ষোল মাইল ব্যাপী বিস্তৃত ছিল এবং তাতে ৭০ হাজার গৃহ ছিল। কিন্তু বর্তমানে নগরায়নের দৃষ্টিতে এ শহরের বিশেষ কোন গুরুত্ব নেই। জনসংখ্যা ও বসতি উভয় দিক থেকে এটি একটি ছোট শহর মনে হয়। আমরা কুফায় প্রবেশ করার পর সর্বপ্রথম কুফার ঐতিহাসিক জামে মসজিদে যাই, যা পৃথিবীর প্রাচীনতম মসজিদসমূহের অন্তর্ভুক্ত।

কুফার জামে মসজিদ

আনুমানিক ১৯ হিজরীতে হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস (রাযিঃ) এই মসজিদ নির্মাণ করেন। এ মসজিদে ৪০ হাজার মানুষের নামায পড়ার ব্যবস্থা ছিল। পরবর্তীতে যিয়াদ বিন আবু সুফিয়ান এ মসজিদকে আরো প্রশস্ত করেন। যে কারণে আরো অতিরিক্ত বিশ হাজার মানুষের স্থান সংকুলান হয়। আজো মানুষ তাতে প্রবেশ করে এর অসাধারণ বিস্তৃতিতে প্রভাবান্বিত না হয়ে পারে না। তার চতুর্দিকে দুর্গসদৃশ সুদৃঢ় প্রাচীর রয়েছে। সে প্রাচীরে প্রাচীনতার নিদর্শন সুস্পষ্ট। তার অভ্যন্তরে শত শত কক্ষ নির্মাণ করা হয়েছে। কক্ষগুলোর দরজা মসজিদের আঙ্গিনার দিকে। এই কক্ষগুলো কোন এক কালে বিদ্যানুরাগীদের অবস্থানস্থল ছিল এবং মুসাফির ছাত্রগণ তাতে অবস্থান করত।

মসজিদের আঙ্গিনার মাঝ বরাবর অনেকগুলো ছোট ছোট মেহরাব নির্মিত আছে। একস্থানে চার কোণাবিশিষ্ট বেষ্টনী আছে। এগুলোর প্রতিটিতে ফলক ঝুলানো আছে। ফলকগুলোতে এ সকল স্থান সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের হস্তপদহীন প্রসিদ্ধ বর্ণনাসমূহ লিখিত আছে। কোথাও

লিখিত আছে, এখানে হযরত ইবরাহীম (আঃ) নামায আদায় করেছেন। কোথাও লেখা আছে, এখানে নূহ (আঃ) নামায পড়েছেন ইত্যাদি ইত্যাদি।

মূলতঃ এ সকল কথার উৎস ভিত্তিহীন একটি বর্ণনা, যা হামভী 'মু'জামুল বুলদান' গ্রন্থে (১৬তম খণ্ড ৪৯৩ পৃঃ) এবং কাযভীনি (রহঃ) 'আছারুল বিলাদ' গ্রন্থে (২৫০ পৃঃ) বর্ণনা করেছেন যার সারাংশ এই যে, জনৈক ব্যক্তি কুফা থেকে বাইতুল মুকাদ্দাস যেতে চাচ্ছিল। হযরত আলী (রাযিঃ) তাকে বারণ করে বললেন ঃ তোমার সেখানে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। কুফার জামে মসজিদ অত্যন্ত মর্যাদাশালী। এখানকার দু' রাকাত নামায অন্যান্য মসজিদের তুলনায় দশগুণ বেশী মর্যাদা রাখে। এই মসজিদেরই এক কোণায় হযরত নূহ (আঃ)এর যুগে চুলা ফেটে পানি উৎসারিত হয়। [যা নূহ (আঃ)এর মহাপ্লাবনের সময় ঘটে]। এর পঞ্চম স্তম্ভের নিকট হযরত ইবরাহীম (আঃ) নামায আদায় করেন এবং এখানে এক হাজার নবী এবং এক হাজার ওলী নামায আদায় করেন। এতেই হযরত মূসা (আঃ)এর লাঠি দাফনকৃত আছে। এতেই সেই কদু গাছ ছিল, যার দ্বারা হযরত ইউনুস (আঃ) নিরাময় লাভ করেন ইত্যাদি ইত্যাদি।

কিন্তু এটি অত্যন্ত ভিত্তিহীন ও প্রপাগাণ্ডামূলক একটি বর্ণনা। হামভী এবং কাযভীনী উভয়েই হাব্বা বিন জুয়াইন নামক এক ব্যক্তি থেকে তা বর্ণনা করেছেন। এ লোক সম্পর্কে হযরত যাহাবী (রহঃ) লিখেন ঃ এ ব্যক্তি কট্টর শিয়াদের অন্যতম। এ লোকই এ কথাও বর্ণনা করেছে যে, হযরত আলী (রাযিঃ)এর সঙ্গে ছিফফীনের যুদ্ধে ৮০ জন বদরী সাহাবী অংশগ্রহণ করেছিলেন, যা অত্যন্ত অযৌক্তিক ও অসম্ভব কথা।

হাফেজ ইবনে হাজার (রহঃ)ও 'তাহযিবুত তাহযিব' (১৭৬ পৃঃ ২য় খণ্ড) গ্রন্থে এ বর্ণনা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন এবং অধিকাংশ উলামায়ে রিজাল (রাবিদের সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ আলেম) এ বর্ণনা সম্পর্কে শক্ত সমালোচনা করেছেন। তবে শিয়াদের রিজাল গ্রন্থসমূহে তার সম্পর্কে অত্যন্ত প্রশংসা ও গুণগরিমা উল্লেখ করা হয়েছে। মামকানী অত্যন্ত শক্তভাবে তা প্রতিহত করেছেন এবং তার সাথে একথাও লিখেছেন যে, এ ব্যক্তি সেই উরাইনা গোত্রের লোক যারা হুযূর সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে এসে মুরতাদ (ধর্মত্যাগী) হয়েছিল এবং সদকার উট ভাগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল।

এতো হল বর্ণনার মূল উৎস হাব্বাতুল উরফীর অবস্থা। তাছাড়া হাব্বাতুল উরফীর অধঃস্তনে কোন্ কোন্ বর্ণনাকারী আছে তা হামভী এবং কাজবীনীও উল্লেখ করেননি। তাই এ বর্ণনা যুক্তি ও বর্ণনাধারা কোন দিক দিয়েই নির্ভরযোগ্য নয়।

কুফার জামে মসজিদের মর্যাদা সংক্রান্ত এ ঘটনা তো ভিত্তিহীন, কিন্তু এর এই ঐতিহাসিক গুরুত্ব অনস্বীকার্য যে, এটি সাহাবাদের যুগের প্রাচীনতম একটি মসজিদ, যেখানে হযরত সা'দ বিন আবু ওয়াক্কাস (রাযিঃ), হযরত আলী (রাযিঃ), হযরত হাসান ও হুসাইন (রাযিঃ), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিঃ), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবি আউফা (রাযিঃ), হযরত আবদুল্লাহ ইবনুল হারেছ (রাযিঃ), হযরত সালমান ফার্সী (রাযিঃ), হযরত মুগীরা বিন শু'বা (রাযিঃ) এবং আরও না জানি কত সাহাবায়ে কেরাম নামায আদায় করেছেন। আরবের কত খ্যাতনামা খতীব এতে খুৎবা দান করেছেন। উপরন্তু এ মসজিদ যুগের অনেক বিরল ও ফকীহ ব্যক্তিত্বের কেন্দ্র ছিল। অতিরঞ্জন ছাড়াই শত সহস্র আলেম এখানে শিক্ষাদান করেছেন। কত না আবেদ ও যাহেদ, আল্লাহর ওলী, কত মুফাসসির, ফকীহ ও মুহাদ্দিস এবং আরবী সাহিত্যের ও যুক্তিবিদ্যার কত রকম পণ্ডিত ব্যক্তি এখানে জ্ঞান ও গবেষণার স্তুতি গেয়েছেন। এই মসজিদ প্রাঙ্গণে আমার মত তালেবে ইলমের সে সকল পবিত্র আত্মা, তাঁদের যিকির ও তাসবীহ এবং তাদের জ্ঞান বিতরণের সুঘ্রাণ অনুভূত না হয়ে পারে না। কুফার জামে মসজিদ বর্তমানেও তার সেই দৈর্ঘ্য-প্রস্থ ও মানমর্যাদা সহকারে বিদ্যমান। কিন্তু দৃষ্টিশক্তি এ আঙ্গিনায় সেসব পাঠদানের সমাবেশ সন্ধান করে ফিরছিল, যেসব সমাবেশ ইমাম আবু হানীফা (রহঃ), সুফিয়ান সাউরী (রহঃ), আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক (রহঃ), ওকী ইবনে জাররাহ (রহঃ), কাজী আবু ইউসুফ (রহঃ) এবং ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ)এর মত ইলেমের এমন পর্বতসমূহ জন্ম দিয়েছে। যাঁরা তাঁদের ইলম ও আমলে সমগ্র বিশ্বকে পরিতৃপ্ত করেছেন।

আজ এই মসজিদে কোন ব্যক্তিকে কোন কিতাব পাঠ করতে দেখা যায় না। শুধুমাত্র জায়গায় জায়গায় ইলমশূন্য গাইডগণ লোকদেরকে ভিত্তিহীন বিভিন্ন ঘটনা শুনিয়ে ফিরছে। এমন কেউ নেই, যে এ সকল মূর্খতাপ্রসূত কাহিনীসমূহের প্রকৃত অবস্থা লোকদেরকে জানাতে সক্ষম। আমি এই প্রশস্ত ও বিস্তৃত মসজিদ প্রাঙ্গণে কল্পনার চোখে শিক্ষা-দীক্ষার সেই সজ্জিত সমাবেশসমূহ অবলোকন করতে থাকি, যেসব সমাবেশের সুগন্ধে এক সময় এই মসজিদের স্তম্ভ ও দরজাসমূহ মৌ মৌ করত। মনে এই আফসোস ছিল যে, আমার মত তালেবে ইলম এখানে এসে পৌঁছল, কিন্তু তা এত দেরীতে যে, বর্তমানে সেসব সমাবেশ স্মরণকারী কোন ব্যক্তিকেও এখানে দেখা যায় না। (কবিতা-অর্থ)

جمگھٹ وہ گل رخوں کے الھی کدھر گئے

کیا ہو گیا گلاب کاتختہ کھلا ہوا

"হে খোদা ! সেই পুষ্পরূপীদের ভীড় কোথায় হারিয়ে গেল?
কি হলো ! গোলাপের পাঁপড়ি বিক্ষিপ্ত পড়ে আছে।"

আঙ্গিনা পেরিয়ে মসজিদের ছাদ আবৃত অংশে পৌঁছলাম। মসজিদের এ অংশ খুব প্রশস্ত নয়। এতে অতি কষ্টে পাঁচ থেকে ছয় কাতার লোক ধরে। এখানেই সেই মেহরাব বিদ্যমান যার মধ্যে হযরত আলী (রাযিঃ)কে শহীদ করা হয়। সম্ভবতঃ সূচনা থেকেই মসজিদের ছাদ বিশিষ্ট অংশ এতটুকুই।

নামাযের বড় বড় সমাবেশে আঙ্গিনা ও বারান্দাতেই কাজ সম্পাদন করা হয়। আলহামদুলিল্লাহ, এই ঐতিহাসিক মসজিদে তাহিয়্যাতুল মসজিদ নামায আদায় করার সৌভাগ্য হয়। ভিতর থেকে বের হয়ে প্রাঙ্গণের ডান হাতের দিকে দুটি বড় বড় গম্বুজ দেখতে পেলাম। একটি হযরত মুসলিম বিন আকিল (রাযিঃ)এর মাজার। যিনি কারবালার ঘটনার পূর্বে হযরত হুসাইন (রাযিঃ)এর প্রতিনিধিরূপে কুফায় অবস্থান করেন এবং সেখানেই তাকে শহীদ করা হয়। তাঁর শাহাদাতের ঘটনাটি বিখ্যাত। বামদিকের গম্বুজটি হযরত হানী বিন উরওয়া (রহঃ)এর

মাজার। যিনি কুফাতে হযরত হুসাইন (রাযিঃ)এর উৎসাহী সহযোগীদের অন্যতম। তিনিই হযরত মুসলিম বিন আকীল (রাযিঃ)কে স্বীয় গৃহে লুকিয়ে রেখেছিলেন।

প্রশাসনিক কার্যালয়

উভয় মাজার ঘুরে দেখার পর আমরা কুফার জামে মসজিদ থেকে বের হয়ে আসি। মসজিদের পশ্চিম দেওয়াল সংলগ্ন কেবলা অভিমুখে (দক্ষিণে) একটি পথ গিয়েছে। এ পথ অতিক্রম করে মসজিদের দক্ষিণ প্রান্তে পৌঁছলে কেবলার দিকের দেওয়াল সংলগ্ন দূর্গ সদৃশ একটি ইমারতের ভগ্নাংশ দেখা যায়। এটা কুফার প্রশাসনিক কার্যালয় ছিল। এটি ছিল প্রথম হিজরী শতাব্দীতে রাজনৈতিক উত্থান পতনের কেন্দ্র। সংক্ষিপ্ত সময়কালে না জানি কত গভর্নর এখানে এসেছে এবং গিয়েছে। কুফাবাসী কাউকে টিকতে দেয়নি।

যেহেতু কুফা বিবিধ সম্প্রদায়ের নগরী ছিল এবং বিভিন্ন ধরনের লোক এখানে বসতি স্থাপন করেছিল, বিশেষতঃ রাজনৈতিক বিশৃংখলার নায়ক অনেক নেতৃবৃন্দ এখানে বাস করছিল, তাই তারা কোন গভর্নরকে অধিক সময় এখানে টিকতে দেয়নি। এমনকি হযরত উমর (রাযিঃ)এর শাসনকালে হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস (রাযিঃ)এর মত মর্যাদাশীল সাহাবী, যিনি আশারায়ে মুবাশশারার (জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশজন) অন্যতম হওয়া ছাড়াও ইরাক বিজয়ী এবং কুফার প্রতিষ্ঠাকারী ব্যক্তিত্বের উপরেও এ অপবাদ আরোপ করে যে, তিনি ঠিকমত নামায আদায় করেন না। (কবিতা)

ناوك نے تیرے صید نہ چھوڑا زمانے میں

"তোমার শর যুগের কোন শিকারকেই বধ করতে ছাড়েনি।"

হযরত উসমান (রাযিঃ)এর শাহাদাতের ঘটনাতেও কুফার বিশৃঙ্খলাবাদীদের বিশেষ ভূমিকা ছিল। হযরত আলী (রাযিঃ)এর সঙ্গে যদিও এরা ভক্তি ও ভালবাসার কথা প্রকাশ করত, কিন্তু তাঁকেও তাঁর খেলাফতের পুরো যুগটাতেই কার্যত অস্থির করে রেখেছে। হযরত হুসাইন

(রাযিঃ)কে এরাই আহবান করেছিল। পরবর্তীতে তাঁকে বন্ধু–বান্ধবহীন ও নিঃসঙ্গ অবস্থায় ছেড়ে দিয়ে কারবালার দুর্ঘটনা ঘটার কারণও এরাই ছিল।

এই প্রশাসনিক কার্যালয়ে অনেক গভর্নর এসেছেন এবং নিহত হয়েছেন। এর শিক্ষণীয় ঘটনা আবদুল মালেক বিন উমায়ের লাইছি বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন—একদা আবদুল মালিক বিন মারওয়ান প্রশাসনিক কার্যালয়ে একটি খাটে শায়িত ছিলেন। আমি তাঁকে বললাম—এই কার্যালয়ে সর্বপ্রথম হুসাইন (রাযিঃ)এর মস্তক উবায়দুল্লাহ ইবনে জিয়াদের সম্মুখে একটি ঢালের উপর রাখা অবস্থায় দেখেছি। অতঃপর এই মহলেই উবায়দুল্লাহ বিন জিয়াদের কর্তিত মস্তক মুখতার বিন ওবাইদ সাকাফীর সম্মুখে দেখি। তারপর এই মহলে মুখতারের কর্তিত মস্তক মুসআব বিন উমায়েরের সম্মুখে দেখি। এরপর এ স্থানেই মুসআব বিন উমায়েরের কর্তিত মস্তক আপনার সম্মুখে দেখি। একথা শুনে আবদুল মালিকের ভীতি সঞ্চার হয় এবং তিনি এখান থেকে স্থানান্তরিত হয়ে যান।

হযরত আলী (রাযিঃ)এর গৃহ

কুফার প্রশাসনিক কার্যালয়ের ডানদিকে পুরাতন ধাচের একটি পাকা বাড়ী রয়েছে। এ বাড়ী সম্পর্কে প্রসিদ্ধ আছে যে, এটা হযরত আলী (রাযিঃ)এর বাড়ী। এ কথাটি এখানে এত প্রসিদ্ধ যে, এ স্থান সর্বশ্রেণীর মানুষের দর্শনস্থলের রূপ লাভ করেছে। কিন্তু আমি আমার সীমিত অধ্যয়নে ঐতিহাসিক এমন কোন প্রমাণ পায়নি, যার ভিত্তিতে এটা প্রকৃতই হযরত আলী (রাযিঃ)এর গৃহ তা নিশ্চিত করে বলা যেতে পারে। কুফার ইতিহাসে অধম কোথাও এর উল্লেখ পায়নি। কিন্তু কুফাবাসীদের মধ্যে কথাটি অধিক প্রসিদ্ধ হওয়ার দৃষ্টিকোণ থেকে তা বাস্তব হওয়া খুব বেশী অস্বাভাবিক নয়।

ছোট্ট একটি বাড়ী। বাড়ীর দরজা উত্তর দিকে। দরজাতে প্রবেশ করতেই ছোট্ট আঙ্গিনা, যার পূর্ব প্রাচীরে দুই কোণায় ছোট ছোট দুটি কক্ষ। কক্ষদ্বয় সম্পর্কে বলা হয় যে, তা হযরত হাসান ও হুসাইন

(রাযিঃ)এর অবস্থান স্থল ছিল। বাড়ীর মূল অংশ পশ্চিম দিকে অবস্থিত। এখানে সুড়ঙ্গ সদৃশ ছোট্ট একটি পথ রয়েছে। পথটি দালান সদৃশ ছোট একটি কক্ষে গিয়ে শেষ হয়েছে। এতে একটি কূপও রয়েছে। দালানের দক্ষিণ দিকের প্রাচীরে একটি দরজা। দরজাটি বড় একটি কক্ষে গিয়ে খোলে। প্রসিদ্ধ আছে যে, কক্ষটি হযরত আলী (রাযিঃ)এর শয়ন কক্ষরূপে ব্যবহৃত হত। তার দক্ষিণ পশ্চিম কোণায় ছোট একটি প্রদীপদানও রয়েছে।

বাড়ীর ছাদ যথেষ্ট নীচু এবং নির্মাণ–ধাচ প্রাচীনকালীন। বলা হয় যে, বাড়ীটি শুরু থেকে তার আসল আকৃতিতে চলে আসছে। অর্থাৎ যদিও বাড়ীটি বারবার নির্মাণ করা হয়েছে এবং বর্তমানে তার প্রাচীরসমূহ সিমেন্টের তৈরী, কিন্তু তার নকশা তেমনি রাখা হয়েছে, যেমন হযরত আলী (রাযিঃ)এর যুগে ছিল। সঠিক অবস্থার পূর্ণ জ্ঞান আল্লাহর।

নজফে

আমরা কুফা ভ্রমণের পর নজফের উদ্দেশ্যে যাত্রা করি। এখন তো কুফা এবং নজফের মধ্যে কয়েক কিলোমিটার দূরত্ব। মাঝখানে এমন অনেক দীর্ঘ জঙ্গল আছে, যার মধ্যে কোন বসতি নেই। কিন্তু কুফার উত্থানকালে এর বসতি নজফ পর্যন্ত প্রায় অখণ্ড ছিল। বর্তমানে যে স্থানকে নজফ বলা হয়, তাকে প্রাচীনকালে 'জহুরুল কুফা' বা 'জাহিরুল কুফা' (কুফার পৃষ্ঠ) বলা হত। এখানে 'রবজ' এবং 'নজফ' নামে দুটি কূপ ছিল, তার পানি দ্বারা আশপাশের খেজুর বাগানসমূহে সেচ কাজ চালানো হত। এই কূপদ্বয়ের পানি পার্শ্ববর্তী কবরস্থান ও জনবসতির ক্ষতি করতে পারে, এ আশংকায় এ অঞ্চলের ভূমি ঢালু করে দেয়া হয়, যার উঁচু অংশ থাকে কুফার দিকে, যাতে করে সেদিকে পানি প্রবাহিত হতে না পারে। ক্রমে এখানকার বসতি বৃদ্ধি পেতে থাকে। এবং কুফার বসতি সংকুচিত হতে হতে কুফার জামে মসজিদের আশেপাশে সীমিত হয়ে যায় এবং এ পুরো অঞ্চলকে এই ঝর্ণার নামে 'নজফ' বলা হতে থাকে, যা এক সময় পৃথক একটি শহরের রূপ লাভ করে।

বর্তমানে নজফে শিয়া মতাবলম্বীদের বড় একটি বিদ্যাপিঠ রয়েছে। তাদের একজন গুরুত্বপূর্ণ পণ্ডিত আকায়ে খুবীএর বাসস্থানও এখানে আছে। নজফ শহরে প্রবেশ করার পর আমাদের পথপ্রদর্শক আমাদেরকে সে স্থানও দেখান, যেখানে ইরানী বিপ্লবের পথপ্রদর্শক খোমেনী সাহেব বহু বছর ইরাক সরকারের রাষ্ট্রীয় মেহমানরূপে অবস্থান করেন।

নজফের বিভিন্ন সড়ক অতিক্রম করে আমরা সেই আলীশান সোনালী প্রাসাদের নিকট পৌঁছি, যা হযরত আলী (রাযিঃ)এর মাজার বলে প্রসিদ্ধ।

মূলতঃ এ স্থানে হযরত আলী (রাযিঃ)এর সমাধিস্থ হওয়ার বিষয়টি ঐতিহাসিকভাবে বিশেষ সংশয়পূর্ণ। যদিও একথা বর্তমানে ব্যাপক প্রসিদ্ধি লাভ করেছে যে, হযরত আলী (রাযিঃ)–এর মাজার এইটিই। কিন্তু হযরত আলী (রাযিঃ)এর মাজার সম্পর্কে ঐতিহাসিক বর্ণনাসমূহ এত বেশী বিরোধপূর্ণ যে, এ ব্যাপারে নিশ্চয়তার সঙ্গে কোন সিদ্ধান্ত দেওয়া দুষ্কর।

খতীবে বাগদাদী (রহঃ) স্বীয় ইতিহাসগ্রন্থে এ বিষয়ে অনেকগুলো বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন। আহমাদ বিন আবদুল্লাহ আল–আজালী (রহঃ) বলেন ঃ 'হযরত আলী (রাযিঃ)কে আবদুর রহমান ইবনে মুলজিম কুফাতে শহীদ করে এবং হযরত হাসান (রাযিঃ) আবদুর রহমান বিন মুলজিমকে হত্যা করেন। হযরত আলী (রাযিঃ)কে কুফাতেই দাফন করা হয়। কিন্তু তাঁর কবর কোথায় তা জানা নেই।'

ইবনে সাদ বলেন ঃ 'হযরত আলী (রাযিঃ)কে কুফার জামে মসজিদের অদূরে 'কসরুল আমারাতে' দাফন করা হয়।' আবু যায়েদ বিন তুরাইফ (রহঃ) বলেন ঃ জামে মসজিদের কেবলার দিকের প্রাচীর সংলগ্ন 'বাবুল ওয়াররাকীন'–এর সম্মুখে একটি ঘর আছে। হযরত আলী (রাযিঃ)কে সেই ঘরে দাফন করা হয়। ঘরটি ইয়াযিদ বিন খালেদ নামীয় জনৈক ব্যক্তির ছিল। এরূপও একটি বর্ণনা আছে যে, কোন একসময় এ ঘর খনন করা হয়, তখন এখান থেকে হযরত আলী (রাযিঃ)এর দেহ সজীব অবস্থায় পাওয়া যায়।

কোন কোন বর্ণনায় বলা হয় যে, হযরত আলী (রাযিঃ)কে কুফাতেই দাফন করা হয়েছিল। কিন্তু হযরত হাসান (রাযিঃ) হযরত মুআবিয়া

(রাযিঃ)এর খেলাফতকালে তাঁর পবিত্র দেহ মদীনা তায়্যিবায় নিয়ে যান এবং সেখানে জান্নাতুল বাকীতে হযরত ফাতেমা (রাযিঃ)এর মাজার সংলগ্ন স্থানে দাফন করা হয়।

আর একটি বর্ণনায় এরূপ আছে যে, হযরত আলী (রাযিঃ)কে শাহাদাতের পরপরই একটি কফিনে রেখে মদীনা তায়্যিবাতে নিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে উটের উপর তুলে দেওয়া হয়। কিন্তু পথিমধ্যে 'তাঈ' অঞ্চলে পৌছে উটটি হারিয়ে যায়। তাঈ গোত্রের লোকেরা কফিনটিকে ধনভাণ্ডার ভেবে নিয়ে যায়। কিন্তু তার ভিতর লাশ দেখতে পেয়ে সেই অঞ্চলেই তাঁকে দাফন করে।

মুতায়্যিন উপাধিতে প্রসিদ্ধ আবু জাফর হাজারী (রহঃ) বলেন ঃ বর্তমানে (নজফের) যেই কবরকে হযরত আলী (রাযিঃ)এর কবর মনে করে লোকেরা যিয়ারত করে থাকে, প্রকৃতই যদি তা হযরত আলী (রাযিঃ)এর মাজার হত, তাহলে আমি দিবারাত্রি সেখানে পড়ে থাকতাম। কিন্তু বাস্তবে তা হযরত আলী (রাযিঃ)এর মাজার নয়,বরং যে লোকের এই মাজার তাঁর নাম শিয়ারা অবগত হলে কবর যিয়ারত করার পরিবর্তে তাতে প্রস্তরাঘাত করার চেষ্টা করত। মূলতঃ এটি হযরত মুগীরা বিন শু'বা (রাযিঃ)এর মাজার।

এ সকল বর্ণনার জন্য খতীব প্রণীত 'তারিখে বাগদাদ' পরিদৃষ্ট (১৩৬ থেকে ১৩৮, ১ম খণ্ড)। বলা বাহুল্য যে, বিরোধপূর্ণ এ সকল বর্ণনার পরিপ্রেক্ষিতে হযরত আলী (রাযিঃ)এর মাজার সম্পর্কে নিশ্চিত করে কোন কথা বলা সম্ভব নয়।

কারবালার সফর

নজফ থেকে আমরা কারবালা অভিমুখে যাত্রা করি। এখান থেকে সুপ্রশস্ত ও পরিচ্ছন্ন একটি সড়ক পথ কারবালা গিয়েছে। পথের উভয় দিকে দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত বিস্তৃত বৃক্ষলতাশূন্য মরুভূমি এবং প্রস্তরময় ভূমি দৃষ্টিগোচর হয়। মাঝে মাঝে কোথাও কোথাও ভ্রমণরত উটের কাফেলা দেখা যায়। যেগুলো বহু শতাব্দী পূর্বের কাফেলার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এখন তো কারবালা একটি জাকজমকপূর্ণ শহর। সেখানে পৌছে

কারবালার সেই মরুপ্রান্তরের কথা কল্পনা করাও অসম্ভব, যার মধ্যে হযরত হুসাইন (রাযিঃ)এর শাহাদাতের হৃদয় বিদারক ঘটনা ঘটেছিল। তবে নজফ থেকে কারবালা যাওয়ার পথে যে পাথুরে ভূমি দৃষ্টিগোচর হয়, তা দেখে অনুমান করা যায় যে, এ ভূমি অতিক্রম করা কত দুস্কর। এবং তা মুসাফিরদের জন্য কতই না ধৈর্য পরীক্ষার বস্তু ছিল।

যোহরের নিকটবর্তী সময় আমরা কারবালা শহরে প্রবেশ করি। বর্তমানে এ শহর অনেক জাকমকপূর্ণ। সম্ভবতঃ কুফাও নজফের তুলনায় এখানে অধিক বসতি রয়েছে। যে সময় হযরত হুসাইন (রাযিঃ)এর শাহাদাতের ঘটনা ঘটে, তখন এটি একটি বৃক্ষলতাশূন্য মরুভূমি ছিল এবং এ পুরো অঞ্চলকে প্রাচীনকালে 'তফফ্' বলা হত। আর মরুভূমির এই অংশ যেখানে হযরত হুসাইন (রাযিঃ) শহীদ হন, তার নাম ছিল কারবালা। এর নামকরণের কারণ সম্পর্কে বিভিন্ন বর্ণনা প্রসিদ্ধ আছে। কেউ বলেন, এটি 'কারবালাতুন' শব্দ থেকে উদ্ভূত। যার অর্থ পায়ের তালুর নম্রতা। এ ভূমি নরম ছিল বলে এর নাম কারবালা হয়। আরবী ভাষায় গম পরিস্কার করাকেও কারবালা বলা হয়। এ থেকে কেউ কেউ বলেন ঃ এই ভূমিতে শক্ত পাথর না থাকায় এমন মনে হত, যেন সযত্নে একে পরিস্কার করা হয়েছে। তাই একে কারবালা বলে। পক্ষান্তরে কারো কারো ধারণা, এ শব্দটি 'কারবুলুন' থেকে উৎগত। যা বিশেষ এক ধরনের ঘাসের নাম। সে ঘাস এ মরুভূমিতে অধিক হারে পাওয়া যেত। তাই এটি কারবালা নামে প্রসিদ্ধ হয়। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

কারবালা পৌছে আমরা সর্বপ্রথম হযরত হুসাইন (রাযিঃ)এর মাজার হিসেবে প্রসিদ্ধ মহলে যাই। হযরত হুসাইন (রাযিঃ)এর মাজার সম্পর্কেও বর্ণনাসমূহ পরস্পর বিরোধপূর্ণ। সাধারণতঃ প্রসিদ্ধ এই যে, তাঁর পবিত্র দেহ কারবালাতেই দাফন করা হয়। কিন্তু পবিত্র মস্তক যেহেতু দিমাশ্‌কে ইয়াজিদের নিকট নিয়ে যাওয়া হয়, তাই মস্তক এখানে দাফন করা হয়নি। এতদব্যতীত পবিত্র মস্তকের মাজারের নামে বিভিন্ন শহরে বড় বড় ইমারত নির্মিত হয়েছে। যদি এ বর্ণনা সঠিক হয় যে, তাঁর পবিত্র মস্তক ইয়াযিদের নিকট সিরিয়াতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, তাহলে দিমাশ্‌কে তা সমাধিস্থ হবার বিষয়টিতো বোধগম্য হয়, কিন্তু কায়রোর আল–আজহার

জামে মসজিদের সম্মুখেও এ নামে খুব জাকজমকপূর্ণ একটি মাজার আছে। এই মাজারকে কেন্দ্র করে পুরো মহল্লাটি সায়্যিদুনা আল হুসাইন (রাযিঃ)এর নামে প্রসিদ্ধ, যার স্বরূপ বোধগম্য নয়।

মোটকথা পবিত্র মস্তক সম্পর্কে বর্ণনাসমূহ খুব বেশী বিরোধপূর্ণ। তবে পবিত্র দেহ সম্পর্কে কারবালায় সমাধিস্থ হওয়ার বিষয়টি অধিক যুক্তিযুক্ত মনে হয়। যদিও এর স্থান নির্ধারণের বিষয়টি ঐতিহাসিকভাবে খুবই সন্দেহজনক। খ্যাতনামা মুহাদ্দিস ও ইতিহাসবিদ ইমাম আবু নাঈম (রহঃ)এর নিকট জনৈক ব্যক্তি হযরত হুসাইন (রাযিঃ)এর মাজারের স্থান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি তার অজ্ঞতার কথা ব্যক্ত করেন। কারবালার অন্যান্য মাজারগুলো হযরত হুসাইন (রাযিঃ)এর ভ্রাতা হযরত আব্বাস এবং পুত্র আলী আকবার প্রমুখের। সেগুলোতে হাজির হওয়ার সৌভাগ্য হয়। তখন কারবালার হৃদয়বিদারক ঘটনাসমূহ এক এক করে মনের পর্দায় ভাসতে থাকে। সে সময় ফুরাত নদী এর নিকট দিয়েই বহমান ছিল। এখন এখান থেকে কিছুটা দূরে সরে গেছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবারের এ সকল মহামানব মদীনা তায়্যিবা ছেড়ে কারবালার মরুপ্রান্তরে প্রাণ দানের এ কষ্ট নিঃসন্দেহে দুনিয়া লাভের কোন আশায় বরণ করেননি। আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন ব্যতিরেকে অন্য কোন লক্ষ্যই তাঁদের ছিল না। কবিতা—

خدا رحمت کند ایں عاشقان پاک طینت را

"আল্লাহ তাআলা এ সকল সৎপ্রকৃতি সম্পন্ন প্রেমিকদের উপর রহমত বর্ষণ করুন।"

বাগদাদে শেষ রজনী

কারবালা থেকে যখন বাগদাদে ফিরে আসি, মাগরিবের সময় তখন আসন্ন ছিল। আজ আমাদের বাগদাদ অবস্থানের শেষ রজনী। কিছু সময় হোটেলে বিশ্রাম করে রাত্রিতে আমরা দজলার তীরে বেড়াতে যাই। আবহাওয়া মনোরম ও শীতল ছিল। পূর্ণ যৌবনের সাথে দজলা প্রবাহিত হচ্ছিল। ঐতিহাসিক এ নদীতে এক প্রকারের মাছ পাওয়া যায়, যাকে

স্থানীয় ভাষায় 'বুন্নি' বলা হয়। এটা অত্যন্ত সুস্বাদু এবং গন্ধযুক্ত মাছ। বাগদাদে এ মাছ রান্না করার ভিন্ন এক পদ্ধতি প্রচলিত আছে। মাছ মাঝখান দিয়ে চিরে প্রায় বিশ পঁচিশ মিনিট চুলায় ছেঁক দেওয়া হয়। এ অল্প সময়েই তা খাওয়ার যোগ্য হয়। তাকে 'মাজকুফ' মাছ বলা হয়।

দজলা নদীর তীরে মাজকুফ মাছ রান্নাকারীদের রেষ্টুরেন্ট বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত। সেদিন বাগদাদে এ বিশেষ খাবারের স্বাদ আস্বাদন করি। তারপর আমি এবং শ্রদ্ধেয় ক্বারী বশীর আহমাদ সাহেব (মুঃ যিঃ) দীর্ঘ সময় পর্যন্ত দজলার তীরে পায়চারী করতে থাকি। নদীর উভয় তীরে নির্মিত বিরাট বিরাট অট্টালিকার আলোকরাজি পানিতে প্রতিবিম্ব হয়ে বিস্ময়কর ও বিচিত্র রং সৃষ্টি করেছে। এই সেই দজলা, একসময় যার তীরে আব্বাসীয় খলীফাদের জাকজমকপূর্ণ প্রাসাদ ছিল। এই সেই দজলা যা তাতারীদের আক্রমণে মুসলমানদের রক্তে রঞ্জিত হয়েছিল। একসময় তা গ্রন্থরাজির কালিতে কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করেছিল। এই নদী মুসলমানদের উত্থান পতনের কত যে উপাখ্যান প্রত্যক্ষ করেছে। ইতিহাসের নাজানি কত রহস্য আপন তরঙ্গমালাতে লুকিয়ে নিয়ে আজও তা পূর্ণ যৌবন সহকারে প্রবাহিত হচ্ছে। কিন্তু এই নদীর তীরে মুসলমানগণ যেই উদ্দীপ্ত সভ্যতা বিশ্বকে দান করেছিল, তা কল্পনা করতে চক্ষু বন্ধ করতে হয় এবং মস্তিস্কে চাপ প্রয়োগ করে বলতে হয়—(কবিতা)

ہاں دکھادے اے تصور پھروہ صبح و شام تو

دوڑ پیچھے کی طرف اے گردش ایام تو

"হে কল্পনা, পুনর্বার সেই সকাল ও সাঝ আমাকে দেখিয়ে দাও। হে কালের আবর্তন, পুনর্বার তুমি পিছন ফিরে চল।"

॥॥॥

নীল নদের দেশে

[মিসর ও আলজেরিয়া সফর]

সফরকাল ঃ জিলকদ ১৪০৫ হিজরী
মোতাবেক জুলাই ১৯৮৫ ঈসায়ী

سُنی نہ مِصر و جزائر میں وہ اذاں مَیں نے
دِیا تھا جس نے پہاڑوں کو رعشۂ سیماب

মিসর আর আলজেরিয়ার বাতাসে আযানের সেই সুরধ্বনি
আমার শ্রুতিগোচর হয়নি, যা এককালে পর্বতমালাকে
পারদের ন্যায় প্রকম্পিত করেছিল।

নীল নদের দেশে

গণপ্রজাতন্ত্রী আলজেরিয়ার ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয় গত ১৯ বছর যাবত প্রতিবছর আলমে ইসলামের আলেম ও চিন্তাবিদদের এক আন্তর্জাতিক মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত করে আসছে। সম্মেলনের নাম 'মুলতাকাল ফিকরিল ইসলামী'। প্রতিবছর এই সম্মেলনের একটি মূল আলোচ্য বিষয় নির্ধারিত করে দেওয়া হয়। সকল প্রবন্ধকার নির্ধারিত প্রতিপাদ্য বিষয়ের উপর নিজ নিজ প্রবন্ধ পেশ করে থাকেন। দু' বছর পূর্বে 'ইজতিহাদ বিষয়ে এই মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এতে লেখককেও অংশগ্রহণের জন্য দাওয়াত করা হয়। আমি আমার প্রবন্ধ সেই সম্মেলনে পাঠিয়ে দেই। প্রবন্ধটি সেখানে ছাপিয়ে বিতরণ করা হয়। পরবর্তীতে ইসলামাবাদের 'আদ্দিরাসাতুল ইসলামিয়া' পত্রিকাও তা নকল করে প্রকাশ করে। কিন্তু বিভিন্ন ব্যস্ততার কারণে আমি নিজে আলজেরিয়ায় যেতে পারিনি।

এ বছর রমযানুল মুবারক চলাকালীন পুনরায় সেই সম্মেলনের দাওয়াতপত্র আমার হাতে পৌঁছে। বিভিন্ন অভিজ্ঞতার আলোকে আন্তর্জাতিক কনফারেন্সসমূহ থেকে ক্রমেই মনে একপ্রকার অনিহা সৃষ্টি হতে আরম্ভ করেছে। কারণ সাধারণতঃ এসব কনফারেন্সের ইতিবাচক কোন ফলাফল প্রকাশ পেতে দেখা যায় না। তাই শুধুমাত্র কনফারেন্সে অংশগ্রহণের জন্য কোন সফরে যেতে এখন আর মন চায় না। তবে যেহেতু এখনও পর্যন্ত আমার পাশ্চাত্যের ইসলামী দেশগুলোর কোথাও যাওয়া হয়নি এবং এ সম্পূর্ণ ভূখণ্ডের সঙ্গে ইসলামের উজ্জ্বল যুগের মহান স্মৃতিসমূহ জড়িয়ে আছে। এজন্য আলজেরিয়া দেখা এবং তথাকার মুসলমানদের সঙ্গে মিলিত হওয়ার আকাঙ্খা দীর্ঘ দিন ধরে অন্তরে ছিল। তাছাড়া এবারের এই সম্মেলনের তারিখও এমন ছিল যে, এতে অংশগ্রহণ করতে অন্য কোন গুরুত্বপূর্ণ প্রোগ্রাম প্রতিবন্ধক ছিল না। বিধায় আল্লাহর নাম নিয়ে এই সফরে যাওয়ার নিয়্যত করি।

পাকিস্তান থেকে আলজেরিয়া যাওয়ার জন্য আকাশপথে সরাসরি কোন সার্ভিস না থাকায় অন্য কোন দেশ হয়ে যেতে হয়। ঘোরাপথের বিমান সার্ভিস এমন ছিল যে, সম্মেলনের শুরুতে পৌছা আমার জন্য সম্ভবপর ছিল না। এ সম্মেলন ৮ই জুলাই সোমবার হতে ১৬ই জুলাই পর্যন্ত চলতে থাকে। আমি ৯ই জুলাই মঙ্গলবার রাত্রি আড়াইটায় পিআইএ এর প্লেনে কায়রোর পথে যাত্রা করি। পথিমধ্যে এক ঘন্টার জন্য দুবাইয়ে বিরতি দিয়ে মিশরীয় সময়ে ভোর সাড়ে ছয়টায় কায়রোর বিমান বন্দরে অবতরণ করি। বিমান বন্দরে অভ্যর্থনার জন্য কোন লোক ছিল না। যাদেরকে আমি জানিয়েছিলাম তারা সম্ভবতঃ সংবাদ পায়নি। কিন্তু পিআইএ-এর কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ বিশেষ করে কায়রোর ষ্টেশন ম্যানেজার ফারুক হামিদ সাহেব অত্যন্ত ভালোবাসা ও ভদ্রতার আচরণ করেন। আল্লাহর অনুগ্রহে তারা বিমান বন্দরের সকল ঘাঁটি অতি সহজে অতিক্রম করে, খুব আরামে হোটেলে পৌছিয়ে দেন। আলজেরিয়ার প্লেনের অপেক্ষায় আমাকে এখানে দুদিন এক রাত্রি অবস্থান করতে হয়। মিসরে পাকিস্তানের বর্তমান রাষ্ট্রদূত হলেন আমাদের সাবেক ডাক ও যোগাযোগ মন্ত্রী জনাব রাজা যফরুল হক সাহেব। হোটেল থেকে আমি তাকে টেলিফোন করি। অধমের আগমনে তিনি অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করেন। আমি কিছু সময় বিশ্রাম করার পর তিনি হোটেলে গাড়ি পাঠিয়ে দেন। সেই গাড়ীতে করে আমি পাকিস্তানী দূতাবাসে যাই।

মাশাআল্লাহ! রাজা সাহেব সকলের অতি প্রিয় ও মনের মনিকোঠার ব্যক্তিত্ব। আল্লাহ তাআলা তার দ্বারা অনেক কাজ নিয়েছেন। তিনি মিসরে রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত হওয়ার পর জ্ঞানী-গুণী ও ধার্মিক মহলের লোকদেরও মন জয় করেন। তার সঙ্গে আমার মনোরম সাক্ষাত হয়। তার নিকট থেকে মিসরের বিভিন্ন অবস্থা সম্পর্কে অবগত হই।

ইতিপূর্বের কায়রো ভ্রমণে আমি মিসরের পিরামিড দেখতে পারিনি। কারণ তা শহর থেকে একটু দূরে অবস্থিত। রাজা সাহেব তার নিজস্ব গাড়ীর ব্যবস্থা করে আমার জন্য পিরামিড যাওয়া সহজ করে দেন। ফলে এইবার সেই ঐতিহাসিক ও শিক্ষণীয় স্থান তৃপ্তি সহকারে দেখার সুযোগ ঘটে।

মিসরের পিরামিড

প্রাচীনকালে বিশ্বের যে সপ্তাশ্চর্য প্রসিদ্ধ ছিল, তার মধ্যে মিসরের পিরামিডই একমাত্র এমন আশ্চর্য বস্তু, যা আজ পর্যন্তও আশ্চর্যজনক রূপে স্বীকৃত হয়ে আসছে। খৃষ্টপূর্ব শত সহস্র বছরের নির্মিত বিস্ময়কর এই ভবনসমূহ অদ্যাবধি পুরো প্রকৌশল ইতিহাসের বিস্ময়কর বস্তু মনে করা হয়। আজ প্রযুক্তি যখন তার উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করেছে, 'আল হারামুল আকবার' এ যুগেও তার দৈর্ঘ্য, প্রস্থ এবং উচ্চতার দিক দিয়ে বিশ্বের সর্ববৃহৎ ভবন।

এই ভবন কে কোন্ উদ্দেশ্যে নির্মাণ করেছিল এ বিষয়ে ঐতিহাসিক বর্ণনাসমূহ এত বেশী বিরোধপূর্ণ যে, তার ভিত্তিতে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া দুস্কর। মিসরের খ্যাতনামা ইতিহাসবিদ আল্লামা মুকরিযী (রহঃ) লেখেন ঃ "লোকদের মাঝে পিরামিডসমূহের নির্মাণ তারিখ, তার প্রতিষ্ঠাতার নাম এবং নির্মাণের হেতু সম্পর্কে মতানৈক্য রয়েছে এবং এ বিষয়ে অনেক বিরোধপূর্ণ উক্তি রয়েছে যার অধিকাংশই সঠিক নয়।"

তবে প্রাচীন আরবীয় উৎসসমূহে এ বিষয়ে যে বর্ণনাটি অধিক প্রসিদ্ধ তা এই যে, হযরত নূহ (আঃ)এর প্লাবনের পূর্বে মিসরের সুরীদ নামীয় এক বাদশাহ একটি স্বপ্ন দেখেছিলেন। সেই স্বপ্নের ব্যাখ্যা কোন কোন জ্যোতিষী ও গণক এই দিয়েছিল যে, পৃথিবীতে বিশ্বব্যাপী এক বিপর্যয় আসন্ন। তখন সুরীদ এসব পিরামিড নির্মাণের নির্দেশ দেন। তার অভ্যন্তরে এমন কিছু সুড়ঙ্গপথ তৈরী করেন, যে পথে নীলনদের পানি প্রবেশ করে বিশেষ এক স্থানে পৌছতে পারে। সঙ্গে সঙ্গে এই ভবনে বিভিন্ন প্রকার বিস্ময়কর বস্তু অন্তর্ভুক্ত করেন এবং সে যুগের মিসরবাসী বিজ্ঞান ও অংক শাস্ত্র থেকে শুরু করে চিকিৎসা ও যাদুবিদ্যা পর্যন্ত যত ধরনের জ্ঞান সম্পর্কে অবগত ছিল, তার সবগুলো ভবনের প্রাচীর ছাদ এবং স্তম্ভসমূহের উপর লিখে সংরক্ষণ করে। পরবর্তীতে এই ভবনকেই বাদশাহদের সমাধিরূপে ব্যবহার করা হয়।

এ সম্পর্কে আরেকটি বর্ণনা এই আছে যে, আদ সম্প্রদায়ের শাদ্দাদ নামক এক বাদশাহ পিরামিডসমূহের প্রতিষ্ঠাতা। কোন কোন বর্ণনায় হযরত ইদরীস (আঃ)কে এগুলোর প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়েছে।

এ সকল ভবন সম্পর্কে বিভিন্ন প্রকার জাদুকরী কাহিনীও প্রসিদ্ধ রয়েছে। যেগুলো আল্লামা সুয়ূতী (রহঃ) এবং আল্লামা মুকরিযী (রহঃ) স্ব স্ব গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।

কিন্তু আধুনিক কালের প্রত্নতত্ত্ববিদগণ বিভিন্ন খনন কার্য এবং বিভিন্ন প্রাপ্ত লিখনীসমূহের গবেষণার পর যে সিদ্ধান্তে উপনীত হন তা এই যে, মিসরের পিরামিডগুলো মূলতঃ প্রাচীনকালের বাদশাহদের সমাধিরূপে নির্মাণ করা হয়েছিল। তৎকালে বাদশাহদের সমাধিসমূহ এইরূপ আকৃতিতে নির্মাণ করা হত যে, তার গোড়ার অংশ মোটা ও উপরে ক্রমান্বয়ে সরু থাকত। ফারাওদের চতুর্থ বংশ থেকে শুরু করে সপ্তদশ বংশ পর্যন্ত সমাধির এই পদ্ধতি জনপ্রিয় থাকে। ফলে মিসরের বিভিন্ন অংশে অনেকগুলো পিরামিড নির্মিত হয়। তাই প্রায় আশিটি পিরামিডের নিদর্শন নীলনদের পশ্চিমাঞ্চল এবং মিসরের নিম্নাঞ্চল ও মধ্যবর্তী অঞ্চলসমূহে এখনও পাওয়া যায়। কিন্তু এসব পিরামিডের অধিকাংশই সাধারণ আকারের এবং এগুলোকে উপরদিকে সরু করার জন্য সিঁড়ির মত রূপ দেওয়া হয়েছে। এসব পিরামিডকে 'আলআহরামুস সাদিকা' বলা হয়। এ সকল পিরামিডের মধ্য থেকে প্রাচীনতম সমাধিটি (পিরামিড) সক্‌রা নগরী থেকে কয়েক মাইল দক্ষিণে অবস্থিত।

কথিত আছে যে, ফারাওদের চতুর্থ রাজবংশের একজন বাদশাহ সম্রাট ইসনিফরদ খৃষ্টপূর্ব ১৬০০ সনে এটি নির্মাণ করেন। কিন্তু এসব পিরামিডকে তার প্রাচীনত্ব সত্ত্বেও নির্মাণ শিল্পের দৃষ্টিকোণ থেকে কোন বিস্ময়কর বস্তু বলে সাব্যস্ত করা হয়নি। পরবর্তীতে কায়রোর অদূরে জিযা অঞ্চলে (যা এখন কায়রো শহরের অংশ) তিনটি পিরামিড নির্মাণ করা হয়। এগুলো আকারের দিক দিয়েও অসাধারণ এবং তাকে সরু আকৃতি দেওয়ার জন্য সিঁড়ির ধরনও অবলম্বন করা হয়নি। বরং এগুলোর পৃষ্ঠকে নীচ থেকে উপর পর্যন্ত সটান রেখে সরু আকৃতির করা হয়েছে। এই পিরামিডত্রয়কেই বিশ্বের আশ্চর্য বস্তুরূপে গণ্য করা হয় এবং আজও তা বিশ্বের পর্যটকদের মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে আছে। আধুনিক কালের গবেষণা অনুযায়ী উক্ত পিরামিডত্রয় হযরত ঈসা (আঃ)এর জন্মের প্রায় আড়াই হাজার বছর পূর্বে ফারাওদের বংশের

চতুর্থ শাখার বাদশাহ খুফু ও তার পুত্র খফরে এবং মানকারা নির্মাণ করেছিলেন। এর মধ্যে সর্ববৃহৎ ভবনটিকে আল হারামুল আকবার বলা হয়। বাদশাহ খুফু এটি নির্মাণ করেন। ভূপৃষ্ঠে তার মোট আয়তন ১৩.১ একর জমি। মাত্র এক দিকের ভূপৃষ্ঠে এর দৈর্ঘ্য ৭৫৬ ফুট। নির্মাণ শেষে এর উচ্চতা ৪৮১.৪ ফুট ছিল। পরবর্তীতে উপরের কিছু অংশ কমে যাওয়ার ফলে তার উচ্চতা ৩১ ফুট লোপ পায়। এটি নির্মাণ করতে ২০ লক্ষের অধিক পাথরের ব্লক ব্যবহার করা হয়েছে। তার কোন একটি পাথরের ওজনও দুই টনের নীচে নয়। কোন কোন পাথর ১৫ টন ওজনেরও রয়েছে। তবে পাথরগুলোর গড় ওজন আড়াই টন করে। পাথরগুলোকে এমন শৈল্পিক নৈপুণ্যের সঙ্গে জোড়ানো হয়েছে যে, এগুলোর মধ্যবর্তী ফাটল বাহির থেকে দৃষ্টিগোচর হয় না। বরং দূর থেকে পুরো ভবনটিকে একটি মাত্র দৈত্যাকৃতির ক্রমান্বয়ে সরু পাথর বলে মনে হয়।

আমেরিকার এক প্রত্নতত্ত্ববিদ ডেসমণ্ড ষ্টুয়ার্ট মিসরের পিরামিড সম্পর্কে একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ রচনা করেছেন। সে গ্রন্থে তিনি লেখেন ঃ "বিশ্বের সর্ববৃহৎ এই পাথুরে নির্মাণকার্য তের একর জমিতে দাঁড়িয়ে আছে। তা ২০ লক্ষের অধিক ব্লক সম্বলিত। ব্লকগুলোর ওজন গড়ে আড়াইটন করে। ..... এর প্রত্যেক দিক ৭৫৫ ফুট দীর্ঘ কিন্তু বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, এর প্রতিটি কোণ পূর্ণাঙ্গ সমকোণ বিশিষ্ট। এর সম্মুখ ভাগের পাথরগুলোকে এমনভাবে খাড়া করা হয়েছে যে, তার মধ্যবর্তী জোড়া দৃষ্টিগোচর হয় না।"

আমরা আলহারামুল আকবারের নীচে পৌছে তার ঠিক মাঝ বরাবর ভূমি থেকে সামান্য উঁচুতে গুহার মত একটি দরজা দেখতে পাই। দরজাটি একটি সুড়ঙ্গ পথে গিয়ে মিলিত হয়েছে। সুড়ঙ্গ পথটি ভিতর দিয়েই পিরামিডের চূড়া পর্যন্ত উঠে গেছে। আরব ইতিহাসের বর্ণনা অনুযায়ী এটি পিরামিডের কোন দরজা নয়। বরং খলীফা মামুনুর রশীদ তার শাসনকালে এর ভিতরের রহস্য উদঘাটনের জন্য হারামে আকবারের ভিতরের অংশ খনন করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। মাত্র এতটুকু অংশের খননকার্যে সে যুগের বিরাট অংকের সম্পদ ব্যয় করা হয়। এ কাজে

আগুন এবং সিরকা থেকে শুরু করে মিনজানিক (তৎকালীন উৎক্ষেপণযন্ত্র) পর্যন্ত ব্যবহার করা হয়। খননের পর জানা যায় যে, এর প্রাচীরের পুরুত্ব ২০ হাত। ফলে ২০ হাত জায়গার খনন কাজ শেষ হলে সহসা সে স্থান বের হয়ে আসে যেখান থেকে সুড়ঙ্গ পথটি উপরে উঠে গিয়েছে। সুড়ঙ্গের মুখে জবরজদ পাথরের একটি চিলমচিও রক্ষিত পাওয়া যায়। সেই চিলমচিতে এক সহস্র স্বর্ণমুদ্রা রাখা ছিল। যার প্রত্যেকটির ওজন এক আওকীয়া (১ তোলা ৭ মাশা)। পরবর্তীতে মামুনুর রশীদ খননকার্যের মোট ব্যয় হিসাব করে দেখেন ব্যয়ের পরিমাণ প্রাপ্ত স্বর্ণমুদ্রার সমান সমান।

সুড়ঙ্গে আরোহণ করা খুবই কষ্টসাধ্য। আরোহণের কষ্ট এবং গরমের প্রচণ্ডতায় মানুষ উপরে পৌছতে পৌছতে ঘর্মে সিক্ত হয়ে যায়। সুড়ঙ্গ পথটি পাথরের প্রাচীর বিশিষ্ট প্রশস্ত ও বিস্তৃত একটি হলকক্ষে গিয়ে শেষ হয়েছে। হলকক্ষের উত্তর পশ্চিম কোণে পাথরের একটি হাউজ রয়েছে। বাদশাহদের দেহ সেই হাউজের ভিতর রাখা হত। ইতিহাসে লেখা আছে, পিরামিডের প্রাচীরসমূহে বিরল ও বিচিত্র হস্তলিপিতে বিভিন্ন কথা লেখা ছিল। কালক্রমে তা মিশে গেছে, এর প্রাচীরসমূহ বিচিত্র কারুকার্য ও হীরা জহরত দ্বারা সজ্জিত ছিল। বর্তমানে এর কোন কিছুই অবশিষ্ট নেই।

বড় পিরামিডের পর দ্বিতীয় পর্যায়ে হারামে আওসাত অবস্থিত। এর নীচে দাঁড়িয়ে উপর দিকে তাকালে এটিকেই বড় বলে মনে হয়। কিন্তু বাস্তবে এটি পূর্বেরটির তুলনায় ছোট। নির্মাণকালে এর উচ্চতা ছিল ৪৭১ ফুট। বর্তমানে তার উচ্চতা ৪৪৭ ফুট। এটি বাদশাহ খুফুর পুত্র খাফরে কর্তৃক নির্মিত। যিনি সিজারেন নামে অধিক প্রসিদ্ধ।

তৃতীয়টি হারামে আসগার। নির্মাণকালে এটি ২১৮ ফুট উঁচু ছিল। বর্তমানে ২০৪ ফুট উঁচু। এটি খাফরের স্থলাভিষিক্ত মানকারা কর্তৃক নির্মিত। যিনি মাইসার নিউস নামে পরিচিত। পিরামিড তিনটি কায়রোর স্বাভাবিক ভূপৃষ্ঠ থেকে অনেক উঁচুতে হওয়ায় এখান থেকে কায়রো নগরীর দৃশ্যও বড় সুন্দর দেখা যায়। সর্বদা এখানে পর্যটকদের ভিড় থাকে। ফকীহ আম্মারা আল ইয়ামানী মিসরের পিরামিড সম্পর্কে বলেন (কবিতা) ঃ

خليلى ما تحت السماء بنية

مماثل فى اتقانها هرمى مصر

بناء يخاف الدهر منه و كل ما

على ظاهر الدنيا يخاف من الدهر

تنزه طرفى فى بديع بناء ها

ولم يتنزه فى المرادبها فكرى

"বন্ধুরা! গগনতলে এমন কোন ভবন নেই, যা স্বীয় দৃঢ়তায় মিসরের পিরামিড দ্বয়ের অনুরূপ। এটি এমন এক ভবন, যুগও যাকে ভয় পায়। অথচ পৃথিবীর বুকে অপরাপর বস্তুসমূহ যুগকে ভয় পেয়ে থাকে। আমার নয়নযুগল বিরল ও বিস্ময়কর এই ভবন অবলোকন করে জুড়িয়ে যায়। কিন্তু যে উদ্দেশ্যে এ ভবন নির্মাণ করা হয়েছে, তার কল্পনায় আমার মন প্রফুল্ল হয় না।"

আমার মতে মিসরের পিরামিডের মত আশ্চর্যজনক বস্তু সম্পর্কে এর চেয়ে উৎকৃষ্ট ও যথার্থ মন্তব্য হতে পারে না।

আবুল হাওল

জিযার পিরামিডের পূর্ব দিকে জগদ্বিখ্যাত 'আবুল হাওল' অবস্থিত। এটা মূলতঃ হারামে আওছাতের প্রতিষ্ঠাতা খাফরের প্রতিকৃতি। তার জীবদ্দশায় সে নিজে এটি বানিয়েছিল। মুকরিযী (রহঃ) লেখেন ঃ এই প্রতিকৃতিটির প্রাচীন নাম ছিল 'বেলবীব'। আরবেরা তার 'আবুল হাওল' নামকরণ করেছে। মুকরিযী (রহঃ)এর যুগে এই প্রতিকৃতির শুধুমাত্র মুণ্ডু ও গ্রীবা ভূপৃষ্ঠের উপর দেখা যেত। অবশিষ্ট দেহ মাটির নীচে রয়েছে বলে মানুষ ধারণা করত। পরবর্তীতে কোন এক সময় মাটি খনন করা হলে তাদের সে ধারণা সঠিক প্রমাণিত হয়। বর্তমানে তার চতুর্দিকে মাটি খনন করে সরিয়ে দেয়া হয়েছে। ফলে এখন সম্পূর্ণ প্রতিকৃতি দৃষ্টিগোচর হয়। পরবর্তীতে মুখমণ্ডলের পরিষ্কার চিত্রগুলো মিলিয়ে গেছে। মুকরিযী

(রহঃ) লেখেন ঃ আমাদের যুগে শেখ মুহাম্মাদ নামে একজন বুযুর্গ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি সর্বদা রোযা রাখতেন। চোখে পড়ে এমন অনেক নিষিদ্ধ বস্তু উচ্ছেদের জন্য তিনি একটি পরিকল্পনা হাতে নেন। সেই পরিকল্পনার অধীনে আবুল হাওলের মুখাবয়বকে এমনভাবে তিনি বিকৃত করে ফেলেন, যেন মুখের চিত্র আর দেখা না যায়।

যাই হোক প্রতিকৃতিটি ২৪০ ফুট দীর্ঘ এবং ৬৬ ফুট উঁচু। তার নাক মানবদেহের সমান। ঠোঁট ৭ ফুটের অধিক লম্বা। মুখমণ্ডল পুরুষাকৃতির। দেহের অবশিষ্টাংশ সিংহের দেহের মত। পুরা প্রতিকৃতিটি একটি মাত্র পাথরে তৈরী।

ঐতিহাসিক বর্ণনাসমূহ এ বিষয়ে একমত যে, পিরামিড এবং আবুল হাওল নির্মাণের জন্য সেই উসুয়ান অঞ্চল থেকে পাথর আনা হয়েছিল, বর্তমানে যেখানে উসুয়ান বন্দর নির্মাণ করা হয়েছে।

আবুল হাওলের ডান দিকে মাটির নীচে দূর্গ সদৃশ একটি প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ রয়েছে। যার সম্পর্কে বলা হয় যে, ফারাওদের রাজত্বকালে এগুলো শাহজাদীদের কক্ষরূপে ব্যবহৃত হত।

আমর বিন আস (রাযিঃ) জামে মসজিদ

পিরামিড দেখা শেষ করে আমরা শহরের মধ্যবর্তী এলাকার 'জামে আমর ইবনে আস'-এ পৌঁছি। শুধুমাত্র মিসরেই নয়, বরং পুরা আফ্রিকার এটি প্রাচীনতম মসজিদ। হযরত উমর ফারুক (রাযিঃ)এর খিলাফতের যুগে যখন হযরত আমর বিন আস (রাযিঃ) মিসর জয় করেন, তখন তিনি এখানে সর্বপ্রথম বড় একটি মসজিদের ভিত্তি স্থাপনের ইচ্ছা পোষণ করেন। সে সময় এ স্থানে আঙ্গুর ও অন্যান্য ফলফলাদীর বাগান ছিল। হযরত আমর ইবনে আস (রাযিঃ)এর নির্দেশে এর মাটি সমতল করা হয়। মসজিদের কেবলা নির্ধারণ করার কাজে ৮০ জন সাহাবী শামিল ছিলেন। যাঁদের মধ্যে হযরত যুবায়ের বিন আউয়াম (রাযিঃ), হযরত উবাদা বিন সামিত (রাযিঃ), হযরত আবুদ দারদা (রাযিঃ) এবং হযরত আবু যর গিফারী (রাযিঃ)এর সম্মানিত নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

হযরত আমর বিন আস (রাযিঃ) নিজেই মসজিদের সর্বপ্রথম ইমাম

ছিলেন। হযরত আবু মুসলিম ইয়াফেয়ী (রাযিঃ) নামক অপর একজন সাহাবী মুয়াজ্জিন ছিলেন।

পরবর্তীতে হযরত মুসলিমা বিন মুখাল্লাদ আনসারী (রাযিঃ) (যিনি হযরত মুয়াবিয়া (রাযিঃ)এর পক্ষ থেকে মিসরের গভর্নর নিযুক্ত হয়েছিলেন) মসজিদকে আরও বিস্তৃত করেন। তিনি এতে মিনারও স্থাপন করেন। বলা হয় যে, মিসরে মসজিদে মিনার নির্মাণের সূচনা তিনিই করেন। ৭৭ হিজরী সনে আবদুল আজীজ বিন মারওয়ান মসজিদটি পুনর্নির্মাণ করেন। আবদুল আজীজ বিন মারওয়ানের পর ওলীদ বিন আবদুল মালেকের নির্দেশে তা ভেঙ্গে দিয়ে পুনরায় নির্মাণ করা হয় এবং স্তম্ভসমূহকে স্বর্ণের পানি দ্বারা নিকেল করা হয়।

এই মসজিদটিতে সম্মানিত বুজুর্গানে দ্বীন, উলামায়ে কেরাম, আল্লাহর ওলী ও পরহেজগার ব্যক্তিগণ নামায আদায় করে এসেছেন। ইসলামের প্রথম যুগে বিচার বিভাগের কাজ এই মসজিদেই সম্পাদন করা হত। পরবর্তীতে এখানে বিরাট বড় শিক্ষা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়। আল্লামা ইবনে সায়েগ হানাফী (রহঃ) বলেন ঃ আমি সাতশত ঊনপঞ্চাশ হিজরীর পূর্বে এই মসজিদে চল্লিশোর্ধ্ব জ্ঞান বিতরণের সমাবেশ গণনা করেছি। কথিত আছে যে, রাত্রিবেলায় এখানে আঠারো হাজার প্রদীপ জ্বালানো হত। প্রত্যহ ১১ কিনতার তেল ব্যয় হত।

আল্লামা সুয়ূতি (রহঃ) 'হুসনুল মুহাযিরা' গ্রন্থে এই মসজিদটির সম্পূর্ণ ইতিহাস তুলে ধরেছেন। তা থেকে জানা যায় যে, মুসলিম সুলতান এবং আলেম-উলামাদের এ মসজিদের সঙ্গে বড় গভীর সম্পর্ক ছিল। কিছুদিন পূর্বে মসজিদটি খুব বেশী জরাজীর্ণ হয়ে যায়। বর্তমানে নতুনভাবে তা নির্মাণ করা হয়েছে এবং আরো অধিক প্রশস্ত করা হয়েছে। আজও তা কায়রোর শ্রেষ্ঠতম একটি মসজিদ। আমরা এই পবিত্র মসজিদেই আছর নামায আদায় করি। আছর নামাযান্তে প্রথম সারিতে অনেক লোককে তেলাওয়াতরত দেখতে পেলাম। কোথাও বা দু' একজন তালেবে ইলেমকেও দেখা গেল। কিন্তু মনের প্রতিক্রিয়া এই ছিল—(কবিতা)

"যখন সমাবেশের বিদায় ঘন্টা বেজেছে তখন এসে পৌঁছলাম।"

আমর বিন আস (রাযিঃ) জামে মসজিদ থেকে বের হয়ে হোটেলে ফিরে আসতে আসতে মাগরিবের সময় হয়ে যায়। কয়েক রাত্রি ধরে পূর্ণরূপে নিদ্রা হয়নি। তাই সেদিন এশার নামায পড়ে রাত্রির খাবার খেয়ে অতিসত্বর ঘুমিয়ে যাই।

পরের দিন বিকাল চারটা পর্যন্ত কায়রোতে অবস্থান করতে হবে। এই সময়কে কাজে লাগানোর জন্য কায়রোর বিভিন্ন কুতুবখানা পরিদর্শনের ইচ্ছা ছিল। তাই সকাল নয়টা থেকে শুরু করে বেলা দুটা পর্যন্ত বিভিন্ন কুতুবাখানায় ঘোরাফেরা করে প্রাপ্ত কিতাবসমূহের পর্যবেক্ষণ করি।

আলজেরিয়া ভ্রমণ

বিকাল পাঁচটায় আলজেরিয়া যাওয়ার উদ্দেশ্যে বিমান বন্দরে পৌছি। এখানে এসে জানতে পারলাম প্লেন ছাড়তে চার ঘন্টা বিলম্ব হবে। এ সময়টুকু বিমান বন্দরেই কাটাই। রাত্রি সাড়ে এগারোটায় আলজাযাইর এয়ারলাইন্সের প্লেনে আরোহণ করি। পথ চার ঘন্টার। তবে সময়ের এক ঘন্টা ব্যবধানের কারণে আলজেরিয়ার সময় অনুযায়ী রাত দেড়টায় আলজেরিয়ার 'হাওয়ারী বুমদিন' এয়ারপোর্টে প্লেন অবতরণ করে। স্বাগত জানানোর জন্য ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অফিসারগণ সেখানে উপস্থিত ছিলেন। রাত আড়াইটায় ফিন্দাক আস–সাফীরে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ি।

আলজেরিয়ার রাজধানীর নামও আলজেরিয়া। রাজধানী থেকে প্রায় ২৬০ কিলোমিটার দূরে এখানকার সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক নগরী বাজায়াতে কনফারেন্স চলছিল। তাই সকাল আটটায় হোটেল থেকে কারযোগে বাজায়ার পথে রওয়ানা হই। তিউনিসিয়ার প্রসিদ্ধ আলেম শায়েখ মুহাম্মদ আশশাযালী আন্নিফার এবং সৌদী আরবের ডঃ মুহাম্মদ ও এই গাড়ীতে আমাদের সফরসঙ্গী ছিলেন। রাজধানী আলজেরিয়া ত্যাগ করতেই ডান দিকে মধ্যম ধরনের উচ্চতাসম্পন্ন সবুজ শ্যামল পাহাড় এবং বামদিকে ভূমধ্য সাগরের নয়নাভিরাম দৃশ্য আরম্ভ হয়। এ সম্পূর্ণ সফর আফ্রিকার উত্তর পশ্চিম ধার দিয়ে হয়। বলা হয় যে, এটি উত্তর আফ্রিকার সর্বাধিক সুন্দর অঞ্চল। কল্পনার চক্ষু এ সকল সুদৃশ্য পাহাড় এবং সবুজ শ্যামল প্রান্তরে সে সকল খোদাপ্রেমী মুজাহিদদের পবিত্র

কাফেলা দেখছিল, যাঁরা ওকবা বিন নাফে (রাযিঃ)এর নেতৃত্বে হাজার হাজার মাইলের এই বন্ধুর পথ অতিক্রম করে এই ভূখণ্ডে আল্লাহর কালিমা বুলন্দ করেন এবং এই বর্বরী অঞ্চলকে তাঁরা শুধুমাত্র আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণীতে সমৃদ্ধই করেননি বরং তাদের ভাষা ও সভ্যতাও পাল্টে দিয়েছিলেন।

বাজায়া নগরীতে

বাজায়া নগরী আলজেরিয়ার রাজধানী (আল–যাজাঈর আল–আসিমা) থেকে ২৮৫ কিলোমিটার পশ্চিমে অবস্থিত। এটি মধ্যপাশ্চাত্যের একটি প্রাচীন ঐতিহাসিক নগরী। যা ভূমধ্য সাগরের পাড়ে এবং কোয়ারিয়া পর্বতের পাদদেশে অবস্থিত। কোয়ারিয়া পর্বত সমুদ্র পৃষ্ঠ হতে ৬০০ মিটার উঁচুতে অবস্থিত। পর্বতের ঢালু অংশ সমুদ্র উপকূল পর্যন্ত নেমে গিয়েছে। প্রাচীন নগরী বাজায়া তারই ঢালুভূমিতে অবস্থিত। সমুদ্র উপকূল থেকে কোয়ারিয়া পর্বতের দিকে তাকালে শহরের মধ্যবর্তী ভবনগুলোকে সিঁড়ির ধাপের মত পাহাড়ে উঠতে দেখা যায়।

ইবনে খালদুন (রহঃ) (যিনি দীর্ঘদিন এই শহরের মন্ত্রী ও বিচারপতি ছিলেন) লেখেন যে, বাজায়া এক বর্বরী গোত্রের নাম ছিল। তারা প্রাচীন যুগ থেকে এখানে বসবাস করত। তাদের নামেই এ অঞ্চলের নাম বাজায়া প্রসিদ্ধ হয়।

পঞ্চম হিজরী শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত এটি ছোট একটি বন্দরাঞ্চল ছিল। এর আশেপাশে সেই বর্বরী গোত্রের কিছু ঘরবাড়ী ছিল। এটি তেমন কোন উল্লেখযোগ্য শহর ছিল না। আনুমানিক ৪৫ হিজরীতে হাম্মাদী বংশের নাসের বিন আলমাছ কেন্দ্রের সাথে বিদ্রোহ ঘোষণা করে একে একটি শহরের রূপ দিয়ে তার রাজধানী বানিয়ে নেয়।

মনসূর হাম্মাদীর শাসনকালে (৪৮১ হিঃ—৪৯৮ হিঃ) বাজায়া একটি উন্নত নগরীর রূপ নেয়। মনসূর এখানে জাঁকজমকপূর্ণ একটি মহল তৈরী করেন। বিরাট বড় একটি জামে মসজিদও নির্মাণ করেন। ৬০ ফুট উঁচু ছিল তার মিনার। বারান্দা ছিল ১৭টি। তার যুগেই পানি সরবরাহ করার জন্য কোয়ারিয়া পর্বত থেকে শহর পর্যন্ত ঝুলন্ত সেতু নির্মাণ করা হয়,

যার মাধ্যমে পাহাড়ি ঝর্ণার পানি নগরী পর্যন্ত পৌছানো হত। একসময় এ নগরী মধ্য পাশ্চাত্যের বিরাট বড় ব্যবসা কেন্দ্র হয়ে যায়। এখানকার পাহাড়গুলোতে লোহার খনি ছিল। এজন্য এখান থেকে অনেক দূর পর্যন্ত লোহা রপ্তানি করা হত। সমুদ্রের সন্নিকটে হওয়ায় এবং পাহাড় ও সবুজ ভূমিতে পরিপূর্ণ হওয়ার কারণে এ নগরীকে দর্শনীয় স্থান মনে করা হত। উপযুক্ত মওসুম এবং স্বাস্থ্যকর জলবায়ু থাকায় দূর–দূরান্ত থেকে মানুষ এখানে এসে বসতি স্থাপন করতে থাকে। এখানে ইসলামী জ্ঞান–বিজ্ঞানের বড় বড় শিক্ষাকেন্দ্রও প্রতিষ্ঠিত হয় এবং বড় বড় আলেম উলামাও এখানে সৃষ্টি হয়।

ভূমধ্যসাগরের যেই পাড়ে বাজায়া নগরী অবস্থিত এর অপর পাড়ে ছড়িয়ে আছে স্পেন ভূমি। তাই স্পেনের মানুষ প্রাচ্যের দেশসমূহে ভ্রমণ করতে এলে বাজায়া হত তাদের গুরুত্বপূর্ণ মঞ্জিল। তারপর যখন স্পেনে নৈরাজ্যের যুগ শুরু হল, তখন রাজনৈতিক উত্থান পতন ও তার খারাপ প্রভাবের কারণে অসহ্য হয়ে বহু জ্ঞানী গুণীজন স্পেন থেকে হিজরত করে এসে বাজায়াকে তাদের বাসস্থান বানিয়ে নেন। পরবর্তীতে যখন মরোক্কের ইউসুফ বিন তাসফীন স্পেনে মুজাহিদদের শাসন প্রতিষ্ঠা করেন, তখন স্পেনের অনেক জ্ঞানী গুণীজনের উত্তর আফ্রিকার দেশগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ বৃদ্ধি পায়। এ সময়েও অনেক আলেম স্পেন থেকে বাজায়া এসে বসবাস শুরু করেন।

শেষ পর্যন্ত যখন স্পেনে মুসলমানদের পতাকা একেবারেই অবনমিত হয়, তখন গ্রানাডার পতনের পর মরক্কো ও আলজেরিয়াই মুসলমানদের আশ্রয়স্থল হয়। এই সময়েও বাজায়া স্পেনের মুজাহিদদের এক গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র সাব্যস্ত হয়।

বাজায়াতে সপ্তম হিজরী শতাব্দীতে যে সকল খ্যাতনামা উলামায়ে কেরাম অতিবাহিত হন, তাদের আলোচনা সম্বলিত একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ, আবুল আব্বাস গুবরিনী (মৃত ৪০৭ হিজরী) রচনা করেন। গ্রন্থটির নাম 'উনুয়ানুদ দিরায়া ফি মান উরিফা মিনাল উলামায়ি ফিলমিআতিছ সাবিআতি বি বাজায়া' গ্রন্থটি উস্তাদ রাবেহ বুনার এর টীকা সহকারে আলজেরিয়া থেকেই মুদ্রিত হয়েছে।

আমরা বাজায়াতে ফিনদাক আল হাম্মাদিয়্যীনে অবস্থান করি। হোটেলটি বাজায়া নগরী থেকে প্রায় ৫ মাইল দূরে ভূমধ্যসাগরের একদম পাড়ে অবস্থিত। বাজায়ার ছোট বন্দর যে উপকূলে অবস্থিত সেখান থেকে এই উপকূল দক্ষিণ পশ্চিম দিকে চন্দ্রাকৃতির একটি অর্ধবৃত্ত বানিয়ে চলে গেছে। তারপর দক্ষিণ দিকে মোড় নিয়ে সোজা সম্মুখে চলে গেছে। উপকূলের সাথে সাথে উপকূলীয় একটি সড়ক দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত চলে গেছে। তার পশ্চিমে সবুজ শ্যামল পর্বত সারি। পূর্বে তরঙ্গ বিমুগ্ধ ভূমধ্যসাগর প্রবাহিত। ফিন্দাক আল–হাম্মাদিয়্যীন এই উপকূলীয় সড়কে অবস্থিত। এর কক্ষের জানালাগুলি সমুদ্রের দিকে উন্মুক্ত এবং কক্ষের ভিতরের পরিবেশ তরঙ্গমালার মনোরম গুঞ্জনে সর্বদা মুখরিত থাকে।

আমি আমার কক্ষে পৌছে পূর্বের দরজা দিয়ে ঢুকে সম্মুখের ছোট বারান্দাটিতে দাঁড়ালাম। রোম উপসাগরের নয়নাভিরাম দৃশ্য আমার সম্মুখে। দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত রোম উপসাগরের নীলাভ তরঙ্গমালা আছড়ে পড়ছে। স্মরণ হল, এখান থেকে সম্মুখে এসব তরঙ্গমালার ওপারে স্পেনের উপকূল অঞ্চল ছড়িয়ে আছে। এই সাগর বহু শতাব্দী ধরে স্পেনের মুসলমানদেরকে প্রাচ্যের দেশসমূহের সঙ্গে মিলিত করার কর্তব্য পালন করছে। এখানেই বহু বছর ধরে সে সব বিজয়ী মুজাহিদদের দোর্দণ্ডপ্রতাপ প্রতিষ্ঠিত ছিল, যাদের তাকবীর ধ্বনিতে এখানকার আকাশের সকল অণু পরমাণু সমৃদ্ধ হয়। একথা কল্পনা করতে করতে মরহুম ইকবালের এই কবিতাগুচ্ছ স্মরণ হল ঃ

تھا یہاں ہنگامہ ان صحرا نشینوں کا کبھی
بحر بازی گاہ تھا جن کے سفینوں کا کبھی
زلزلے جن سے شہنشاہوں کے درباروں میں تھے
بجلیوں کے آشیانے جن کی تلواروں میں تھے
زمزموں سے جس کے لذت گیر اب تک گوش ہے
کیا وہ تکبیر اب ہمیشہ کے لیے خاموش ہے

"একদা এখানে সেই মরুবাসীদের কোলাহল বিরাজ করত।
সাগর যাদের জাহাজের খেলার মাঠ ছিল,
যাদের ভয়ে শাহানশাহদের রাজদরবার প্রকম্পিত হত,
যাদের তরবারীতে বিদ্যুতের বাসা ছিল,
যার অবারিত সুর মূর্ছনায়
আজও কর্ণ বিমোহিত,
সেই তাকবীর ধ্বনি কি
চিরদিনের তরে নীরব হয়ে গেল?"

কনফারেন্স

কনফারেন্সে আমন্ত্রিত ব্যক্তিদের অবস্থান যদিও ফিন্দাক আল হাম্মাদিয়্যীনে ছিল, তবুও কনফারেন্স চলছিল এখান থেকে প্রায় ছয় মাইল দূরে বাজায়া নগরীর টাউন হলে। এই কনফারেন্স আলজেরিয়ার ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পরিচালনাধীনে প্রতি বছর অনুষ্ঠিত হয়। এর পৃথক নাম 'মুলতাকাল ফিকহিল ইসলামী' এ বছর সম্মেলনের আলোচ্য বিষয় ছিল 'আল ইসলাম ওয়াল গাযউস সাকাফী' অর্থাৎ ইসলাম ও সভ্যতার লড়াই।

এই বিষয়ের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে মতামত প্রকাশের জন্য আলমে ইসলামের খ্যাতনামা জ্ঞানী ও চিন্তাবিদগণকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। একাধারে আট দিন কনফারেন্স চলতে থাকে। শ্রোতাদের মধ্যে ইউনিভার্সিটি এবং কলেজের ছাত্রদেরকে বিশেষভাবে আমন্ত্রণ করা হয়। প্রত্যেক প্রবন্ধ পাঠের পর ছাত্ররা সে প্রবন্ধ সম্পর্কে বিভিন্ন প্রশ্ন করে থাকে এবং প্রবন্ধকার তার উত্তর দিয়ে থাকেন। অধম এ কনফারেন্সের জন্য 'শিক্ষা পদ্ধতির মাধ্যমে সভ্যতার লড়াই' শিরোনামে একটি প্রবন্ধ লিখেছিল, কিন্তু আমার প্রবন্ধ পাঠের সময় এলে কয়েকটি কারণে প্রবন্ধ পাঠ করার পরিবর্তে উপস্থিত বক্তৃতা প্রদানকে উপযুক্ত মনে করি।

প্রথমতঃ সময়ের স্বল্পতার কারণে পূর্ণ প্রবন্ধ পেশ করার সময় ছিল না। প্রত্যেক প্রবন্ধকারকে খুব বেশী দশ মিনিট সময় দেয়া হচ্ছিল। যে কারণে স্বল্প সময়ে এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়বস্তুর সকল দিককে আয়ত্ব করা

আমার জন্য সম্ভবপর ছিল না।

দ্বিতীয়তঃ প্রতিটি প্রবন্ধই মুদ্রণ করে উপস্থিত ব্যক্তিদের মাঝে কর্তৃপক্ষ বিতরণ করছিল। যেহেতু প্রবন্ধের মাধ্যমে যে কথা আমি বলতে চাচ্ছিলাম তা মুদ্রিত হয়ে সকলের হাতে পৌঁছবেই। সেহেতু নতুন প্রয়োজনীয় কিছু বলার ইচ্ছা হলো।

তৃতীয়তঃ আমি লক্ষ্য করলাম যে, উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ পাকিস্তানের অবস্থা সম্পর্কে জানার জন্য খুব বেশী আগ্রহী। তাছাড়া বিভিন্ন বৈঠকের মধ্যবর্তী সময়ের আলোচনা দ্বারা অধম অনুভব করে যে, শুধুমাত্র আলজেরিয়ার লোকই নয়, বরং অন্যান্য দেশের প্রতিনিধিগণও পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপট এবং সেখানে শরীয়তের অনুশাসন চালু করার প্রচেষ্টা সম্পর্কে খুব কম অবগত এবং তারা সামান্য সামান্য বিষয়কেও অত্যন্ত বিস্ময় ও উৎসুক্য নিয়ে শ্রবণ করছেন। এতদ্ব্যতীত প্রত্যেক বৈঠকের পর ছাত্ররা আমার সঙ্গে সাক্ষাত করে পাকিস্তানের বিভিন্ন অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে থাকে। কোন কোন ছাত্র তো স্পষ্ট বলেই ফেললো যে, আপনার বক্তৃতা পাকিস্তান সম্পর্কে হলে বেশী ভাল হবে। এর একটি উপকারিতা এও ছিল যে, আলজেরিয়াতে শরঈ ব্যবস্থা বাস্তবায়নের জন্য একটি নীরব আন্দোলন কাজ করে যাচ্ছে এবং সেখানে আজও সেসব সমস্যা আলোচ্য বস্তু হয়ে আছে, যেগুলো আল্লাহর অনুগ্রহে পাকিস্তানে আমরা পেরিয়ে এসেছি। যেমন ঃ বর্তমান সমাজে মাদকদ্রব্য বন্ধ করা সম্ভব কিনা এবং তা যথার্থ হবে কিনা? আলজেরিয়াতে এখনও পর্যন্ত ফ্রান্সের সাম্রাজ্যবাদের প্রভাব রয়েছে, দুঃখের বিষয় এই যে, স্বাধীনতা অর্জনের পর এখানে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ইসলামকে বাস্তবায়ন করার দিকে মনোযোগ দেওয়ার তুলনায় সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দিকে অধিক মনোযোগ আরোপ করা হয়েছে। বর্তমানে ক্রমান্বয়ে অবস্থার কিছুটা উন্নতি ঘটছে। কিন্তু অতীতের প্রভাব এত বেশী যে, বড় বড় শহরগুলোতে পায়ে পায়ে শরাবখানা বিদ্যমান, যেগুলোতে খোলাখুলিভাবে মদপান চলে। এমন পরিবেশে সকল অপরাধের মূল শরাবপানের বিরুদ্ধে কোথাও আওয়াজ উঠলেও তা অসম্ভব বলে মনে করা হয়।

এমনিভাবে এখনও পর্যন্ত সেখানে এ জাতীয় বিষয়ও আলোচনাধীন

রয়েছে যে, বর্তমান যুগে শরীয়তের বিচার ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করা সম্ভব বা যথার্থ হবে কিনা? তবে আনন্দের বিষয় এই যে, যুবকদের মাঝে অসাধারণ ধর্মীয় চেতনা জাগ্রত হচ্ছে। তারা অনেক প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও ধর্মহীনতার স্রোতকে দৃঢ়ভাবে মোকাবেলা করছে। এ সকল দিক বিবেচনা করে পাকিস্তানে শরীয়তের আইন বাস্তবায়নের বিষয়ে অল্পবিস্তর যা কিছু অগ্রগতি হয়েছে, তা আমাদের দৃষ্টিতে সামান্য হলেও আলজেরিয়ার অবস্থার প্রেক্ষিতে তা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। তাই আমি অনুভব করলাম যে, এই পরিবেশে পাকিস্তানের বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোচনা ইনশাআল্লাহ অধিক উপকারী এবং সাহস বৃদ্ধিরও কারণ হবে। যা এখানকার ধার্মিক মহলের হাত দৃঢ় করবে।

সুতরাং অধম তার বক্তৃতায় সংক্ষেপে উপমহাদেশে বৃটিশ সাম্রাজ্যের ইতিহাস, তার প্রভাবের বিপক্ষে দ্বীন সংরক্ষণের জন্য উলামায়ে কেরামের ভূমিকা, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপট এবং তা প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যসমূহ বর্ণনা করি। তারপর এখানে শরীয়ত বাস্তবায়নের প্রবক্তাদের ও ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদীদের মাঝে যে সংঘর্ষ চলছে সে অবস্থা তুলে ধরি। তারপর ১৯৭৭ খৃষ্টাব্দের পর থেকে দেশে শরীয়ত প্রতিষ্ঠার ধারায় যে সকল কাজ হয়েছে তার বিশদ আলোচনা করি।

এ সকল অবস্থা শ্রবণ করে উপস্থিত সুধীমণ্ডলী বিশেষতঃ ছাত্রদের মধ্যে যে আনন্দ ও উত্তেজনা সৃষ্টি হয়, তা উপভোগ্য ছিল। কথায় কথায় তারা ধন্যবাদ ও মোবারকবাদ পেশ করছিল। এমনকি যখন আমি পাকিস্তানে শরাব নিষিদ্ধ হওয়ার এবং পিআইএর-এর প্লেনগুলোতে শরাব নিষিদ্ধ হওয়ার আলোচনায় একথা বলি যে, এই নিষেধাজ্ঞার পূর্বে আমাদেরকে কোন কোন মহলের পক্ষ থেকে ভয় প্রদর্শন করা হয়েছে যে, এরূপ আইনের ফলে দেশের বিরাট অংকের আয় কমে যাবে। এয়ারলাইন্স ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত হবে, কিন্তু যখন আল্লাহ তাআলার উপর ভরসা করে এই পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়, তখন এ সকল অভিযোগ হাওয়ায় উড়ে যায়। আল্লাহর শুকরিয়া এয়ারলাইন্সের ক্ষতির পরিবর্তে পূর্বের তুলনায় অধিক লাভ হয়। এ কথা শুনে ছাত্ররা আনন্দের আতিশয্যে তাদের আসন থেকে দাঁড়িয়ে যায় এবং দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত

শ্লোগানের আওয়াজে সম্মেলন কক্ষ মুখরিত থাকে।

বক্তৃতা শেষ হওয়ার পর কনফারেন্সের আমন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গ এবং ছাত্ররা খুব উৎসাহ নিয়ে আমার সঙ্গে দেখা করতে থাকে, তারা এখন পর্যন্ত পাকিস্তানের অবস্থা সম্পর্কে অবগত হতে না পারায় অনুশোচনা প্রকাশ করতে থাকে। যদিও অধম তার বক্তৃতাতে একথাও বলেছিল যে, আমরা স্বীকার করি যে, আমরা এ দীর্ঘ সময়ে শরীয়ত প্রতিষ্ঠার দিকে যতটুকু পথ অতিক্রম করেছি, অবশিষ্ট পথের তুলনায় তা অতি অল্প এবং এখনও অনেক কিছু করণীয় রয়েছে, কিন্তু তাদের দৃষ্টিতে এ অল্প পথ চলাও অনেক আশাব্যঞ্জক ছিল। অনেক লোক দু'আ দিচ্ছিল যে, 'আল্লাহ তাআলা পাকিস্তানকে সকল শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করেন এবং শরীয়ত প্রতিষ্ঠার পথে তাকে আলমে ইসলামের পথ প্রদর্শনের দায়িত্ব পালনের তাওফীক দান করেন।' আমীন।

আমি ভাবছিলাম যে, ইসলামের নামে এই সামান্য পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে আলমে ইসলামের মুসলমানদের অন্তরে পাকিস্তানের প্রতি ভালবাসার যে অবস্থা বিরাজ করছে, আর যদি আমরা প্রকৃতপক্ষেই আমাদের জীবন ব্যবস্থাকে ইসলামী অবকাঠামোতে পরিপূর্ণরূপে ঢেলে সাজাই, তাহলে পাকিস্তানের সঙ্গে সেসব মুসলমানের ভালবাসার কেমন সম্পর্কই না হবে!

এই সমাবেশে ছাত্ররা ছাড়াও ছাত্রীদেরও আগমন হয়েছিল। তাদের জন্য পৃথক স্থান নির্ধারিত ছিল। সকল ছাত্রীই পর্দা সহকারে সম্মেলনে আসে। তাদের পূর্ণ দেহ এক ঢিলা আবরণীতে আবৃত ছিল। মাথা ও গলার উপর ওড়না পেঁচানো ছিল, যা সাধারণতঃ মাথা থেকে সামনের দিকে অনেক ঝুলানো ছিল। তাদের মাথার একটি চুলও দেখা যাচ্ছিল না। তবে মুখমণ্ডলে নেকাব ছিল না। এভাবে শরঈ পর্দা তো পরিপূর্ণ পালন হয় না, কিন্তু আলজেরিয়া যে সকল প্রতিকূল অবস্থা ডিঙিয়ে এসেছে এমতাবস্থায় আধুনিক শিক্ষাকেন্দ্রের ছাত্রীদের এতটুকু গুরুত্ব দেওয়াও অনেক মূল্যবান।

অধমের বক্তৃতার পর এক বৈঠকে জনৈকা ছাত্রী আমার নিকট একটি চিরকুট পাঠিয়ে দেয়। চিরকুটে সে পাকিস্তানের সঙ্গে তার ভালবাসা এবং

পাকিস্তানের অবস্থা সম্পর্কে অবগত হওয়ার কারণে তার আনন্দ প্রকাশ করেছিল এবং আফগানিস্তানের জিহাদ সংক্রান্ত বিষয়ে কয়েকটি প্রশ্ন করেছিল। ছাত্রীটি লিখেছিল, "আমাদের অনেক ভাইবোন এই জিহাদে কার্যত অংশগ্রহণে ইচ্ছুক। এর সম্ভাব্য পথ কি? তাছাড়া আমাদের মধ্য থেকে কিছু ভাইবোন আফগানিস্তানের মুজাহিদদের জন্য কিছু অর্থ সংগ্রহ করেছে। তা সেখানে পাঠিয়ে দেয়ার কোন পথ আমাদের নিকট নেই। এর জন্য কোন পথ বলে দিন। এতদ্ব্যতীত মুজাহিদদের সঙ্গে সমবেদনা ও ভ্রাতৃত্ব প্রকাশের অন্য কোন পথ আমাদের নিকট না থাকায়, আমরা তাঁদের বীরত্বের স্তুতি সম্বলিত কিছু সংগীত তৈরী করেছি। সেগুলো ছোট বাচ্চাদের দ্বারা পড়িয়ে তার ক্যাসেট তৈরী করেছি। সেগুলো আমরা আমাদের মুজাহিদ ভাইদের নিকট পাঠাতে চাই। যেন তাঁরা বুঝতেপারে যে, তাঁদের দ্বীনী ভাইবোন হাজার হাজার মাইল দূরে অবস্থান করেও তাঁদের জন্য দু'আ করছে। এ সকল ক্যাসেট সেখানে পৌঁছানোর সম্ভাব্য পথ কি? পরিশেষে আমরা শুনেছি যে, আফগানিস্তানের রণাঙ্গনে যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে অনেক অলৌকিক ঘটনাও প্রকাশ পাচ্ছে, তার কিছু ঘটনা আমাদের শোনান।"

ছাত্রদের এই নির্মল আবেগ দেখে মন খুব প্রভাবিত হল এবং লিখিতভাবে তাদের সেসব প্রশ্নের উত্তর দিলাম। তার মধ্যে তাদেরকে সাহস দানসহ কিছু দ্বীনী উপদেশও ছিল। এতদসত্ত্বেও আমার ধারণা ছিল যে, হয়ত বা এগুলো তরুণ ছাত্রদের সাময়িক আবেগ মাত্র। কিন্তু পাকিস্তান আসার পর জানতে পারি যে, এটা শুধু সাময়িক আবেগই ছিল না, সে সকল ছাত্র আমার বাতলানো পদ্ধতিতে মুজাহিদদের সাহায্য সহযোগিতার সকল সম্ভাব্য পথ চালু রেখেছে।

প্রাচীন নগরী বাজায়াতে

কনাফারেন্সের কার্যক্রম এমন বিরতিহীনভাবে চলছিল যে, বাজায়া নগরীর ভিতরে যাওয়ারও সুযোগ হচ্ছিল না। আমার এখানকার ঐতিহাসিক স্থানসমূহ দেখার খুব আগ্রহ ছিল। তাই একদিন বিকেলের অধিবেশনে উপস্থিতি পিছিয়ে দিয়ে আলজেরিয়ান এক বন্ধুর সঙ্গে

শহরের প্রাচীন এলাকা ভ্রমণের প্রোগ্রাম করি। সমুদ্রের তীরেই শহরটি অবস্থিত। তার ভবনগুলো সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে পর্বতপৃষ্ঠ পর্যন্ত ক্রমান্বয়ে উপরে উঠে গেছে। অধিকাংশ সড়কই ঢালু এবং কোন কোন স্থানে এত খাড়াভাবে উপরে উঠেছে যে, পথিকদের উপরে উঠতে সাহায্যের জন্য সড়কের পাশে পাইপ লাগানো আছে। আমরা সর্বপ্রথম বাজায়ার প্রাচীন দুর্গের ফটকে পৌঁছি। দুর্গটির নাম 'আল কসবা'। তার প্রধান ফটকের সঙ্গে একটি ফলক লাগানো রয়েছে। তাতে লেখা আছে ঃ

"কসবা দূর্গ, যেটি মুয়াহ্হিদীন সম্প্রদায়ের রাজ বংশ ১১৪৫ খৃষ্টাব্দ থেকে ১১৬০ খৃষ্টাব্দের (সপ্তম হিজরী শতাব্দী) মাঝামাঝি সময়ে নির্মাণ করে।

দুর্গের ভিতরে একটি মসজিদ আছে। এক সময় এটি বিরাট এক শিক্ষাকেন্দ্র ছিল, তাতে বড় বড় আলেম পাঠ দান করতেন। আল্লামা ইবনে খালদুনও তাদের অন্তর্ভুক্ত।"

দুর্গের ভিতর প্রবেশ করে জীর্ণ শীর্ণ ভগ্ন একটি ভবন দেখতে পেলাম, ভবনটি প্রাচীন নির্মাণ পদ্ধতিতে নির্মিত। দুর্গের অধিকাংশ স্থান ধসে গেছে। কয়েকটি মাত্র ভবন ঠিক আছে। সেগুলোও ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে বলে মনে হয়। যৎসামান্য নিদর্শন যা এখনও রয়েছে তার মধ্যে কয়েকটি বালাখানা, প্রশস্ত একটি দালান, তাতে বাথরুমের কয়েকটি কক্ষ, একটি কূপ এবং দুর্গের প্রাচীর রয়েছে। সেখান থেকে সমুদ্র উপকূলের দৃশ্যসমূহ দেখা যায়।

দুর্গের মাঝামাঝি যে ভবনটি তার প্রাচীন ভিত্তি প্রস্তরে দাঁড়িয়ে আছে, তা দুর্গের সেই মসজিদ, যার কথা উপরোক্ত ফলকে উল্লেখ করা হয়েছে। মসজিদের হল অনেক চওড়া। বলা হয় যে, আল্লামা ইবনে খালদুনের সময় হতে এই ভবনে কোন পরিবর্তন করা হয়নি। মসজিদের ভিতরের স্তম্ভও সে যুগেরই। এমনকি ভবনটি এত বেশী বিপদজনক যে, পরিদর্শক ও পর্যটকদের জন্যও তা খোলা সম্ভব হয় না। ঘটনাচক্রে এক প্রত্নতাত্ত্বিক অফিসার আমার আলজেরিয়ান বন্ধু সেলিম সাহেবকে পেয়ে যাই। তিনি মসজিদটি বিশেষভাবে খোলার ব্যবস্থা করেন।

এই বিরাট মসজিদ আজ বিরান পড়ে আছে। তার স্তম্ভগুলো ছাদের

বোঝা কষ্ট করে ধরে রেখেছে। কিন্তু তার দরজা ও প্রাচীর অতীতকালের অস্পষ্ট নিদর্শন ও বিগতদিনের শান-শওকতের উপাখ্যান শোনাচ্ছিল। এই মসজিদ ইবনে খালদুনের মত যুগের পুরোধাকে এখানে আল্লাহর দরবারে সিজদাবনত দেখেছে এবং ইসলামের ইতিহাসের সেই মহান চিন্তানায়কের বক্তব্য শুনেছে, যাঁর মত ক্ষণজন্মা ব্যক্তিত্ব বহু শতাব্দী পর কদাচিৎ জন্মগ্রহণ করে থাকেন। ইবনে খালদুন (রহঃ) বাজায়াতে মন্ত্রী, কাজী, খতীব এবং ওস্তাদ, এসব পদকেই অলংকৃত করেন।

জামে মসজিদ এবং বাবুল বানুদ

কসবার দূর্গ থেকে বের হয়ে আমরা অনেক উপরে আরোহণ করে শহরের মাঝামাঝি অংশে এখানকার জামে মসজিদে পৌছি। এটি শহরের প্রাচীনতম জামে মসজিদ। অনেক পূর্বসূরী উলামায়ে কেরাম এখানে নামায আদায় করেছেন, খুৎবা দিয়েছেন এবং পাঠদান করেছেন। শায়েখ মুহিউদ্দীন ইবনে আরাবী (রহঃ), আল্লামা আবদুল হক আসবীলী (রহঃ), ('আল আহকাম' প্রণেতা), আল্লামা ইবনে সায়্যিদুন নাস (রহঃ) (তিরমিযীর ভাষ্যকার ও উয়ুনুল আছার গ্রন্থের রচয়িতা, মৃত ৬৫৯ হিজরী) হাফেয ইবনুল আব্বার আল কুজায়ী (রহঃ) (মাসনাদুস সিহাব ও আত্ তাকমিলালিছ ছিলা প্রণেতা, মৃত ৬৫০ হিজরী)ও আল্লামা আবু বকর ইবনে মুহরীয (রহঃ) (মৃত ৬৫৫ হিজরী) প্রমুখ মহান ব্যক্তিত্ব এর অন্যতম।

আলহামদুলিল্লাহ আজও মসজিদটি আবাদ রয়েছে। মসজিদ প্রাঙ্গণের উভয় দিকে নির্মিত কক্ষগুলো প্রাচীনকাল থেকে একইভাবে বিদ্যমান আছে। এগুলো উলামায়ে কেরামের পাঠদান কক্ষ ও ছাত্রাবাস ছিল। অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার ধারা আজও এখানে চালু রয়েছে, তবে সরকারী ফাণ্ড ও তার ব্যবস্থাপনার অধীনে।

মসজিদের পাশ দিয়েই একটি সিঁড়ি পাহাড়ের উপর থেকে পাদদেশের একটি সড়কে নেমে এসেছে। সড়কটি নগর রক্ষা প্রাচীর পর্যন্ত গিয়ে শেষ হয়েছে। প্রাচীনকাল থেকেই এই প্রাচীরের একটি ফটক এখানে রয়েছে। একে বাবুল বনুদ বলা হয়। ফটকের উপরের সুদৃশ্য চূড়া এখনও বহাল

রয়েছে। ফটকের বহিঃপ্রাচীরে লেখা রয়েছে ঃ

"এটি বাবুল বানুদ আল ফাওকা, যাকে নগরীর সদর দরজা মনে করা হয়। এর উপর সুদৃশ্য একটি ভবন রয়েছে, যার মধ্যে সুলতান হাম্মাদীর সেই বৈঠক ঘরও রয়েছে, যেখানে বসে তিনি বিভিন্ন সমাবেশের ব্যবস্থাপনার নিগরানী করতেন এবং আগত কাফেলাকে স্বাগত জানাতেন।"

আল্লামা আবদুল হক আশবীলী (রহঃ)এর মাজার

অধমের এতটুকু তো জানা ছিল যে, বাজায়াতে খ্যাতনামা মুহাদ্দিস আল্লামা আবদুল হক আশবীলী (রহঃ)এর মাজার রয়েছে। ইলমে হাদীসের ছাত্র শিক্ষকদের জন্য আল্লামা আবদুল হক আসবীলী (রহঃ)এর পরিচয় দানের প্রয়োজন নেই। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ আল আহকামের উদ্ধৃতি হাদীসের ভাষ্যগ্রন্থসমূহে প্রায়ই পাওয়া যায়। বিশেষ করে হাফেজ যাইলায়ী (রহঃ) স্বীয় কিতাব 'নসবুর রায়া'তে তার খুব বেশী উদ্ধৃতি দিয়ে থাকেন। আল্লামা ইবনুল কাত্তান (রহঃ)এর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'আল ওয়াহমু ওয়াল ঈহামু' তার কিতাবেরই সমালোচনা গ্রন্থ। তার এই কিতাব আজও মুদ্রিত হয়নি। কিন্তু পীর ঝাণ্ডু এর কুতুবখানাতে অধম এর হস্তলেখা কপি দেখেছে। যাই হোক, তিনি একজন অত্যন্ত উচ্চস্তরের মুহাদ্দিস এবং ফকীহ ছিলেন। বাজায়া আসার পর তার মাজারে উপস্থিত হওয়ার খুব আগ্রহ ছিল। কিন্তু উপযুক্ত কোন পথ প্রদর্শক পাওয়া যাচ্ছিল না।

এখন অধমের পথপ্রদর্শক সেলিম কালাল সাহেব। তিনি নিজে বাজায়ার বাসিন্দা না হওয়ার কারণে মাজার সম্পর্কে অবগত ছিলেন না। পরিশেষে আমরা জিজ্ঞাসাবাদ করে করে সেখানে পৌছে যাই। বাবুল বানুদ এক সময় নগরীর শেষ প্রান্ত ছিল। কিন্তু বর্তমানে নগরী এর অনেক সম্মুখে চলে গিয়েছে। বাবুল বানুদ থেকে বের হয়ে অনেক দূর যাওয়ার পর জনবহুল একটি পথের ধারে ছোট একটি মসজিদ আছে। এ মসজিদের অভ্যন্তরে আল্লামা আবদুল হক (রহঃ) এর মাজার। ঠিক মাজার নয়, ছোট একটি প্রাচীরে ঘেরা স্থান, যার মধ্যে কবরের উঁচু চিহ্নও নেই। এখানেই সেই মহান মুহাদ্দিস বিশ্রাম করছেন।

আল্লামা আবদুল হক আশবীলী (রহঃ) ৫১০ হিজরীতে স্পেনের প্রসিদ্ধ শহর আশবীলীয়াতে জন্মগ্রহণ করেন। জীবনের প্রথম অংশ স্পেনে অতিবাহিত করেন। কিন্তু পরবর্তীতে সেখানকার রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার কারণে হিজরত করে বাজায়া চলে আসেন এবং এখানেই বসবাস শুরু করেন। তাই কখনও তাঁকে আবদুল হক আল বাজায়ীও বলা হয়। হাফেজ যাহাবী (রহঃ)এর মত লোক চেনায় বিচক্ষণ বুযুর্গ ব্যক্তি তাঁর সম্পর্কে ইবনে আব্বার (রহঃ)এর উদ্ধৃতিতে লেখেন—

"তিনি ফকীহ এবং হাফেজে হাদীস। হাদীস ও উলূমে হাদীসের পণ্ডিত। রিজালে হাদীস সম্পর্কে সম্যক অবগত। তাকওয়া, নেক আমল, সঠিক সিদ্ধান্ত, সুন্নাতের অনুসরণ এবং দুনিয়া বিরাগের গুণের অধিকারী ছিলেন।"

বাজায়ায় অবস্থানকালে তিনি জামে মসজিদের খতীব ছিলেন, অধ্যাপক ছিলেন, কিছুদিন বিচারপতির পদেও অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁর জীবন ছিল নিয়মানুবর্তিতার অধীন। আল্লামা ইবনে উমাইরাহ জাব্বী (রহঃ) লেখেন—

"তিনি জামে মসজিদে ফজর নামায আদায় করার পর সেখানেই বসে চাশতের সময় পর্যন্ত ছাত্রদেরকে পাঠ দান করতেন। তারপর চাশতের আট রাকাত নামায আদায় করতেন এবং বাড়িতে গিয়ে জোহর পর্যন্ত রচনা ও সংকলনের কাজে লিপ্ত থাকতেন। যোহর নামাযের পর আদালতের কাজ সম্পাদন করতেন। কখনও সে সময় পাঠদানও করতেন। আছরের পর বিভিন্ন লোকের প্রয়োজন পুরা করতেন এবং মানব সেবার উদ্দেশ্যে বাড়ী থেকে বের হতেন।"

এই ছিল তাঁর প্রতিদিনের কর্মসূচী। তার রাত্রির কাজ সম্পর্কে আল্লামা আবুল আব্বাস গুবরীনী (রহঃ) লেখেন—

"তিনি তার রাতকে তিনভাগে ভাগ করতেন। এক-তৃতীয়াংশ অধ্যয়ন কাজে, এক-তৃতীয়াংশ এবাদতের কাজে এবং বাকী অংশ ঘুমে অতিবাহিত করতেন।

পরিবারের সদস্যদের জন্য অতীব স্নেহপরায়ণ, করুণাময় এবং খোশ প্রকৃতির ছিলেন। অনেক সময় ফকীহগণের সঙ্গে বৈঠক করতেন।

গৃহাভ্যন্তর থেকে কোন দাসী এসে টাকা চাইলে সামান্য জিনিসের জন্যও প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশী টাকা দিয়ে দিতেন। একবার উপস্থিত লোকদের একজন বললেন, যত টাকা আপনি দিলেন, তা যে পরিমাণ চেয়েছে তা থেকে অনেক বেশী। উত্তরে তিনি বললেন ঃ

"আমি আমার গৃহবাসীর জন্য তিন 'শীন' একত্র করি না। আমি তাদের শায়েখ এবং আশবীলী তো বটে। যে কারণে আমার মধ্যে দুই 'শীন' বিদ্যমান। তাই শাহীহ 'কৃপণ' হতে চাই না।"

দুঃখের বিষয় তার রচনাবলী মুদ্রিত হয়নি। অন্যথা 'আল আহকাম' গ্রন্থ ছাড়াও তার জীবনালোচনা থেকে জানা যায় যে, তিনি 'আল হাভী' নামে ১৮ ভলিউমের একটি অভিধান গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এতদ্ব্যতীত 'আল জামিয়ুল কাবীর' নামে সিহাহ সিত্তার সমষ্টি গ্রন্থ রচনা করেন এবং 'আল আকেবাত' নামে আখিরাত বিষয়ে একটি গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করেন। তাছাড়াও 'কিতাবুত তাহাজ্জুদ', 'কিতাবুর রিকাক' এবং ইখতিছারুর রশাতী' গ্রন্থকেও তাঁর রচনাবলীর মধ্যে গণ্য করা হয়েছে।

এ বিষয়টি তাঁর সকল জীবনীকারই উল্লেখ করেছেন যে, আল্লামা আবদুল হক আশবীলী (রহঃ)এর মৃত্যু তৎকালীন শাসকের জুলুম অত্যাচারের ফলে হয়েছে। কিন্তু এ ঘটনার বিস্তারিত আলোচনা কেউ করেননি। তাঁর মাজারে বয়োবৃদ্ধ একজন খাদেম ছিল। তিনি বলেন যে, আমাদের বাপদাদাদের থেকে এ ঘটনা প্রসিদ্ধ চলে আসছে যে, আবদুল হক আশবীলী (রহঃ)এর বাজায়ার শাসকদের সঙ্গে কোন এক মাসআলার ব্যাপারে চরম মতবিরোধ হয়। যার ফলে সে তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দেয়। তাঁকে পূর্বোল্লেখিত সেই বাবুল বানুদের উপরেই শূলি দেওয়া হয়। পরে তাঁর লাশ তিন দিন পর্যন্ত সেই ফটকের বাহিরাংশে ঝুলন্ত অবস্থায় থাকে।

সে সময় বাবুল বানুদ শহরের শেষ প্রান্তে ছিল, সূর্যাস্তের পর এ ফটক বন্ধ করে দেওয়া হত। ফটক বন্ধ করার পূর্বে চৌকিদার উচ্চস্বরে আওয়াজ দিয়ে বলত যে, শহরের কোন ব্যক্তি ফটকের বাইরে থাকলে ভিতরে এসে যাও, ফটক বন্ধ করা হচ্ছে।

উপরোক্ত মাজারের লোকটি বলেন যে, যেদিন আল্লামা আবদুল হক (রহঃ)কে শূলীতে চড়ানো হয়, সেদিন সন্ধ্যায় চৌকিদার নিয়মমাফিক

আওয়াজ লাগালে জঙ্গলের দিক থেকে আওয়াজ আসে যে, থামো! এখনও আবদুল হক শহরের বাইরে আছে। চৌকিদার এ আওয়াজকে তার বিভ্রান্তি মনে করল। সে দ্বিতীয়বার আওয়াজ দিলে উত্তরে পুনরায় সে উপরোক্ত আওয়াজ শুনতে পেল। ঘটনাটি এভাবে তিনবার ঘটে। মহান আল্লাহ সর্বজ্ঞ। মাজারের সেই লোকটি একথাও বলেন যে, আল্লামা আবদুল হক (রহঃ)এর মৃত্যুর পর বাজায়ার শিশুদের মুখে মুখে এ বাক্য ছিল ঃ

الشيخ عبد الحق، قتل بغير حق

وه شيخ جوحق كابنده تها، حق كے بغير قتل هوا

"শায়েখ আবদুল হক নাহক ভাবে নিহত হয়েছেন।"

পরবর্তীতে এ কথাটি এ অঞ্চলের প্রবাদে পরিণত হয়ে যায়।

আলহামদুলিল্লাহ শায়েখ এর মাজারে সালাম জানানোর এবং ফাতেহা পাঠের তাওফীক হলো। ভাবছিলাম আল্লাহর এই মনোনীত বান্দা জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত হকের দাওয়াত, দ্বীনের খিদমত এবং মাখলুকের সেবায় ব্যয় করেন এবং সত্যের খাতিরে মাজলুমের হৃদয় বিদারক মৃত্যুকে বক্ষে ধারণ করে চির অমর হয়ে রইলেন। যেই শাসক তাঁকে শূলীতে চড়িয়েছিল আজ পৃথিবীর কেউ তাকে চেনে না। সে যুগের আলোচনায় আমি তার নামটি পর্যন্ত খুঁজে পাইনি, কিন্তু আল্লামা আবদুল হক (রহঃ)এর নাম চির অমর হয়ে আছে। যতদিন পৃথিবীতে সত্যের নাম উচ্চারণকারী থাকবে, ততদিন তার জন্য ভক্তি ও ভালবাসার পুষ্প উৎসর্গ করা হবে। আল্লাহ তাঁর উপর অসংখ্য রহমত বর্ষণ করুন।

সুমাম উপত্যকায়

বাজায়াতে অবস্থানকালে এক শুক্রবারে কনফারেন্সের পরিচালকগণ সকল আমন্ত্রিত মেহমানকে বাজায়া থেকে প্রায় ৮০ মাইল দূরে সুমাম উপত্যকায় নিয়ে যান। এটি সবুজ শ্যামল পাহাড়ে ঘেরা নয়নাভিরাম একটি উপত্যকা। এখানকার সর্বোচ্চ পর্বত শৃঙ্গে ছোট্ট একটি গ্রাম রয়েছে। সেই গ্রামের একটি কাঁচা বাড়ীতে ফ্রান্সিস সাম্রাজ্যবাদের যুগে

আলজেরিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলের মুসলমান মুজাহিদদের একটি সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। তাতে সকল অঞ্চলের মানুষের একটি একক প্লাটফর্ম তৈরী করে ফ্রান্সের হাত থেকে স্বাধীন হওয়ার আন্দোলন শুরু করা হয়। আলজেরিয়া সরকার স্বাধীনতার পর সেই বাড়ী সংরক্ষণ করে রাখেন এবং তার আশেপাশে বিভিন্ন স্মৃতিচিহ্ন নির্মাণ করেন। আমাদের গাড়ী বিপদসংকুল পাহাড়ী খাড়া পথ অতিক্রম করে সেই গ্রামে পৌঁছে, আমরা গাড়ী থেকে নেমে পায়ে হেঁটে চলতে থাকি। আমাদের একদিকে গ্রামের সারিবদ্ধ বাড়ীঘর, ঘরের দরজায় গ্রামীণ মহিলারা বসেছিল। আমাদের কাফেলা যখন সেসব বাড়ীর নিকট দিয়ে অতিক্রম করছিল, তখন সেখানকার মহিলারা অবিরত চিৎকারের মত বিচিত্র এক আওয়াজ করতে থাকে, যা জঙ্গলের নীরবতা ভেঙ্গে দূর-দূরান্তে ছড়িয়ে পড়ে। তাদের চিৎকারে ভীতির পরিবর্তে আনন্দধারা সুস্পষ্ট ছিল। ইতিপূর্বে কখনও আমি এরূপ আওয়াজ শ্রবণ করিনি। তাই আমি বিচলিত ছিলাম। আমার সঙ্গে তিউনিসিয়ার মুফতী শায়েখ মুখতার আস সালামী ছিলেন। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, উত্তর আফ্রিকা অঞ্চলে এ প্রথা রয়েছে যে, মহিলারা আনন্দের মুহূর্তে বা কোন মেহমানকে স্বাগত জানানোর জন্য এরূপ আওয়াজ করে থাকে। এ আওয়াজকে 'জাগারীদ' বলা হয়।

টীকা ঃ জাগারীদ জাগরাদাতুনের বহুবচন। জাগাদুন মূল শব্দ থেকে উদ্ভূত। উটের অব্যাহত আওয়াজকে জাগাদুন বলে। লিসানুল আরব অভিধানে জাগরাদাতুন শব্দের উল্লেখ নেই। কিন্তু পরবর্তীকালের অভিধানসমূহে এ শব্দ রয়েছে, তাতে বলা হয়েছে আনন্দের মুহূর্তে মহিলাদের আওয়াজ করাকে জাগারিদ বলে। শুধু মহিলারাই এমন ধ্বনি করতে পারে। একাজ পুরুষদের সামর্থভুক্ত নয়। এই আওয়াজের বৈশিষ্ট্য এই যে, বাহ্যত তাদের এই আওয়াজকে বাংলায় চিৎকার ছাড়া অন্য কিছু বলা সম্ভব নয়। কিন্তু তাদের উচ্চারণে ব্যথা বা ভয়ের কোন লেশ থাকে না বরং শব্দ তরঙ্গের স্বাভাবিক উত্থান পতনে তাতে একপ্রকার আনন্দের আভা ফুটে ওঠে। শেখ সালামী বললেন ঃ জাগারীদ অনেক মহিলা সম্মিলিতভাবে করে থাকে। যে কারণে মুখ সামান্য হা করেই

তারা এ আওয়াজ করতে পারে, তাই প্রত্যক্ষকারী ব্যক্তিরা সাধারণতঃ অনুভব করতে পারে না যে, এই ধ্বনি এদের মুখ থেকে বের হচ্ছে। এমন অব্যাহতভাবে এই ধ্বনি করা হয় যে, শ্বাসও বন্ধ হয় না।

জাগারীদ শ্রবণের এটি আমার প্রথম অভিজ্ঞতা। পরবর্তীতে আলজেরিয়া নগরী এবং কায়রোতেও দেখেছি যে, বিবাহ অনুষ্ঠানে গৃহাভ্যন্তর থেকে বারবার এরূপ ধ্বনি করা হয়।

যাই হোক, আমরা পাহাড়ের চূড়ায় পৌঁছে সেখানে গ্রামীণ ধাচের ছোট একটি বাড়ী দেখতে পাই। যার মধ্যে আলজেরিয়ার স্বাধীনতার পথ প্রদর্শকদের সেই ঐতিহাসিক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই সমাবেশের পূর্বে যদিও ফ্রান্সিস সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু হয়েছিল, কিন্তু তাদের পরস্পরের মধ্যে না কোন সংযোগ ছিল এবং না কোন সম্মিলিত কর্মসূচীর ধারণা ছিল। তাই ফ্রান্সিস শাসকরা একদিকে এসব আন্দোলনকে ধ্বংসাত্মক ও সন্ত্রাসমূলক নাম দিয়েছিল। অপরদিকে তারা সংগ্রামের নেতাদের মাঝে সংযোগ সৃষ্টি করার সমস্ত পথ অবরুদ্ধ করেছিল। এমতাবস্থায় এ সকল নেতাদের পরস্পর মিলিত হওয়া মৃত্যুকে আলিঙ্গন করারই নামান্তর ছিল। কিন্তু কিছু মানুষ জান বাজী রেখে সুদূর পর্বতের এই চূড়ায় গোপন বৈঠকের ব্যবস্থা করেন। এই বৈঠকের পর বিক্ষিপ্ত স্বাধীনতা আন্দোলন সংঘবদ্ধ এবং সুসংহত আন্দোলনের রূপ নেয়। এমনকি ভীনদেশী শক্তিগুলোকেও স্বাধীনতাকামী এই সুসংহত শক্তিকে স্বীকার করে নিতে হয়।

এই বাড়ীর নীচে একটি পাহাড়ের পাদদেশে ছোট্ট একটি জঙ্গী বিমানের বিধ্বস্ত খোল পড়েছিল। বলা হয় যে, এটি ফ্রান্সিস সেনাবাহিনীর সেই জঙ্গী জাহাজ, যা স্বাধীনতা আন্দোলন চলাকালে স্বাধীনতাকামীরা সর্বপ্রথম ভূপাতিত করে। এর সাথেই একটি কক্ষে ছোট্ট একটি জাদুঘর রয়েছে, যার মধ্যে স্বাধীনতা আন্দোলনের বিভিন্ন স্মৃতি এবং তৎকালের সংবাদপত্র রক্ষিত আছে।

আলজেরিয়ায় প্রত্যাবর্তন

বাজায়াতে এক সপ্তাহ অবস্থানের পর নিমন্ত্রিত সকল ব্যক্তিকে ভাড়াকৃত বিমানযোগে আলজেরিয়ায় ফিরিয়ে আনা হয়। ভোর আটটায় আমরা প্লেনে আরোহণ করি। প্লেন ছোট হওয়াতে সমুদ্র উপকূল ধরে নীচ দিয়ে উড়ছিল। একদিকে আলজেরিয়ার উপকূলীয় সবুজ ভূমি বিস্তৃত ছিল। অপরদিকে ভূমধ্যসাগর উত্তাল তরঙ্গে তরঙ্গায়িত হচ্ছিল। উত্তর আফ্রিকার এই উপকূলীয় অঞ্চল দিয়েই সাড়ে ১৩০০ বছর পূর্বে ওকবা বিন নাফে (রাযিঃ)এর নেতৃত্বে ইসলামের মুজাহিদদের কাফেলা অতিক্রম করে।

ইসলামের সকল মুজাহিদ অশ্ব ও উটে আরোহণ করে মিসর, লিবিয়া ও তিউনিসিয়া হয়ে এখানে পৌঁছে। তাঁরা মরক্কোর শেষ প্রান্ত পর্যন্ত ইসলামের ঝাণ্ডা উড়িয়ে তবে ক্ষান্ত হন। আমার এক আলজেরিয়ান বন্ধু বললেন ঃ একবার আমি প্রাইভেট কারযোগে কায়রো পর্যন্ত গিয়েছিলাম। প্রায় ৫০০০ কিলোমিটারের এই পথ বিভিন্ন শহরের আরামদায়ক হোটেলে বিশ্রাম করে করে সফর করছিলাম। কিন্তু কায়রোতে যখন পৌঁছি, তখন ক্লান্তিতে আমার প্রাণ ওষ্ঠাগত ছিল। আর মুজাহিদগণ অশ্ব ও উটে আরোহণ করে বরং অনেক সময় পায়ে হেঁটেও বৃক্ষলতা শূন্য এ সকল মরুভূমি এবং হিংস্র প্রাণীতে পূর্ণ বনজঙ্গল অতিক্রম করেন এবং প্রতি পদক্ষেপে শত্রুর বাধাকে মোকাবেলা করে তারা এখানে পৌছেন। উত্তর আফ্রিকার আকাশে বাতাসে সেসব খোদাপ্রেমিক বুযুর্গদের সংকল্প ও দৃঢ় সাহসের কত উপাখ্যানই না লুকিয়ে আছে। আল্লাহু আকবার।

ওকবা বিন নাফে (রাযিঃ) ও তাঁর বিজয়গাঁথা

এ অঞ্চলের বিজয়মালা মূলতঃ হযরত ওকবা বিন নাফে (রাযিঃ)এর মস্তকে শোভিত। তিনি সাহাবী ছিলেন না বটে, তবে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্মের এক বছর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন। মিসরের বিজয়সমূহে তিনি হযরত আমর বিন আস (রাযিঃ)এর সঙ্গে ছিলেন। পরবর্তীতে হযরত মুয়াবিয়া (রাযিঃ) তাঁর শাসনকালে তাঁকে

উত্তর আফ্রিকার অবশিষ্ট ভূখণ্ড জয় করার দায়িত্ব অর্পণ করেন। তিনি তাঁর দশ সহস্র সঙ্গী নিয়ে মিসর থেকে বের হয়ে বীরত্বের প্রশংসা কুড়াতে কুড়াতে তিউনিসিয়া পৌঁছেন। সেখানে কায়রোয়ান নামে প্রসিদ্ধ শহর আবাদ করেন। যার ঘটনা এই যে, বর্তমানে যেখানে কায়রোয়ান শহর অবস্থিত। তখন সেখানে নিবিড় অরণ্য ছিল এবং তা বন্যপ্রাণীতে পরিপূর্ণ ছিল।

হযরত ওকবা বিন নাফে (রাযিঃ) বর্বরীদের শহরে অবস্থান না করে মুসলমানদের জন্য পৃথক শহর প্রতিষ্ঠা করার জন্য এ স্থান মনোনীত করেন, যাতে করে এখানকার মুসলমানগণ পূর্ণ আস্থার সঙ্গে তাদের শক্তি বৃদ্ধি করতে সক্ষম হন। তাঁর সঙ্গীগণ বললেন ঃ এই বনভূমি হিংস্র প্রাণী ও কীটপতঙ্গে পরিপূর্ণ, কিন্তু হযরত ওকবা (রাযিঃ)এর দৃষ্টিতে শহর প্রতিষ্ঠার জন্য এর চেয়ে উৎকৃষ্ট কোন স্থান ছিল না। তাই তিনি নিজ সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করলেন না। তিনি সেনাবাহিনীতে উপস্থিত সাহাবীদেরকে একত্র করলেন এবং তাঁদেরকে সঙ্গে নিয়ে দু'আ করলেন। তারপর হযরত ওকবা (রাযিঃ) ঘোষণা করলেন ঃ

ايتها السباع والحشرات، نحن أصحاب رسول الله.صلى الله عليه و سلم ارحلوا عنا، فانا نازلون، فمن و جدناه بعد قتلناه –

অর্থাৎ, 'হে হিংস্র প্রাণী ও কীটপতঙ্গ সকল! আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী। আমরা এখানে বসবাস করতে চাই। তাই তোমরা এখান থেকে চলে যাও। এই ঘোষণার পর তোমাদের যাকেই এখানে দেখা যাবে, তাকেই আমরা হত্যা করব।'

কি হয়েছিল এই ঘোষণার ফল? ইমাম ইবনে জারীর তাবারী (রহঃ) এ বিষয়ে লেখেন ঃ 'কোন পশুই আর সেখানে অবশিষ্ট ছিল না। সকলেই সেখান থেকে পালিয়ে যায়। এমনকি হিংস্র প্রাণীকুল স্বীয় শাবকদের বহন করে নিয়ে যেতে থাকে।'

প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক এবং ভূগোলবিদ আল্লামা জাকারিয়া বিন মুহাম্মাদ কাজবিনী (রহঃ) (মৃত ৬৮২ হিজরী) লেখেন ঃ 'সেদিন মানুষ এমন বিস্ময়কর দৃশ্য দেখতে পেল, যা তারা ইতিপূর্বে কখনো দেখেনি। হিংস্রপ্রাণী তার শাবকদের বহন করে নিয়ে যাচ্ছে। বাঘ স্বীয় শাবককে, সরীসৃপ তার বাচ্চাকে, এরা সকলে ঝাঁকে ঝাঁকে বের হয়ে চলে যেতে থাকে এবং এই দৃশ্য দেখে বর্বরীদের অনেক লোক মুসলমান হয়ে যায়।'

তারপর ওকবা বিন নাফে (রাযিঃ) ও তাঁর সঙ্গীরা বন কেটে সে স্থানে কায়রোয়ান শহর আবাদ করেন। তাঁরা সেখানে একটি জামে মসজিদ নির্মাণ করেন এবং একে উত্তর আফ্রিকায় তাঁদের কেন্দ্র হিসেবে নির্ধারণ করেন। হযরত মুআবিয়া (রাযিঃ)এর শাসনকালে হযরত ওকবা (রাযিঃ) তার অধিনায়কত্বের পদ থেকে বরখাস্ত হয়ে সিরিয়াতে বসবাস শুরু করেন। পরিশেষে হযরত মুআবিয়া (রাযিঃ) পুনর্বার তাঁকে সেখানে প্রেরণ করতে ইচ্ছা করেন। কিন্তু তার পূর্বেই তিনি ইন্তেকাল করেন। পরবর্তীতে ইয়াযীদ তার শাসনকালে তাঁকে পুনরায় আফ্রিকার গভর্নর নিযুক্ত করেন। এ সময় তিনি কায়রোয়ানের পশ্চিম দিকে পুনরায় অগ্রাভিযান শুরু করেন। যাত্রার পূর্বে তিনি স্বীয় পুত্রদেরকে কাছে ডেকে বলেন—

انى قدبعت نفسى من الله عزوجل، فلا ازال آجاهد من كفر بالله –

অর্থাৎ, আমি আল্লাহর নিকট আমার জান বিক্রি করে দিয়েছি। তাই আমি আমরণ কাফিরদের সঙ্গে জিহাদে রত থাকব। তারপর তাদেরকে বিদায়কালীন উপদেশ দিয়ে যাত্রা শুরু করেন। এ সময়েই তিনি আলজেরিয়ার তিলমোদান ও অন্যান্য অঞ্চল জয় করেন। এমনকি মরক্কো প্রবেশ করে সেখানকার অনেক অঞ্চলে ইসলামের ঝাণ্ডা উড্ডীন করেন।

পরিশেষে আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলের 'আসফা' নামক স্থানে আটলান্টিক মহাসাগর দৃষ্টিগোচর হতে থাকে। মহাসাগরের প্রান্তে পৌঁছেই হযরত ওকবা বিন নাফে (রাযিঃ) তাঁর সেই ঐতিহাসিক উক্তি করেন ঃ

يا رب! لولا هذا البحر لمضيت فى البلاد مجاهدا فى سبيلك –

অর্থাৎ 'হে প্রভু! মহাসমুদ্র যদি প্রতিবন্ধক না হত, তাহলে আপনার পথে জিহাদ করতে করতে আমার যাত্রা অব্যাহত রাখতাম।'

তিনি আরো বলেন ঃ 'হে আল্লাহ! আপনি সাক্ষী থাকুন, আমি

আমার সাধ্যমত চেষ্টার চূড়ান্তে পৌঁছেছি। যদি মহাসমুদ্র মাঝে না আসত, তাহলে যেসব লোক আপনার তাওহীদকে অস্বীকার করে, তাদের সঙ্গে লড়তে লড়তে সম্মুখে অগ্রসর হতাম। এমনকি পৃথিবীর বুকে আপনি ভিন্ন অন্য কারো এবাদত করা হত না।'

তারপর তিনি নিজের ঘোড়ার অগ্রপদ আটলান্টিকের তরঙ্গে নামিয়ে দেন। তাঁর সঙ্গীদেরকে ডেকে সমবেত করেন। তাঁদেরকে হাত উঠাতে বলেন। সঙ্গীরা হাত উঠালে হযরত ওকবা (রাযিঃ) হৃদয়ে রেখাপাতকারী এই দু'আ করেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ لَمْ اَخْرُجْ بَطَرًا وَّلَا اَشِرًا، وَاِنَّكَ تَعْلَمُ اِنَّمَا نَطْلُبُ السَّبَبَ الَّذِىْ طَلَبَهٗ عَبْدُكَ ذُوالْقَرْنَيْنِ، وَ هُوَاَنْ تُعْبَدَ، وَلَا يُشْرِكُ بِكَ شَيْئٌ، اَللّٰهُمَّ اِنَّا مُدَافِعُوْنَ عَنْ دِيْنِ الْاِسْلَامِ ، فَكُنْ لَنَا، وَلَا تَكُنْ عَلَيْنَا يَا ذَاالْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ -

অর্থাৎ, 'হে আল্লাহ! আমি অহংকার আর ঔদ্ধত্যের আবেগ নিয়ে বের হইনি, তা আপনি অবশ্যই জানেন। আমি সেই কারণের সন্ধানে আছি, যার সন্ধান আপনার দাস জুলকারনাইন করেছিলেন। আর তা এই যে, পৃথিবীতে একমাত্র আপনার বন্দেগী চলবে। আপনার সঙ্গে কাউকে শরীক করা হবে না। হে আল্লাহ! আমরা দ্বীন ইসলামের শত্রুদের প্রতিরোধকারী তুমি আমাদের স্বপক্ষে হয়ে যাও। আমাদের বিপক্ষে যেওনা। হে মর্যাদা ও মহত্ত্বের অধিকারী খোদা।'

আটলান্টিকের তীর থেকে হযরত ওকবা (রাযিঃ) কায়রোয়ানের দিকে ফিরতি পথ ধরেন। পথিমধ্যে এমন একটি স্থান সম্মুখে এলো যেখানে দূর-দূরান্ত পর্যন্ত পানির কোন চিহ্ন ছিল না। পুরো সেনাবাহিনী তৃষ্ণায় অস্থির ছিল। হযরত ওকবা (রাযিঃ) দু' রাকাত নফল নামায আদায় করে দু'আ করেন। দু'আ শেষ করেই দেখেন তাঁর ঘোড়া খুর দ্বারা মাটি খুঁড়তে শুরু করেছে। সেখানে একটি পাথর দেখতে পেলেন। সে পাথর থেকে পানির ঝর্ণা প্রবাহিত হয়।

ہزار چشمہ ترے سنگ راہ سے پھوٹے

خودی میں ڈوب کے ضرب کلیم پیدا کر

"তোমার পথের পাথর থেকে হাজার ঝর্ণা উৎসরিত হয়।

স্বীয় আত্মমর্যাদায় নিমজ্জিত হয়ে মুসা কালিমুল্লার মুজিযা দেখিয়ে দাও।"

এখান থেকে সম্মুখে অগ্রসর হয়ে হযরত ওকবা (রাযিঃ) সম্মুখের পথ বিপদমুক্ত মনে করলেন। নিজের সেনাবাহিনীর বেশী অংশ তাড়াতাড়ি কায়রোয়ান পৌঁছার জন্য সম্মুখে প্রেরণ করেন। আর নিজে কয়েক শ' অশ্বারোহীকে সঙ্গে নিয়ে পথের 'তাহুজা' নামক দূর্গে আক্রমণ চালানোর উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। তাঁর ধারণা ছিল, এ স্বল্প সংখ্যক লোক এ দূর্গ বিজয়ের জন্য যথেষ্ট হবে। কিন্তু দূর্গের অধিবাসী ছিল খুব বেশী। উপরন্তু বিপদ এই হল যে, হযরত ওকবা (রাযিঃ)এর সৈন্যদের মধ্যে বর্বরী বংশোদ্ভূত কাছীলা নামক এক ব্যক্তি (বাহ্যতঃ সে মুসলমান ছিল কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে হযরত ওকবা (রাযিঃ)এর শত্রু ছিল) শত্রুবাহিনীর সঙ্গে মিলিত হয়ে যায় এবং সেনাবাহিনীর তথ্য শত্রুদের নিকট প্রকাশ করে দেয়। ফলে মুসলমানরা চতুর্দিক থেকে শত্রুবেষ্টিত হয়ে পড়ে। হযরত ওকবা (রাযিঃ) এই সময় আবুল মুহাজের নামীয় তাঁর এক সঙ্গীকে (যিনি বন্দী ছিলেন) মুক্ত করে দিয়ে বললেন ঃ তুমি অন্যান্য মুসলমানদের সঙ্গে মিলিত হও এবং তাদের নেতৃত্ব দাও, কেননা শাহাদাত বরণের জন্য এর চেয়ে সুবর্ণ সুযোগ আমি আর দেখি না। আবু মুহাজের বললেন ঃ শাহাদাতের আকাংখা আমারও রয়েছে। তখন উভয়ে নিজেদের সঙ্গীদেরকে নিয়ে শত্রুদের সাথে লড়তে লড়তে শহীদ হয়ে যান। আল্লাহ তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তাঁরাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট।

ফলে হযরত ওকবা (রাযিঃ)এর মাজার আলজেরিয়ার অনেক দক্ষিণে ভিতরে অবস্থিত। আজও সে স্থানকে তাঁর নামেই সাইয়্যিদি ওকবা বলা হয়।

প্লেন যতক্ষণ উড়ছিল আমি ঐতিহাসিক এই ঘটনাসমূহের কল্পনায় হারিয়ে যাই। এক পর্যায়ে আলজেরিয়া শহর দৃষ্টিগোচর হতে থাকে।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই বুমদীন এয়ারপোর্টে প্লেন ল্যাণ্ড করে।

প্লেনের অপেক্ষায় আলজেরিয়াতে আমাকে দুই দিন অবস্থান করতে হয়। এই দুই দিন আলজেরিয়ার বিভিন্ন স্থান ভ্রমণ এবং কুতুবখানা পরিদর্শনে অতিবাহিত হয়।

আলজেরিয়া ভূমধ্যসাগরের তীরে ফ্রান্সিস ধাচে গড়ে ওঠা একটি নগরী। আধুনিক সভ্যতার উন্নত নগরীসমূহের মধ্যে তার খুব বেশী উচ্চতর মর্যাদা নেই, কিন্তু যথেষ্ট সুদৃশ্য ও পরিচ্ছন্ন শহর এটি। যা আধুনিক নগরায়ন সুবিধাদি দ্বারা সুসজ্জিত। সমুদ্র উপকূল, ছোট ছোট পাহাড় ও সবুজ শ্যামলতার কারণে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যেও সুশোভিত। এই শহরের নামে পুরো দেশকে আলজেরিয়া বলা হয়। বাহ্যতঃ তার নাম দ্বারা মনে হয় যে, এটি একটি উপদ্বীপের সমন্বয়ে গঠিত দেশ। কিন্তু মূলতঃ তার নামকরণের কারণ কোন কোন আলজেরিয়ান বন্ধু এই বর্ণনা করেন যে, এখানে উপকূল থেকে কিছু দূরে সমুদ্রের ভিতর বসবাসের অযোগ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপদ্বীপ রয়েছে। সেগুলোকে বিনোদন কেন্দ্ররূপে ব্যবহার করা হয়। এসব উপদ্বীপের কারণে এই শহর আলজেরিয়া নামে প্রসিদ্ধ হয় এবং এই শহরের নামে পুরা দেশকে আলজেরিয়া বলা হয়।

আলজেরিয়ার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

হযরত ওকবা বিন নাফে (রাযিঃ)এর হাতে এ অঞ্চল বিজয়ের ঘটনা পূর্বে লিখেছি। মরক্কোসহ এ সম্পূর্ণ ভূখণ্ড সে সময় তিউনিসিয়া প্রদেশের অংশ ছিল। কায়রোয়ান ছিল তার রাজধানী। পরবর্তীতে সর্বপ্রথম মরক্কোতে স্বাধীন সরকার প্রতিষ্ঠিত হয় এবং বর্তমান আলজেরিয়ার পশ্চিমের কিছু অংশও এর অন্তর্ভুক্ত হয়। এরও পরে পশ্চিমের এই অংশ এবং আলজেরিয়ার অবশিষ্টাঞ্চল বনু হাফস বংশের নেতৃত্বে সংগঠিত হয় এবং তারাও স্বাধীনতার ঘোষণা দেয়। তারপর বনু হাফসের রাজত্বে ফাটল ধরে এবং তা খণ্ড খণ্ড হয়ে যায়। এ সময়েই ইউরোপের খৃষ্টান দেশসমূহ মুসলমানদের বিপক্ষে তাদের শক্তি সমন্বিত করতে থাকে। প্রথমে তারা স্পেনকে তাদের লক্ষ্য বানিয়ে সেখানে তাদের অবস্থান দৃঢ় করে। পরবর্তীতে আফ্রিকার বিভিন্ন উপকূলেও তাদের তৎপরতা শুরু

হয়। তখন এ পুরা অঞ্চল আভ্যন্তরীণ অস্থিতিশীলতার কারণে ইউরোপের আগ্রাসনমূলক কর্মতৎপরতায় বিপদের সম্মুখীন হয়।

তৎকালে মুসলমানদের সর্ববৃহৎ শক্তি ছিল তুরস্কের উসমানী খেলাফত। যে কোন জায়গায় মুসলমানদের সাহায্য সহযোগিতার প্রয়োজন দেখা দিলে তারা নিজেরাই অগ্রসর হয়ে সাহায্য করত। এ কাজের জন্য তাদের নৌবহর সাগরের বুকে বিচরণ করতে ও পাহারা দিতে থাকত।

এ রকমই এক নৌবহরের অধিনায়ক ছিলেন খায়রুদ্দিন বারবারুছা। যাঁর নৌতৎপরতা প্রসিদ্ধ ছিল। গ্রানাডা পতনের পর তিনি তাঁর নৌবহর আলজেরিয়ার উপকূলে নোঙর করে রেখেছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল গ্রানাডা পতনের ফলে স্পেনের মুসলমানদের উপর বিপদের যেই পাহাড় ভেঙ্গে পড়েছে, এই বিপদে তাদের সহযোগিতা করা। তাই তাঁদের জাহাজগুলো স্পেনের বিপদাক্রান্ত মুসলমানদেরকে স্পেন থেকে আলজেরিয়ায় স্থানান্তর করার কাজে বিরাট বড় ভূমিকা পালন করে।

তৎকালীন সময়ে আলজেরিয়ার মুসলমানরা তাদের অস্থিতিশীলতার কারণে বড় পেরেশান ছিল, স্পেনের করুণ পরিণতি ছিল তাদের সম্মুখে। প্রতি মুহূর্তে আশংকা ছিল যে, ইউরোপের খৃষ্টবাদী শক্তিসমূহ তাদেরকে সিক্ত গ্রাস মনে করে তাদের উপরে স্বীয় কর্তৃত্বের হাত প্রসারিত করবে। তাই আলজেরিয়ার মুসলমানগণ খায়রুদ্দিন বারবারুছার নিকট আলজেরিয়াকে উসমানী খেলাফতের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য আবেদন করল। উসমানী খেলাফত এ আহ্বানে সাড়া দিয়ে ৯৪৫ হিজরীতে এ অঞ্চলের দায়িত্ব হাতে নেয় এবং আলজেরিয়া যথানিয়মে উসমানী খেলাফতের অংশ হয়ে যায়।

আলজেরিয়ায় দীর্ঘদিন পর্যন্ত উসমানী খেলাফতের হুকুমাত পূর্ণ শান্তি শৃংখলা এবং জনসাধারণের স্বচ্ছলতা সহকারে প্রতিষ্ঠিত থাকে। তুর্কি গভর্নরদের আচরণ মোটের উপর ইসলামী শিক্ষা অনুযায়ী ছিল, কিন্তু ক্রমান্বয়ে তাদের ধর্মীয় পরিবেশে দুর্বলতা প্রবেশ করতে থাকে। কোন কোন গোঁড়া গভর্নর সরকারী চাকুরীর ব্যাপারে গোঁড়ামী করে কাজ করতে থাকে। ফলে আলজেরিয়ার জনগণ অসন্তুষ্ট হয়ে যায়। এ সকল

গভর্নর খেলাফতে উসমানিয়ার আইন কানুনও পরিপূর্ণরূপে মেনে চলত না। অপরদিকে জনসাধারণের কর্মধারাতেও অধঃপতন আসতে থাকে। এই অধঃপতনের যুগে উসমানী খেলাফতের পক্ষ থেকে হুসাইন পাশা আলজেরিয়ার শেষ গভর্নর নিযুক্ত হন। তিনি নিজের বোকামী ও একঘেয়েমীতে অটল থেকে আলজেরিয়াকে ফ্রান্সের দাসত্বে ঠেলে দেন। এ ঘটনাটিও বড় শিক্ষণীয়। ঘটনাটি এই ঃ

"বকরী আবু জান্নাহ নামক আলজেরিয়ার এক ইহুদী ব্যবসায়ী ফ্রান্সের ব্যবসায়ীদের সঙ্গে বাণিজ্য সম্পর্ক রাখত। সেই ব্যবসার সূত্রে ফ্রান্সের ব্যবসায়ীরা আলজেরিয়ার ইহুদীর নিকট ঋণী হয়ে যায়। তাদের নিকট পাওনা টাকা চাওয়া হলে, তারা এই ওজর তুলে ধরত যে, আমরা ক্ষতিগ্রস্ত, তাই এই ঋণ পরিশোধ করতে অক্ষম।

বকরী আবু জান্নাহ এ ব্যাপারে আলজেরিয়ার গভর্নর হুসাইন পাশার সাহায্য প্রার্থনা করে। হুসাইন পাশা ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূতকে তলব করে এ অর্থ পরিশোধের ব্যবস্থা করার জন্য তাকীদ করেন। পরিশেষে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে উভয় পক্ষের মতানৈক্য দূর করে এই সিদ্ধান্ত হয় যে, ফ্রান্সের ব্যবসায়ীরা বকরী আবু জান্নাহকে আপোষের জন্য বড় একটি অর্থ প্রদান করবে। প্রসিদ্ধ আছে যে, এ চুক্তির ব্যাপারে শুরু থেকেই হুসাইন পাশার নিয়্যত খারাপ ছিল এবং এ অর্থ বা তার একটি অংশ আত্মসাৎ করার জন্যই এই ঘটনায় তার এত আন্তরিকতা ছিল। এ জাতীয় কর্মকাণ্ড তার অভ্যাসেও পরিণত হয়েছিল।

চুক্তি অনুসারে অর্থ আদায়ের সময় এলে ফ্রান্সের আরো কিছু ব্যবসায়ী বকরী আবু জান্নাহর নিকট বিরাট অংকের অর্থ পাওনা আছে বলে দাবী করে এবং সাথে সাথে তাদের সরকারের মাধ্যমে একটি নিষেধাজ্ঞা জারি করে, যার মাধ্যমে বকরী আবু জান্নাহ এর নিকট ঋণী সকল ফ্রান্সিস বণিকদেরকে উপরোক্ত চুক্তি অনুসারে অর্থ আদায় করা থেকে বিরত রাখা হয়, যেন তারা তাদের অর্থ ফ্রান্সেই আদায় করে নিতে পারে।

হুসাইন পাশা বিষয়টি অবগত হলে তিনি ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূতকে ডেকে এনে এর প্রতিবাদ জানিয়ে বলেম যে, চুক্তি অনুসারেই অর্থ আদায়

করতে হবে এবং অন্যান্য বণিকদের অর্থ বকরী আবু জান্নাহের দায়িত্বে থাকবে, তারা উক্ত অর্থ আদায় করার পর সরাসরি তার থেকে উসুল করে নেবে। কারণ উভয় কারবার পৃথক পৃথক। কিন্তু রাষ্ট্রদূত তার এ কথায় রাজী হল না। তার কারণ হুসাইন পাশার এরূপ অসৎ কর্মকাণ্ড প্রসিদ্ধ ছিল। ফলে বকরী আবু জান্নাহ এর পাওনাদারদের আশংকা ছিল যে, ফ্রান্স থেকে এ অর্থ চলে গেলে বকরী আবু জান্নাহর নিকট তা পৌছবে না। বরং হুসাইন পাশা তা আত্মসাৎ করবে। ফলে বকরীর নিকট আমরা আমাদের পাওনা অর্থ চাইলে তার নিকট দেওয়ার মত কিছুই থাকবে না।

ফ্রান্স রাষ্ট্রদূত হুসাইন পাশার কথা মানতে অস্বীকার করলে হুসাইন পাশা সরাসরি ফ্রান্স সরকারের নিকট একটি পত্র প্রেরণ করেন। ফ্রান্স সরকার সে পত্র তার রাষ্ট্রদূতের নিকট প্রেরণ করে তাকে উত্তর দানের নির্দেশ দেয়। এরই মাঝে একটি বিষয় নিয়ে উক্ত রাষ্ট্রদূত হুসাইন পাশার নিকট গেলে পাশা তাকে বলেন যে, অনেক দিন হয়ে গেল অথচ আজও আমার চিঠির উত্তর পাইনি। রাষ্ট্রদূত তার উত্তরে বলে, আমার সরকার সে পত্রের উত্তর আমাকে দিতে বলেছে। হুসাইন পাশা এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে রাষ্ট্রদূত যে উত্তর দেয়, তার মধ্যে হুসাইন পাশা তাচ্ছিল্যের গন্ধ পায়। সে সময় পাশার হাতে একটি পাখা ছিল। তিনি সেই পাখা ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূতের মুখের উপর ছুড়ে মারেন এবং তাকে বাইরে বের করে দেন।

ফ্রান্স সরকার তার দূতকে অপমান করার শক্ত প্রতিবাদ জানায় এবং দাবী করে যে, হুসাইন পাশা রাষ্ট্রদূতের নিকট ভুল স্বীকার করুক। কিন্তু হুসাইন পাশা তা করতে অস্বীকার করে। সে সময় ফ্রান্স সরকার তাদের অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত ছিল এবং বিভিন্ন রণাঙ্গনে যুদ্ধের সম্মুখীন ছিল, তাই নতুন করে আর কোন যুদ্ধ ক্রয় করতে চাচ্ছিল না। তাই পরিশেষে সে এই প্রস্তাব করে যে, হুসাইন পাশা নিজে রাষ্ট্রদূত বা ফ্রান্স সরকারের নিকট ভুল স্বীকার করার পরিবর্তে প্যারিসে অবস্থানকারী যে কোন ব্যক্তিকে এ কাজের জন্য তার প্রতিনিধি বানিয়ে দিক, যেন সে ব্যক্তি ফ্রান্স সরকারের নিকট তার পক্ষ থেকে ভুল স্বীকার করে।

উসমানী খেলাফতের কেন্দ্রের পক্ষ থেকেও হুসাইন পাশাকে এই

প্রস্তাব গ্রহণ করে সে অনুপাতে কাজ করার জন্য তাকীদ করা হয়। কিন্তু হুসাইন পাশা তার জিদের উপর অটল থাকেন এবং এ প্রস্তাবও তিনি প্রত্যাখ্যান করেন। ফল এই হয় যে, ফ্রান্স সরকার যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে যায় এবং একটি শক্তিশালী নৌবহরের মাধ্যমে আলজেরিয়া আক্রমণ করে। হুসাইন পাশা এ আক্রমণ প্রতিরোধ করতে ব্যর্থ হয়। ফলে ফ্রান্স সরকার পূর্ণ আলজেরিয়া দখল করে নেয় এবং হুসাইন পাশাকে কয়েদ করে প্যারিসে নিয়ে যায়।

কোন কোন ঐতিহাসিক এর কারণ এই বলেছেন যে, হুসাইন পাশা নিজে আলজেরিয়ান না হওয়ায় দেশের জন্য তার কোন দরদ ছিল না। ফলে তিনি এমন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন, যা সর্বশেষে আলজেরিয়ার জন্য ধ্বংসাত্মক প্রমাণিত হয়। কিন্তু আল্লামা শায়েখ মুহাম্মদ বীরম তিউনিজিন (রহঃ) যিনি শেষ যুগে উত্তর আফ্রিকার সর্বজনস্বীকৃত বিরাট বড় আলেম ছিলেন, ইলমে দ্বীন ছাড়াও ইতিহাস, রাজনীতি এবং ভূগোল সম্পর্কেও তাঁর বিস্তর জ্ঞান ছিল। তিনি উপরোক্ত মতের জোর প্রতিবাদ করে বলেন ঃ

"ইসলামী জাতীয়তাবাদ একই। বিভিন্ন অভিজ্ঞতা দ্বারা একথা প্রত্যাখ্যাত যে, (বাহির থেকে আগমনকারী মুসলমান শাসকগণের দেশের দরদ থাকে না)। ঐতিহাসিক ভাবে একথা প্রমাণিত এবং বারবার এটা প্রত্যক্ষ করা গেছে যে, বাহির থেকে আগমনকারী অনেক মুসলমান শাসক তার শাসনাধীন অঞ্চলের সঙ্গে পরিপূর্ণ অফাদারী করেছেন ও ভালবাসার প্রমাণ রেখেছেন। এখান থেকে পাওয়া নেয়ামতের উপর কৃতজ্ঞ থেকেছেন। দেশকে সুন্দর ও সুদৃঢ় করার জন্য আমানত ও দিয়ানতের দিকে পরিপূর্ণ খেয়াল রেখেছেন। পক্ষান্তরে দেশের অনেক সন্তান এর সম্পূর্ণ বিপরীত আচরণ করেছে। তাই প্রকৃতপক্ষে কোন অঞ্চল থেকে মুসলমানদের শাসন উৎখাত হওয়ার কারণ শাসকদের জাতীয়তবাদ নয় বরং অঞ্চল প্রধানদের নৈতিক অধঃপতন। তারা অন্যায় অপকর্মে লিপ্ত হয়। যার স্বাভাবিক পরিণতি এই হয় যে, শাসন ক্ষমতা অযোগ্যদের হাতে চলে যায়। তখন তাদের ব্যাপারে আল্লাহর কথা সত্য প্রমাণিত হয় এবং আল্লাহ তাআলা তাদের উপর এমন লোক চাপিয়ে দেন, যারা

তাদেরকে ধ্বংস করে ছাড়ে। এ কথাই বিভিন্ন জাতির উত্থান পতনের ইতিহাস দ্বারা প্রমাণিত। যেসব লোক দেশের সার্বিক অবস্থার উপর গভীর দৃষ্টি রাখেন, তারা এর বিপদাপদকে বিপর্যয়ের মূল কারণের দিকে সম্পৃক্ত করেন। সে কারণ প্রারম্ভিক সময়ের দিক থেকে যত পুরাতন ও দুর্বলই হোক না কেন।

কোন দেশের সর্বশেষ শাসক, যার হাতে সে দেশের পতন ঘটে, তা মূলতঃ দীর্ঘদিনের এক গুপ্ত ব্যাধির বহিঃপ্রকাশ মাত্র। এতদসত্ত্বেও আল্লাহ ও তার বান্দার সম্মুখে তার অবশ্যই জবাবদিহি করতে হয়। কারণ সে এই ব্যাধি প্রতিহত করার ও প্রতিকার করার সামর্থ্য রাখত। কিন্তু সে তা কমানোর পরিবর্তে তার গতি আরও বাড়িয়ে দিয়েছে, এমনকি সেই ব্যাধি উম্মতের জন্য আসমানী বিপদ থেকেও মারাত্মক রূপ ধারণ করে। কারণ অসুস্থ দেহ এমন সকল উপসর্গ দ্বারাও প্রভাবিত হয়, সুস্থ দেহ যেগুলোর দ্বারা প্রভাবিত হয় না, তাই যেহেতু সে শাসক অকল্যাণের প্রতীক হয়, তাই তার দুনিয়া ও আখিরাতে লাঞ্ছনার জন্য এ কারণই যথেষ্ট।

প্রকৃতপক্ষে সে দিনই আলজেরিয়ার মরণ ব্যাধি শুরু হয়, যেদিন ইস্তাম্বুলে (উসমানী খেলাফতের রাজধানী) নৈতিক অবক্ষয় শুরু হয়। যার ফলে শাসক মহল নষ্ট হয়ে যায়, বিগড়ে যায় এবং হুসাইন পাশার মত শাসকদের মহামারীতে শুধুমাত্র আলজেরিয়াই নয় বরং দেশের বিভিন্ন অঞ্চল প্রভাবিত হয় এবং সেখানে অন্যায়, অত্যাচার, নৈরাজ্য ও ধ্বংস ছড়িয়ে পড়ে।"

যাই হোক ১২৪৬ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সিস সাম্রাজ্যবাদ আলজেরিয়ায় তার বিষাক্ত পাঞ্জা বসিয়ে দেয়। দেশের বিভিন্ন অংশে প্রতিরোধ আন্দোলন চালু থাকে। কিন্তু ফ্রান্স সকলকে পরাভূত করে তার মজবুত শাসন প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়।

আলজেরিয়াতে ফ্রান্স সাম্রাজ্যবাদ আলমে ইসলামের নিকৃষ্টতম সাম্রাজ্যবাদ বলে প্রমাণিত হয়। সেখানে মুসলমানদের ব্যক্তি জীবনেও দ্বীনের উপর আমল করা অতীব দুস্কর হয়ে পড়ে। অনেক মসজিদ শহীদ করে দেওয়া হয়। অনেক মসজিদ গীর্জায় পরিণত করা হয়। ইসলামী ইলেম তো দূরের কথা আরবী ভাষা শিক্ষার উপরেও নিষেধাজ্ঞা জারি

করা হয়। আরবী ভাষার পরিবর্তে ফ্রান্সিস ভাষাকে দেশের রাষ্ট্রীয় ভাষা করে মানুষকে সে ভাষা শুধু শেখার ব্যাপারেই নয় বরং জীবনের সকল ক্ষেত্রে সেই ভাষায় কার্যসম্পাদন করতে বাধ্য করা হয়। এখানে বিস্তর ফ্রান্সিস লোকের বসতি স্থাপন করা হয়। এমনকি খৃষ্টবাদীরা আলজেরিয়া শহরের সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপের যাবতীয় নৈতিক অধঃপতনের ব্যাধি আমদানী করে সেখানে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। এমনকি বড় বড় শহরে মুসলিম নারীদের কাফেরের সঙ্গে বিবাহেরও বহু ঘটনা ঘটে।

কিন্তু আল্লাহ তাআলাই তাঁর দ্বীনের রক্ষক। জুলুম অত্যাচারের এই পরিবেশেও আল্লাহর কিছু বান্দা দ্বীনী ইলেম বক্ষে ধারণ করে রাখেন। তাঁরা লুকিয়ে লুকিয়ে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার কাজ চালু রাখেন। তাঁরা অনেক লোককে দ্বীনী ইলেমে দক্ষতা অর্জনের জন্য তিউনিসিয়ার যাইতুনা বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং মিসরের আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রেরণ করতে থাকেন। অপরদিকে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ফ্রান্সিস সাম্রাজ্যবাদের বিপক্ষে আন্দোলনের ধারা অব্যাহত থাকে। এমনকি প্রায় ১০০/১২৫ বছর পর এ আন্দোলন সুসংগঠিত একটি স্বাধীনতা আন্দোলনের রূপ নেয় এবং বহু বছরের সশস্ত্র সংগ্রাম জানমালের বিরাট কুরবানী করার পর ফ্রান্সিস সাম্রাজ্যবাদের হাত থেকে এদেশ স্বাধীনতা লাভ করে।

কিন্তু আলমে ইসলামের অন্যান্য আন্দোলনের মত এখানেও সাম্রাজ্যবাদের দীর্ঘ এই সময়ে ফ্রান্সিস সাম্রাজ্যবাদ এদেশে এমন লোকদের পূর্ণ একটি প্রজন্ম প্রস্তুত করেছিল, যারা রাজনৈতিকভাবে যতই সাম্রাজ্যবিরোধী হোক না কেন মতাদর্শ ও কর্মের দিক থেকে পূর্ণরূপে ইউরোপের রঙ্গে রঞ্জিত ছিল। এরা তাদের চিন্তায় চেতনায় অভ্যস্ত ছিল। স্বাধীনতা আন্দোলনে যেখানে বিরাট সংখ্যক ইসলামী মন-মানসিকতার একনিষ্ঠ মুজাহিদীন ছিলেন, সেখানে বিরাট একটি অংশ এমনও ছিল, যাদের দৃষ্টিতে স্বাধীনতার লক্ষ্য ধর্মীয় অনুশাসন প্রতিষ্ঠা নয় বরং তাদের লক্ষ্য শুধুমাত্র নিজের জাতিকে বহিঃআক্রমণের হাত থেকে স্বাধীন করা ছিল। আল্লাহ তাআলার অপার অনুগ্রহে এ

আন্দোলনে যদিও স্বাধীনতা অর্জিত হয়, কিন্তু এদের বেশীর ভাগই ছিল দ্বিতীয় দলের লোক। সুতরাং তারা দেশকে সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র করার ঘোষণা দেয় এবং সমাজতন্ত্রের নীতিমালারই অনুসরণ শুরু করে। ফলে তাদের আশার গুড়ে ছাই পড়ে, যারা এখানে ইসলাম প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জানমালের কুরবানী করেছিল।

প্রথম দিকে অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশের মত এখানেও ধর্মীয় বিষয়ে কিছুটা কঠোর নীতি অবলম্বন করা হয়, কিন্তু দীর্ঘদিন চেষ্টা করেও জনসাধারণের সহজাত চাহিদা খুব একটা দমন করতে না পেরে ক্রমান্বয়ে এ বিষয়ে নম্রতা অবলম্বন করতে বাধ্য হয়। আলহামদুলিল্লাহ, বর্তমানে কিছুটা নরম নীতির উপর আমল করা হচ্ছে। অপরদিকে জনসাধারণ বিশেষতঃ তরুণ যুবকদের মাঝে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ইসলামকে বাস্তবায়ন করার এক প্রবল জাগরণ সৃষ্টি হচ্ছে। এই জাগরণ কঠোর হস্তে দমন করাও অসম্ভব, অবশ্য সরকার একে একটি রাজনৈতিক সমস্যাও মনে করছে। তাই সরকার এমন এক মাঝামাঝি নীতি অবলম্বন করছে যে, সেখানে আলমে ইসলামের মোটামুটিভাবে নাম উচ্চারণও করা হবে। আবার তাদের বাস্তব জীবনে আন্দোলন কোন বিপদের কারণও হবে না। আলমে ইসলামের প্রায় সকল সরকারই এই নীতি অবলম্বন করে আছে। কোথাও কম কোথাও বা বেশী।

সার্বিক প্রতিক্রিয়া

প্রায় এক সপ্তাহকাল সময় আমি আলজেরিয়ায় অবস্থান করি। এ স্বল্পকালীন সময়ে দেশের ধর্মীয়, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা গভীর দৃষ্টিতে অধ্যয়ন করা তো সম্ভবপর ছিল না, কিন্তু হালকা দৃষ্টিতে কিছু অভিজ্ঞতা অবশ্যই জন্মেছে। আমার সেই অভিজ্ঞতা সংক্ষেপে বর্ণনা করছি।

১. এমন মনে হয়েছে যে, সরকার সহজ সরল জীবনাচার গ্রহণ এবং দেশীয় পণ্যের ভিতর সীমাবদ্ধ থাকার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা চালিয়েছে। প্রয়োজনাধিক আরাম আয়েশ, বিলাস-ব্যাসন ও লৌকিকতার দিকে মনোযোগ আরোপ করেনি। দেশীয় শিল্পজাত দ্রব্যের প্রাধান্য দানের

নীতি অবলম্বন করা হচ্ছে। আলজেরিয়ার তিনতলা বিশিষ্ট বিরাট একটি ডিপার্টমেন্টাল ষ্টোরে গেলাম। সেখানে অধিকাংশ সামগ্রীই দেশের তৈরী দেখতে পেলাম। মহিলাদের কাপড়ের দোকানগুলোতে দেশে উৎপাদিত সাধারণ মানের কাপড় বিক্রয় হচ্ছে, যার সবগুলোই সুতী কাপড় ছিল এবং মহিলারাও তা খুব উৎসাহ নিয়ে ক্রয় করছে। শিশুদের খেলনার বিরাট দীর্ঘ ও বিস্তৃত একটি দোকানে দেশী প্লাষ্টিকের তৈরী সব ধরনের খেলনা বিক্রি হচ্ছে। ভিনদেশী কোন খেলনা আমার দৃষ্টিগোচর হয়নি।

সারাদেশে ফ্যানের প্রচলন খুব কম, অথচ কোন কোন জায়গায় গরমও অনুভব হল। আমরা যে হোটেলে অবস্থান করছিলাম, তাতে না ফ্যান ছিল, না এয়ারকণ্ডিশন। জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম, দেশে ফ্যান তৈরীর কোন কারখানা নেই এবং অন্য দেশ থেকে ব্যবহারিক সামগ্রী আমদানী করার ব্যাপারে অনুৎসাহিত করা হয়। তাই ফ্যানের ব্যবস্থা করা হয়নি। তাছাড়া এত অসহ্য গরমও হয় না যে, ফ্যান না হলেও নয়।

২. গ্রামেও বহু উন্নয়নমূলক কাজ হয়েছে বলে মনে হল। বাজায়া যাওয়ার পথে আমি প্রচুর গ্রাম দেখেছি। গ্রামগুলোর গলিপথেও কোন কাঁচাঘর দৃষ্টিগোচর হয়নি। সব ঘর পাকা। ঘরের বাসিন্দাদেরকেও আরামে-আনন্দে ও স্বচ্ছল মনে হল।

৩. নিম্নশ্রেণীর জনসাধারণ এবং শিক্ষার্থী তরুণদের মধ্যে ধর্মীয় প্রবণতা খুব বেশী কিন্তু বড় শহরগুলোতে প্রতি পদক্ষেপে শরাবখানা এবং নাইট ক্লাব ইত্যাদি পরিবেশকে মারাত্মক নষ্ট করছে। তিন শ্রেণীর মহিলা পরিলক্ষিত হল—এক, একদম প্রাচীন ধাচের বোরকা পরিহিতা, যাদের শুধুমাত্র একটি চোখ খোলা থাকে। এদের বেশীর ভাগই বয়স্কা মহিলা। এদের সংখ্যাও অনেক। দুই, এমন নারী, যাদের হাত এবং চেহারা ছাড়া সারাদেহ ঢিলা গাউনে আবৃত। এদের বেশীর ভাগ কলেজের ছাত্রী, এবং তিন, পূর্ণ পাশ্চাত্য ধাচের পোশাক, স্কার্ট প্রভৃতি পরিহিতা অর্ধউলঙ্গ নারী। এদের সংখ্যাও কম নয়।

শুনেছি শিক্ষাকেন্দ্রগুলোতে ক্রমানুয়ে দ্বিতীয় প্রকারের পোশাক প্রসার লাভ করছে এবং যুবকদের মাঝে তাদের ঐতিহ্যময় ধর্মীয় জীবন-যাপন পদ্ধতির দিকে প্রত্যাবর্তনের প্রবণতা অতি দ্রুত বিস্তার লাভ করছে।

আল্লাহ তাআলা এই প্রবণতাকে অধিক শক্তিশালী করুন ও উন্নতি দান করুন। যে সকল লোক এ পথে প্রচেষ্টা চালাচ্ছে তাদেরকেও স্বীয় শক্তি ও সাহায্য দ্বারা ভূষিত করুন। আমীন—ছুম্মা আমীন।

পুনরায় কায়রোতে

রাজধানী আলজেরিয়াতে দুদিন অতিবাহিত করার পর ১৪০৬ হিজরীর শাওয়াল মাসে একদিন সকাল ৭টায় আলজেরিয়ান এয়ারলাইন্সের প্লেনে আরোহণ করি। ৪ ঘন্টা উত্তর আফ্রিকার উপকূলীয় অঞ্চলে উড্ডয়ন করে মিসরীয় সময় অনুযায়ী ১২টার কাছাকাছি প্লেন কায়রোতে পৌছে। কায়রো পৌছার পূর্বেই প্লেন থেকে সুয়েজ খাল এবং মিসরের পিরামিড স্পষ্ট দৃষ্টিগোচর হয়।

পাকিস্তানী দূতাবাসের কয়েকজন লোক অভ্যর্থনার জন্য বিমানবন্দরে পৌছে ছিলেন। আলহামদুলিল্লাহ, তাদের চেষ্টায় এয়ারপোর্টের ঘাঁটিগুলো সহজে পার হয়ে যাই। প্লেন থেকে অবতরণের পর যে কোনভাবে জুমার নামায পাওয়া প্রথম চিন্তা ছিল। কিন্তু বিমানবন্দর থেকে বের হয়ে জানতে পারলাম, নামায শেষ হয়ে গেছে। সৌদী আরব প্রভৃতি রাষ্ট্রের মত এখানকার নিয়মও এই যে, সূর্য পশ্চিমে ঢলে যাওয়ার পরপরই জুমার নামায আদায় করা হয়। শহরের সকল মসজিদে প্রায় একই সময়ে জুমুআ হয়ে যায়। ফলে কোন এক মসজিদে জুমুআ না পেলে অন্য কোথাও আর পাওয়া যায় না। তাই জোহর পড়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না।

এবারে রামসিস হেলটানে আমাদের অবস্থান হয়েছিল। নীলনদের তীরে আততাহরীর ময়দানের অদূরে শহরের মাঝে ২৬ তলা বিশিষ্ট একটি হোটেলের ৪র্থ তলায় আমি অবস্থান করছিলাম। কক্ষের একটি দরজা ছোট একটি বারান্দার দিকে খোলে। এই বারান্দা থেকে একেবারে সম্মুখে নীলনদের দৃশ্য দেখা যাচ্ছিল। নদীতে সবসময় নৌকা চলাচল করছিল এবং এর পশ্চাতে ৮০ তলা বিশিষ্ট 'বুরুজ আল কাহেরা' ভবন এবং কায়রোর অন্যান্য আকাশচুম্বী ভবনসমূহ সদূর বিস্তৃত দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল।

মিসরের পাকিস্তানী রাষ্ট্রদূত রাজা জাফরুল হক সাহেব যদিও

আমাকে প্রস্তাব করেছিলেন যে, কায়রোতে পথপ্রদর্শনের জন্য দূতাবাসের একজন অফিসারকে তিনি আমার সঙ্গে দিবেন। কিন্তু অধমের সম্মুখে যে কাজ ছিল, তার জন্য প্রয়োজন ছিল রুচিসম্পন্ন একজন স্থানীয় আলেমের। আল্লাহর শোকর, মিসরের অনেক আলেমের সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল, কিন্তু এ কাজের জন্য অকৃত্রিম সম্পর্কেরও প্রয়োজন ছিল। এরূপ সম্পর্ক ছাড়া কারো নিকট সাহায্য চাওয়াও আমার পছন্দ হচ্ছিল না।

আল্লাহর হুকুম, আমার মুহতারাম দোস্ত ডঃ হাসান আবদুল লতিফ শাফেয়ী, যিনি কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়ের দারুল উলূম বিভাগের প্রফেসর এবং ইসলামাবাদের জামিআ ইসলামিয়ার সহ-সভাপতি, তিনি তখন কায়রোতেই ছিলেন। আলজেরিয়া যাওয়ার পথে যখন আমি কায়রোতে অবস্থান করি, তিনি তখন শহরের বাইরে থাকায় তার সঙ্গে সাক্ষাত হয়নি। কিন্তু আমি তাকে আমার ফেরার প্রোগ্রাম জানিয়েছিলাম। তাই তিনি অধমের ফেরার প্রতীক্ষায় ছিলেন। আসরের নিকটবর্তী সময়ে তিনি হোটেলে চলে আসেন। আল্লাহ তাআলা তাঁকে উত্তম পুরস্কার দান করুন। তখন থেকে আমার কায়রো ত্যাগ করা পর্যন্ত তিনি অনবরত মনে প্রাণে আমার সঙ্গে ছিলেন। তার সঙ্গদানের ফলে কায়রোতে আমার অবস্থান অত্যন্ত মনোরম, ফলপ্রসূ এবং চিত্তাকর্ষক হয়। আসর নামাযান্তে তার সঙ্গে কায়রোর গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক স্থানসমূহ দেখার জন্য যাই।

রওজা ও তার বিজয়কাহিনী

সর্বপ্রথম আমরা কায়রোর ঐতিহাসিক মহল্লা 'রওজা'তে যাই। মিসর বিজয়ের পূর্বে বরং তার পরেও উখশীদীদের যুগ পর্যন্ত একে জাযীরায়ে মিসর বলা হত। কারণ স্থানটি নীলনদের মাঝে অবস্থিত। এর একদিকে কায়রো ও অপরদিকে জিযা, সেই জিযা যার মধ্যে মিসরের পিরামিড অবস্থিত।

হযরত আমর ইবনুল আস (রাযিঃ) যখন মিসরে দূর্গ অবরোধ করেন, তখন কিবতী সম্রাট মকুকাস দূর্গ থেকে বের হয়ে এই উপদ্বীপের দূর্গে আশ্রয় নিয়েছিলেন এবং এখানে পৌছার পর নীলনদের উপর নির্মিত পুল ভেঙ্গে দিয়েছিলেন। যেন মুসলমানগণ নদী অতিক্রম করে উপদ্বীপে পৌছতে সক্ষম না হয়। অপরদিকে তিনি রোম সম্রাট কায়সারের নিকট মুসলমানদের উপর পশ্চাত থেকে আক্রমণ চালানোর জন্য সাহায্য চেয়ে পাঠান।

এমতাবস্থায় মুকুকাস হযরত আমর ইবনে আস (রাযিঃ)এর নিকট তার দূত মারফত পত্র প্রেরণ করে জানান যে, তুমি একদিকে নীল নদ এবং অপরদিকে রোমান সেনাবাহিনীর ঘেরাও এর মধ্যে এসে গেছো। তোমাদের লোকসংখ্যাও কম। এখন তোমরা আমাদের হাতে কয়েদীর মত অবস্থাতে আছো। তাই মঙ্গল চাইলে সন্ধির কথাবার্তার জন্য তোমার কিছু লোক আমার নিকট পাঠিয়ে দাও।

হযরত আমর ইবনুল আস (রাযিঃ)এর নিকট সে দূত পৌছলে তিনি তাকে তৎক্ষণাত পত্রের উত্তর না দিয়ে দুদিন দু'রাত মেহমান হিসেবে নিজের কাছে রেখে দিলেন। উদ্দেশ্য ছিল, তারা যেন মুসলমানদের দিবা-রাত্রির কর্মকাণ্ড, আবেগ-অনুভূতি ও চিন্তা-চেতনা সম্পর্কে সম্যক অবগতি লাভ করতে পারে। অপরদিকে দূতের ফিরতে বিলম্ব দেখে মকুকাস আশংকা করছিল যে, এরা দূত হত্যা বৈধ মনে করে কিনা? এই চিন্তা-ভাবনার মাঝে দু' দিন পর দূত হযরত আমর ইবনুল আস (রাযিঃ)এর এই পয়গাম নিয়ে পৌছে যে, আমাদের পক্ষ থেকে পূর্বে অবহিত করা সেই তিন কথার বাইরে চতুর্থ কোন কথা গ্রহণযোগ্য নয়। (অর্থাৎ ইসলাম, জিযিয়া, নইলে যুদ্ধ)।

পয়গাম শোনার পর মকুকাস দূতকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তুমি মুসলমানদেরকে কেমন দেখলে? উত্তরে দূত জানাল—

"আমি এমন এক জাতিকে দেখেছি, যার প্রত্যেক ব্যক্তির নিকট মৃত্যু জীবনের চেয়ে প্রিয়। তাঁরা শান-শওকতের চেয়ে বিনয় ও নম্রতাকে পছন্দ করে। তাঁদের কারো অন্তরে দুনিয়ার প্রতি কোনরূপ মোহ বা লালসা নেই। তাঁরা মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসে আহার গ্রহণ করে। তাঁদের আমীর তাঁদের একজন সাধারণ মানুষের মত থাকে। তাঁদের মধ্যে উঁচু নিচুর কোন ভেদাভেদ বোঝা যায় না। তাদের মনিব ও ক্রীতদাসকে

পার্থক্য করা যায় না। নামাযের সময় তাঁদের কেউই পিছিয়ে থাকে না। তাঁরা স্বীয় অঙ্গ পানি দ্বারা ধৌত করে এবং অতি বিনয় সহকারে নামায আদায় করে।"

বলা হয় যে, এ উত্তর শ্রবণ করে সম্রাট মকুকাস বলেছিলেন ঃ এঁদের সম্মুখে পর্বত বাধা হয়ে দাঁড়ালেও তাঁরা তা ভূপাতিত করবে। তাঁদের সঙ্গে কেউই লড়তে সক্ষম হবে না।

অবশেষে পারস্পরিক পয়গাম আদান প্রদানের পর হযরত আমর বিন আস (রাযিঃ) হযরত উবাদা বিন ছামিত (রাযিঃ)এর নেতৃত্বে দশ সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রতিনিধি দল মকুকাসের নিকট প্রেরণ করেন। সম্রাট মকুকাস তাদেরকেও ধনদৌলতের লোভ দেখানোর চেষ্টা করে এবং তাঁদের অসচ্ছল জীবনের উল্লেখ করে এ নিশ্চয়তা দিতে প্রচেষ্টা চালায় যে, তাদের প্রস্তাব গ্রহণ করে মুসলমানরা সচ্ছল হবে। কিন্তু প্রতি উত্তরে হযরত উবাদা বিন ছামিত (রাযিঃ) যে বিরল বিস্ময়কর ভাষণ দিয়েছিলেন তা সাহাবায়ে কেরামের বিশাল ঈমান ও একীন, তাঁদের ইস্পাতসম সংকল্প ও দৃঢ়তা, দুনিয়ার প্রতি অনিহা, আখিরাতের চিন্তা, শাহাদাতের আকাংখার কথা যাদুময়ী আঙ্গিকে চিত্রিত করে। সেই ঐতিহাসিক ভাষণের কিছু অংশ নিম্নে প্রদত্ত হল ঃ

"দুনিয়ার সম্পদের মোহে অথবা দুনিয়ার বিস্তর অঞ্চল আয়ত্ব করার উদ্দেশ্যে আমরা আল্লাহর শত্রুদের সঙ্গে লড়াই করি না। আমাদের অবস্থা এই যে, আমাদের কারও এ বিষয়ে কোন পরোয়া নেই যে, তার নিকট স্তূপীকৃত স্বর্ণ রয়েছে ; অথবা তার মালিকানাধীন এক দিরহামের অধিক কিছু নাই। বিধায় আমাদের প্রত্যেকের জন্য দুনিয়ায় সর্বসাকুল্যে যে সম্পদটুকু দরকার, তা এতটুকু খাবার, যা দ্বারা সে সকাল সন্ধ্যার ক্ষুধা নিবৃত্ত করতে পারে এবং একটি চাদর, যা দ্বারা সে দেহ আবৃত করতে পারে। এর অধিক কোন সম্পদ যদি আমাদের নাও থাকে তাহলেও আমাদের জন্য যথেষ্ট, অথবা যদি এর অধিক স্তূপীকৃত স্বর্ণও থাকে, তবুও আমরা আল্লাহর পথেই তা ব্যয় করবো, কেননা দুনিয়ার নেয়ামত প্রকৃত নেয়ামত নয় এবং দুনিয়ার সচ্ছলতাও প্রকৃত সচ্ছলতা নয়। প্রকৃত নেয়ামত ও সচ্ছলতা আখেরাতে হবে। এ কথারই নির্দেশ আল্লাহ

পাক আমাদেরকে দিয়েছেন। আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে এ কথাই শিখিয়েছেন। তিনি আমাদেরকে ক্ষুধা নিবারণ পরিমাণ আহার এবং দেহ আবৃত করা পরিমাণ বস্ত্রের অধিক সম্পদ অর্জনের চিন্তায় না পড়তে উপদেশ দিয়েছেন। আমাদের প্রকৃত চিন্তা ও মনোযোগ আমাদের রবকে সন্তুষ্ট করা ও তাঁর শত্রুদের সাথে জিহাদ করা। তাছাড়া আপনি আমাদেরকে ভীতি প্রদর্শনের চেষ্টা করছেন যে, আমাদের মোকাবেলার জন্য রোমান সৈন্য একত্রিত হচ্ছে। তারা সংখ্যায় অনেক এবং আমাদের মধ্যে তাদের মোকাবেলা করার মত শক্তি নেই। আমি কসম করে বলছি, এ সংবাদ আমাদের ভয়ের কারণ নয়। এর দ্বারা আমাদের সাহস সামান্যও হ্রাস পাবে না। আপনার এ কথা যদি বাস্তবে ঠিকও হয়, (যে রোমের বিরাট সৈন্যবাহিনী আমাদের মোকাবেলার জন্য আসছে।) তাহলে আল্লাহর কসম ! এই সংবাদে আমাদের জিহাদের তৃষ্ণা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। এজন্য যে, এত বড় বাহিনীর সঙ্গে আমাদের মোকাবেলা হলে, আল্লাহর সম্মুখে আমাদের জবাবদিহি আরও সহজ সাধ্য হবে। যদি আমাদের প্রত্যেক সদস্য তাদের সঙ্গে লড়াই করতে করতে নিহত হয়, তাহলে আমাদের জন্য আল্লাহতাআলার সন্তুষ্টি এবং তাঁর জান্নাত লাভের সম্ভাবনা অধিকতর নিশ্চিত হবে। আমাদের জন্য এর চেয়ে অধিক প্রিয় চক্ষু শীতলকারী আর কোন বস্তু নেই। আমাদের প্রত্যেকে সকাল-সন্ধ্যা দু'আ করে যে, আল্লাহ তাআলা আমাকে শাহাদত নসীব করুন এবং আমাকে যেন আমার দেশ এবং পরিবার পরিজনের নিকট ফিরে যেতে না হয়। আমরা আমাদের দেশে ছেড়ে আসা কোন বিষয় নিয়ে ভাবি না। কারণ আমাদের প্রত্যেকে নিজ পরিবার পরিজনকে স্বীয় প্রভুর নিরাপত্তায় ছেড়ে এসেছে। আমাদের ভবিষ্যত নিয়েই আমাদের একমাত্র চিন্তা। বাকী রইল আপনার সেই কথা যে, আমরা দুঃখ, কষ্ট ও অসচ্ছল জীবন যাপন করছি। তাহলে এ বিষয়ে আপনি নিশ্চিত থাকুন যে, আমরা এত সচ্ছল ও প্রশস্ত জীবন যাপন করছি, যার সমান কোন সচ্ছলতা হতে পারে না। সমগ্র বিশ্ব আমাদের মালিকানাধীন হলেও আমাদের নিকট বর্তমানে যতটুকু আছে আমরা এর অধিক রাখার প্রত্যাশী হব না।

বিধায় এখন আপনি আপনার বিষয় চিন্তা করে বলে দিন, আপনি আমাদের প্রস্তাবিত তিন বিষয়ের কোনটিতে রাজী আছেন। আমাদের সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য হল উক্ত তিন বিষয় ছাড়া অন্য কোন কথায় কস্মিনকালেও আমরা রাজী হব না বা এছাড়া আপনার কোন কথা গ্রহণ করব না। তাই আপনি এই তিন বিষয়ের যে কোন একটিকে গ্রহণ করুন এবং অন্যায় লোভ–লালসা ত্যাগ করুন। এটিই আমার আমীরের নির্দেশ। আমাদের আমীরুল মুমিনীনের নির্দেশও তাঁর উপর এই। এ অঙ্গীকারই আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের থেকে গ্রহণ করেছেন। তারপর হযরত উবাদা বিন সামিত (রাযিঃ) এই তিন বিষয়ের বিশ্লেষণ করেন, দ্বীন ইসলামের বিস্তারিত পরিচিতি তুলে ধরেন এবং মুসলমান হওয়ার সুফল স্পষ্ট বুঝিয়ে দেন। সম্রাট মকুকাস হযরত উবাদা (রাযিঃ)এর বক্তব্য শোনার পর কর প্রদানের সিদ্ধান্ত নেওয়ার দিকে ধাবিত হচ্ছিলেন। কিন্তু তার সঙ্গীরা এতে রাজী হয়নি। পরিশেষে তাদের সঙ্গে যুদ্ধ হয় এবং আল্লাহ তাআলা মুসলমানদেরকে বিজয় দান করেন।

মোটকথা এ উপদ্বীপ এভাবে বিজয় হয়, পরবর্তীতে এখানে মুসলমানগণ পানির জাহাজ নির্মাণের একটি কারখানা প্রতিষ্ঠা করেন, যে কারণে একে 'জাজিরাতুস্ সনায়া' (শিল্পনগরী)ও বলা হয়ে থাকে। মিসরে জাহাজ নির্মাণের এটিই প্রথম কারখানা, যা ৫৪ হিজরীতে প্রতিষ্ঠা করা হয়। পরবর্তীতে উখশীদী শাসকদের আমলে বিনোদনের জন্য এখানে একটি বাগান তৈরী করা হয়। তাই তাকে 'রওজা' বলা হয়ে থাকে। আরবীতে বাগানকে রওজা বলে। পরবর্তীতে এখানে অনেক পরিবর্তন হতে থাকে। এক পর্যায়ে এটি কায়রোর একটি মহল্লা হয়ে যায়। আমার পথপ্রদর্শক ডঃ হাসান আশ শাফেয়ী বলেন, এখানকার আলেমদের মধ্যে প্রসিদ্ধ আছে যে, আল্লামা জালালউদ্দীন সুয়ূতী (রহঃ)ও এ মহল্লাতেই বসবাস করতেন।

সুরুল উয়ূন (ঝর্ণার প্রাচীর)

রওজা থেকে বের হয়ে আমরা সুরুল উয়ূন এর নিকট দিয়ে অতিক্রম করি। এটি নগর প্রাচীর সদৃশ একটি প্রাচীর। যা নীল নদ থেকে শুরু করে

পূর্বদিকে সালাহউদ্দীন দূর্গ পর্যন্ত চলে গেছে। প্রাচীরটি সুলতান সালাহউদ্দীন নির্মাণ করেন। এর মাধ্যমে নীল নদের তাজা পানি দূর্গ পর্যন্ত পৌছানো ছিল তার উদ্দেশ্য। তাই নীলনদের তীরে পানি উত্তোলনের জন্য বিশেষ ধরনের একটি সেচযন্ত্র স্থাপন করা হয়। তার মাধ্যমে নদীর পানি প্রাচীরের উপর উঠানো হত। প্রাচীরের উপর একটি নহর তৈরী করা হয়েছিল, সে নহরের মাধ্যমে এ পানি দূর্গ পর্যন্ত পৌছানো হত। পানি পৌছানোর এ ধারা এখন আর নেই। তবে প্রাচীরটি এখনও রয়ে গেছে। একে সুরুল উয়ূন বা ঝর্ণার প্রাচীর বলা হয়।

সুলতান সালাহউদ্দীন আইয়ূবীর দূর্গ

আমরা প্রাচীর ধরে সম্মুখে চলতে থাকি। একটি দূর্গে গিয়ে প্রাচীরটি শেষ হয়েছে। দূর্গটি সুলতান সালাহউদ্দীন আইয়ুবী ৫৭২ হিজরীতে নির্মাণ করেন এবং একে তার বাসস্থান হিসেবে ব্যবহার করেন। দূর্গটি একটি পাহাড়ের উপর অবস্থিত হওয়ায় প্রাচীন আরবী গ্রন্থসমূহে 'কিলআতুল জাবাল' নামে তার উল্লেখ পাওয়া যায়। এর প্রাচীরের দৈর্ঘ্য ২৭ হাজার ৩০০ গজ উল্লেখ করা হয়েছে। দীর্ঘদিন পর্যন্ত এই দূর্গ মিসরের রাজধানীরূপে ব্যবহৃত হতে থাকে। সরকারী অফিস আদালত এই দূর্গের মধ্যেই ছিল। পরবর্তীতে মুহাম্মাদ আলী পাশা এখানে একটি শানদার জামে মসজিদ ও অন্যান্য ভবন নির্মাণ করেন। তখন হতে দূর্গটি সেনা ছাউনীরূপে ব্যবহার হতে থাকে। সম্প্রতি তা পর্যটকদের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়।

আল মুকাত্তাম পাহাড়

সুলতান সালাহউদ্দীন (রহঃ)এর এই দূর্গ যে পাহাড়ের উপর অবস্থিত, তা মূলতঃ পাহাড়ের একটি খণ্ড। একে জাবালুল মুকাত্তাম বলা হয়। কোন কোন বর্ণনা থেকে জানা যায়, এটি একটি পবিত্র পাহাড়। এই পাহাড়ের পাদদেশে হযরত মূসা (আঃ) এবাদত করতেন। এতদ্ব্যতীত কোন কোন ঐতিহাসিকের বর্ণনায় হযরত লাইছ বিন সা'আদ (রহঃ) থেকে একথাও উল্লেখ আছে যে, হযরত আমর ইবনে আস (রাযিঃ) যখন

এই অঞ্চল জয় করেন, তখন মিসরের সাবেক সম্রাট মকুকাস ৭০ হাজার স্বর্ণমুদ্রার বিনিময়ে এই পাহাড় ক্রয় করার প্রস্তাব দেন এবং এর কারণ এই বলেন যে, আমাদের কিতাবসমূহে এই পাহাড় সম্পর্কে অনেক ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। তাতে লেখা আছে যে, এই পাহাড়ে জান্নাতের বৃক্ষ উৎপন্ন হবে। হযরত আমর ইবনে আস (রাযিঃ) পত্র মারফত হযরত উমর (রাযিঃ)এর সঙ্গে পরামর্শ করেন। তখন হযরত উমর (রাযিঃ) বলেন, মুসলমানগণ জান্নাতের বৃক্ষের অধিক হকদার। তাই এখানে মুসলমানদের জন্য কবরস্থান বানিয়ে দাও। তাই একে কবরস্থান বানানো হয়। কিন্তু বর্ণনাটি সনদের দিক থেকে সংরক্ষিত নয়। মহান আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

ইমাম শাফেয়ী (রহঃ)এর মাজারে

এ সকল স্থান হয়ে অবশেষে আমরা ইমাম শাফেয়ী (রহঃ)এর মাজারে যাই। পুরো মহল্লাটিকে হযরত ইমাম শাফেয়ী (রহঃ)এর নামেই হাররাতুশ শাফেয়ী বলা হয়। এখানে ইমাম শাফেয়ী (রহঃ)এর মাজারের উপর জাকজমকপূর্ণ বিশাল এক ইমারত নির্মাণ করা হয়েছে। তৎসংলগ্ন বড় একটি মসজিদ রয়েছে। সেই মসজিদে আমরা মাগরিবের নামায আদায় করি। নামাযান্তে মাজারে হাযির হই। আমাদের মত ছাত্রদের দিন রাত হযরত ইমাম শাফেয়ী (রহঃ)এর বিভিন্ন উক্তি এবং তার ফেকাহ সংক্রান্ত মতামতের সঙ্গে যেই পরিমাণ সম্পর্ক রয়েছে, তার ভিত্তিতে হযরতের সঙ্গে ভক্তি, ভালোবাসা ও হৃদ্যতার সম্পর্ক থাকা একটি স্বভাবজাত বিষয়। দীর্ঘদিন ধরে হযরতের পবিত্র মাজার যিয়ারত করার ইচ্ছা ছিল। আল্লাহর শোকর, আজ তা পূর্ণ হল। মাজারের সম্মুখে কিছুক্ষণ বসলাম। শান্তি ও পুলকের এক অপূর্ব অবস্থা সেখানে বিরাজ করছিল। সেই ফকীহুল উম্মাতের এই মাজার, যাঁর পথনির্দেশ ও আলোকবর্তিকায় কোটি কোটি মুসলমান ফয়েযপ্রাপ্ত হয়েছে এবং হচ্ছে। হানাফী ফেকাহ এর পর তাঁর ফেকাহই বিশ্বে সর্বাধিক প্রচলিত। যাঁর মুকাল্লিদ বিশ্বের চতুর্দিকে বিস্তৃত।

ইয়ামানের এক সাইয়্যেদ পরিবারে তাঁর জন্ম হয়। তিনি আর্থিক

দিক থেকে ছিলেন অসচ্ছল। বাল্যকালেই পিতৃস্নেহ মাথার উপর থেকে উঠে যায় এবং তখনই তাঁর মাতা তাঁকে মক্কা মুকাররমা নিয়ে আসেন। সেখানেই তিনি বড় হন, ইলেম হাসিল করেন। মদীনা তায়্যিবাতে ইমাম মালেক (রহঃ)এর নিকট গমন করে তাঁর নিকট থেকে পরিপূর্ণ জ্ঞান লাভ করেন। তারপর তিনি নাজরানে এক সরকারী পদে অধিষ্ঠিত হন। সেখানে তিনি দীর্ঘদিন পর্যন্ত পূর্ণ সততা ও আমানতদারীর সঙ্গে অর্পিত দায়িত্ব পালন করতে থাকেন। কিন্তু বড়দের পরীক্ষাও বড় হয়ে থাকে। তৎকালীন খলীফা (হারুনুর রশীদ) আলী (রাযিঃ)এর বংশের ইয়ামানের কিছু অধিবাসী সম্পর্কে সংবাদ পান যে, তারা কেন্দ্রের বিপক্ষে বিদ্রোহের প্রস্তুতি নিচ্ছে। নাজরানের গভর্নর শত্রুতা পোষণ করে ইমাম শাফেয়ী (রহঃ)এর সম্পর্কেও প্রপাগাণ্ডা ছড়ায় যে, আলী বংশের সেই লোকদের সঙ্গে এরও গভীর সম্পর্ক রয়েছে। খলীফা তাঁর উপর সন্দিহান হন এবং সে সব লোকের সঙ্গে ইমাম শাফেয়ী (রহঃ)কেও গ্রেফতার করে বাগদাদে নিয়ে আসেন।

সে সময় ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)এর শাগরেদ হযরত ইমাম মুহাম্মাদ বিন হাসান শাইবানী (রহঃ)এর হারুনুর রশীদের দরবারে বিশেষ প্রভাব ও প্রতিপত্তি ছিল। ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) যখন হারুনুর রশীদের দরবারে পৌঁছলেন, তখন তিনি তাঁর উপর আরোপিত অভিযোগ প্রত্যাহারের বিষয়ে ইমাম মুহাম্মাদ (রহঃ)এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন যে, তিনি আমার সম্পর্কে অবগত আছেন। হারুনুর রশীদ ইমাম মুহাম্মাদ (রহঃ)এর নিকট তাঁর সম্পর্কে জানতে চাইলে ইমাম মুহাম্মাদ (রহঃ) বলেন, আমি তাঁর সম্পর্কে অবগত আছি। তিনি একজন বড় আলেম। তাঁর সম্পর্কে যে অভিযোগ উত্থাপন করা হয়েছে, তাঁর মত ব্যক্তি দ্বারা একাজ হতে পারে না। তখন হারুনুর রশীদ ইমাম মুহাম্মাদ (রহঃ)কে বললেন ঃ আপনি তাঁকে সঙ্গে নিয়ে যান। আমি তাঁর সম্পর্কে ভেবে দেখছি। এভাবে বিদ্রোহের অভিযোগে ইয়ামান থেকে গ্রেফতারকৃত লোকদের মধ্য থেকে একমাত্র ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) রক্ষা পান।

১৮৪ হিজরীর এই ঘটনা। তখন ইমাম শাফেয়ী (রহঃ)এর বয়স ৩৪ বছর। এই পরীক্ষা গ্রহণে আল্লাহ তাআলার অনেক হিকমতও ছিল।

ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) নাজরানের সরকারী পদে নিযুক্ত ছিলেন। এই পরীক্ষার ফলে পুনরায় তাঁর নিখাঁদ ইলমের দিকে মনোযোগী হওয়ার সুযোগ ঘটে। তাছাড়া ইমাম মুহাম্মাদ (রহঃ)এর সঙ্গে এ পর্যন্ত শুধুমাত্র জানাশোনাই ছিল। এখন তিনি যথানিয়মে তাঁর নিকট পাঠ গ্রহণে ব্রতী হন। তাঁর মাধ্যমে ইরাকবাসীর ইলেম তাঁর মধ্যে স্থানান্তর হয়। ফলে ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) হেজাজ ও ইরাক উভয় দেশের ইলেম অর্জন করতে সক্ষম হন।

ইমাম মুহাম্মাদ (রহঃ) ইমাম শাফেয়ী (রহঃ)কে খুব শ্রদ্ধা করতেন। একবার ইমাম মুহাম্মাদ (রহঃ) অশ্বারোহণ করে খলীফার দরবারে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে ইমাম শাফেয়ী (রহঃ)কে তাঁর সাক্ষাতে আসতে দেখেন। ইমাম মুহাম্মাদ (রহঃ) তাঁকে দেখে নীচে নেমে আসেন এবং তাঁর গোলামকে খলীফার নিকট গিয়ে তাঁর ওজর পেশ করতে বলেন। ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) একথাও বলেছিলেন যে, আমি অন্য কোন সময় আসবো। ইমাম মুহাম্মাদ (রহঃ) তাতে রাজি হননি, বরং তাঁকে সঙ্গে নিয়ে নিজ গৃহে ফিরে আসেন।

এভাবে প্রায় দু' বছর তিনি বাগদাদ অবস্থান করেন এবং ইমাম মুহাম্মাদ (রহঃ)এর নিকট ইলম হাসিল করে পুনরায় মক্কায় ফিরে যান। ৯ বছর সেখানেই অবস্থান করেন। সে সময় তিনি উসূলে ফেকাহ সংকলনের চিন্তা শুরু করেন। ১৯৫ হিজরীতে পুনরায় তিনি বাগদাদ চলে আসেন এবং সেখানে 'আর রিসালা' গ্রন্থ সংকলন করেন। শেষ বয়সে মিসরের গভর্নরের দাওয়াতে তিনি মিসর গমন করেন। পরিশেষে ২০৪ হিজরীর রজব মাসে তিনি ইন্তেকাল করেন।

আল্লাহ তাআলা হযরত ইমাম শাফেয়ী (রহঃ)কে বিশেষ বিশেষ নেআমতে ধন্য করেন। তিনি সাত বছর বয়সে পূর্ণ কুরআন শরীফ হিফজ করেন। দশ বছর বয়সে মুআত্তা ইমাম মালিক (রহঃ) পূর্ণ মুখস্ত করেন। তীর নিক্ষেপে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়। নিজেই বলতেন ঃ 'আমি দশটি তীর নিক্ষেপ করলে দশটি তীরই তার সঠিক নিশানায় গিয়ে বিদ্ধ হবে।' এমন যাদুময়ী আঙ্গিকে তিনি কুরআন পাঠ করতেন যে, শ্রোতাদের কান্না এসে যেত। খতীবে বাগদাদী (রহঃ) ইমাম শাফেয়ী (রহঃ)এর সমসাময়িক

জনৈক ব্যক্তির উক্তি উদ্ধৃত করেছেন যে, 'আমরা কখনো কাঁদতে চাইলে একে অপরকে বলতাম, চল, মুত্তালিবী বংশের সেই যুবকের নিকট গিয়ে কুরআন তেলাওয়াত শুনি। আমরা তাঁর নিকট গেলে তিনি নিজে কুরআন তেলাওয়াত আরম্ভ করতেন। মানুষ তাঁর সম্মুখে মাটিতে গড়াগড়ি খেত। কাঁদতে কাঁদতে চিৎকার করতে থাকত। তখন তিনি তেলাওয়াত বন্ধ করতেন।

আল্লাহ তাআলা তাঁকে ইলেমের সঙ্গে সঙ্গে বাগ্মীতাও দান করেছিলেন। তাই তিনি সে যুগের বড় বড় আলেমদের সঙ্গে জ্ঞান শীর্ষক বিষয়ে বিতর্ক করেন। কোন কোন বিতর্কের ঘটনা তিনি স্বীয় প্রণীত 'কিতাবুল উম' গ্রন্থেও উল্লেখ করেছেন। এতদসত্ত্বেও তাঁর এখলাছ এমন নিখাঁদ ছিল যে, তিনি বলেন, আমি যখন যার সঙ্গেই বিতর্কে লিপ্ত হয়েছি, আমার মনে কখনও বিপক্ষের ভুল প্রমাণিত হোক এ অভিলাষ জাগেনি।

ইমাম শাফেয়ী (রহঃ)এর রচিত গ্রন্থসমূহ ইলমে ফেকাহ এবং ইলমে হাদীসের ভিত্তি। তাঁকে উসূল শাস্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়। অথচ তিনি বলেন, 'আমার ইচ্ছে হয় মানুষ এ সকল গ্রন্থ পাঠ করে উপকৃত হোক। কিন্তু এগুলোকে আমার দিকে সম্পৃক্ত না করুক। যাঁর এখলাছ ছিল এমন নিখাঁদ, তাঁর ইলেমে বরকত কেন হবে না? সমগ্র বিশ্বে তাঁর ইলেম কেনই বা বিস্তার লাভ করবে না? অনেকে তো তাঁকে তৃতীয় হিজরী শতাব্দীর মুজাদ্দিদ সাব্যস্ত করেছেন। আল্লাহ পাক তাঁর উপর অনন্ত রহমত বর্ষণ করুন।

হযরত লাইস বিন সা'দ (রহঃ)এর মাজারে

ইমাম শাফেয়ী (রহঃ)এর মসজিদের সীমানাতেই ইমাম শাফেয়ী (রহঃ)এর মাজারের অদূরে হযরত লাইস বিন সা'দ (রহঃ)এর মাজার। তিনিও উঁচু স্তরের মুজতাহিদ ইমামদের অন্যতম। তাঁর সম্পর্কে ইমাম শাফেয়ী (রহঃ)এর এমন উক্তিও রয়েছে যে, লাইস বিন সা'দ (রহঃ) ইমাম মালিক (রহঃ) অপেক্ষা বড় ফকীহ ছিলেন। তবে তাঁর সাগরিদগণ তাঁর ফেকাহ সংরক্ষণে ব্রতী হননি।

হাদীস বর্ণনাতেও তিনি ইমাম ছিলেন। এমন প্রখর স্মরণশক্তির অধিকারী ছিলেন যে, তাঁর জনৈক সাগরিদ একবার তাঁকে বলল, কখনও আপনার মুখে এমন হাদীসও শুনতে পাই, যা আপনার কিতাবসমূহে নেই। তখন হযরত লাইস বিন সা'দ (রহঃ) বলেন, 'তোমরা কি এই মনে করেছো যে, আমার বক্ষে ধৃত সকল হাদীস আমার কিতাবসমূহে লিপিবদ্ধ করে দিয়েছি। বাস্তব এই যে, আমার সিনায় রক্ষিত সকল হাদীস গ্রন্থাকারে লিখলে সে সকল গ্রন্থ বহনের জন্য এই সওয়ারী যথেষ্ট হবে না।

ইলম ও আমলের সঙ্গে ধনদৌলতেও আল্লাহ পাক তাঁকে ভূষিত করেছিলেন। কথিত আছে, তার বার্ষিক আয় ছিল ২০ হাজার থেকে ২৫ হাজার স্বর্ণমুদ্রা। কিন্তু দয়া–দাক্ষিণ্য, বদান্যতা ও আল্লাহর পথে ব্যয় করতে এত বেশী অগ্রগন্য ছিলেন, তাঁর সমগ্র জীবনে কখনো যাকাত ফরয হয়নি। বরং তাঁর পুত্র বলেন ঃ বছর শেষে কখনো তিনি ঋণী হয়ে যেতেন। কুতায়বা বলেন, তিনি প্রত্যহ তিনশ' মিসকিনকে দান করতেন।

একবার কয়েকজনলোক হযরত লাইস বিন সা'দ (রহঃ) থেকে কিছু ফল ক্রয় করে। ক্রয়ান্তে তাদের নিকট মূল্য বেশী মনে হওয়ায় তারা তা ফিরিয়ে দিতে আসে। হযরত লাইস বিন সা'দ (রহঃ) ফল ফেরত নিয়ে তাদের টাকা দিয়ে দেন। তারপর তাদের প্রস্থানকালে তিনি নিজের লোকদেরকে বললেন ঃ তাদেরকে পঞ্চাশটি স্বর্ণমুদ্রা অধিক দিয়ে দাও। তখন তাঁর পুত্র এর হেতু জানতে চাইলে তিনি বলেন, আল্লাহ আমাকে মাফ করেন। ফল ক্রয় করার মধ্যে তাদের একটি আশা ছিল, (তা পূর্ণ হয়নি) তাই আমি তাদের আশার কিছু প্রতিদান দিতে চাই।

একদা এক মহিলা তাঁর নিকট এসে নিজের সন্তানের রোগের কথা জানালো এবং তার জন্য অল্প মধুর প্রয়োজনের কথা বলল। হযরত লাইস বিন সা'দ (রহঃ) একটি মশক (চর্ম নির্মিত পানির পাত্র) ভর্তি করে মধু দিয়ে দেন। তাতে ১২০ রিতিল (প্রায় ৬০ সের) মধু ছিল। সে মহিলা তা নিতে বার বার অস্বীকার করছিল এবং বলছিল ঃ আমার তো সামান্য মধুর দরকার। কিন্তু হযরত লাইস বিন সা'দ (রহঃ) তার কথার প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করে মশক তার বাড়ীতে পৌছে দেন।

সর্বশ্রেণীর লোকের মধ্যে তাঁর মর্যাদা এত বেশী ছিল যে, তৎকালীন শাসকগণও তাঁর কথা নতশিরে মেনে নিত এবং তাঁর পরামর্শ নিয়ে কাজ করাকে নিজের সৌভাগ্য মনে করত। একবার খলীফা মনসুর তাঁকে মিসরের গভর্নরের পদ পেশ করেন। কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানান।

দৈনিক তাঁর চারটি মজলিস হত। একটি আমীর ও শাসকদের জন্য। তখন তারা এসে রাজ্য পরিচালনার বিষয়ে তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করত। দ্বিতীয়টি ছিল, হাদীসের ছাত্রদের জন্য। তৃতীয় মজলিস ছিল ফতওয়া প্রদানের জন্য। চতুর্থ মজলিস জনসাধারণের প্রয়োজন পূরণ করার লক্ষ্যে ও তাদের সাহায্য দানের উদ্দেশ্যে হত। লোকেরা নিজ নিজ প্রয়োজনের কথা বলত এবং তিনি তা পুরা করার চেষ্টা করতেন।

হযরত লাইস বিন সা'দ (রহঃ) ১৫ই শাবান ১৭৫ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। তাঁর জানাজা নামাযে এত বেশী লোকের সমাগম হয় যে, খালিদ বিন আবদুস সালাম বলেন, আমি এমন জানাযা অন্য কারো দেখিনি।

আলহামদুলিল্লাহ ! অতি মর্যাদাবান মুহাদ্দিস, ফকীহ এবং আল্লাহর এই অলীর মাজার যিয়ারত করার এবং তাঁকে সালাম পেশ করার সৌভাগ্য নসীব হয়। যাঁকে অনেকে আবদালের মধ্যে গণ্য করেছেন।

শাইখুল ইসলাম যাকারিয়া আনসারী (রহঃ)এর মাজারে

হযরত ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) এবং ইমাম লাইস বিন সা'দ (রহঃ)এর মাজারের পার্শ্ববর্তী এলাকাকে কুরাফা বলা হয়। এখানেই হযরত শাইখুল ইসলাম যাকারিয়া আল আনছারী (রহঃ)এর মাজার অবস্থিত। তিনি ৯ম হিজরী শতাব্দীর মশহুর মুহাদ্দিস, ফকীহ এবং বুযুর্গ ব্যক্তি ছিলেন। তাঁকে সে যুগের মুজাদ্দিদও বলা হয়। তিনি হাফেজ ইবনে হাজার (রহঃ) এবং আল্লামা ইবনে হুমাম (রহঃ)এর সাগরিদ। তিনি আল্লামা ইবনে হাজার হাইসামী এবং শায়েখ আবদুল ওয়াহহাব শারানী (রহঃ)এর মত ব্যক্তিত্বদের ওস্তাদ। তিনি সে সকল ব্যক্তিদের অন্যতম যাদের নিয়ে মিসরবাসী সত্যিকার অর্থে গর্ব করতে পারে।

তিনি মিসরে অত্যন্ত দরিদ্র অবস্থায় ইলম হাসিল করেন। তিনি

নিজেই বলেন ঃ আমি আল–আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ে ইলম হাসিল করতাম। কোন কোন সময় এমন অবস্থা হত যে, কোন খাবার না পাওয়ায় আমি উযুখানার নিকট পড়ে থাকা তরমুজের খোসা উঠিয়ে নিয়ে তা ভাল করে ধুয়ে খেয়ে ক্ষুধা নিবারন করতাম। পরবর্তীতে এক আল্লাহর ওলী যিনি যাতা চালানোর কাজ করতেন, তিনি আমার দেখাশোনা করতে থাকেন। তিনি আমার পানাহার ও অন্যান্য প্রয়োজন মিটানোর ব্যবস্থা করেন। সে সময়েই তিনি আমাকে সুসংবাদ দিয়েছিলেন যে, ইনশাআল্লাহ তুমি দীর্ঘদিন বেঁচে থাকবে এবং শাইখুল ইসলাম হবে। এছাড়া তোমার জীবদ্দশাতেই তোমার সাগরিদও শাইখুল ইসলামের পদে অধিষ্ঠিত হবে।

পরবর্তীতে আল্লাহ তাআলা তাঁকে সত্যিই বিরাট মর্যাদা দান করেন। দ্বীনের খেদমতের এমন কোন দিক ছিল না, যেদিকে শাইখুল ইসলাম (রহঃ)এর হাত পড়েনি। ধনদৌলতও এত অধিক ছিল যে, প্রত্যহ ৩ হাজার দিরহাম আমদানী হত। ইমাম শাফেয়ী (রহঃ)এর মাজার সংলগ্ন মাদরাসাতে অধ্যাপনার পদকে তৎকালীন যুগে ইলমের সর্বোচ্চ পদ মনে করা হত। শাইখুল ইসলাম যাকারিয়া (রহঃ) দীর্ঘদিন সেই পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। সে যুগের মিসরের গভর্নর মালিক আশরাফ কাতিবায়ে তাঁর খুব ভক্ত ছিল। সে শাইখুল ইসলাম সাহেবকে প্রধান বিচারপতির পদ পেশ করে। প্রথম দিকে তিনি তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন, কিন্তু কাতিবায়ে পীড়াপীড়ি করতে থাকে, এমনকি একবার তিনি বলেন, আপনি চাইলে আপনার সম্মুখে আমি পায়ে হেঁটে আপনার খচ্চর হাঁকিয়ে নিয়ে আপনার বাড়ী পর্যন্ত যাব। অবশেষে অধিক পীড়াপীড়ির পর তিনি এই পদ গ্রহণ করেন এবং দীর্ঘদিন পর্যন্ত বিচার বিভাগের দায়িত্ব পালন করেন।

বিচারপতি থাকাকালীন তিনি নির্জনে ও লোকালয়ে কাতিবায়ের প্রতিবাদ করতেন। জুমার খুৎবাদান কালে তার উপস্থিতিতে তাকে দোষারোপ করতেন। তিনি নিজেই বলেন ঃ কোন কোন সময় খুৎবার মধ্যে আমার সমালোচনা ও প্রতিবাদ এত কঠোর হত যে, আমার ধারণা হত, কাতিবায় আমার সঙ্গে হয়ত আর কথাই বলবে না, কিন্তু নামাযান্তে

সর্বপ্রথম সে আমার সঙ্গে মিলিত হত, হস্তচুম্বন করত এবং জাযাকাল্লাহু খায়র (আল্লাহ আপনাকে উত্তম প্রতিদান দিক) বলত।

একদিন আমি তাকে অত্যন্ত শক্ত কথা বলি। এমনকি তার চেহারা হলুদ হয়ে যায়। তখন আমি তাকে বললাম, জনাব! খোদার কসম, আপনার প্রতি স্নেহশীল হয়েই আপনার সঙ্গে আমি এরূপ আচরণ করি। আপনি যখন আপনার প্রভুর নিকট পৌছবেন, তখন আমার শোকর আদায় করবেন। আল্লাহর কসম, আপনার এ দেহ জাহান্নামের কয়লা হোক তা আমি পছন্দ করি না।

শেষ জীবনে অন্ধ হয়ে যাওয়ায় তাঁকে বিচারপতির পদ থেকে অবসর প্রদান করা হয়। কারো কারো মতে বাদশাহ তাঁর উপর অসন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে বরখাস্ত করেন। বরখাস্ত হওয়ার পর তিনি ঐ পদ গ্রহণের উপর অনুতাপ করতেন। তাঁর সাগরেদ শায়েখ আবদুল ওয়াহহাব সারানী (রহঃ) বলেন ঃ একদিন তিনি আমাকে বললেন ঃ 'বিচারপতির পদ গ্রহণ করা আমার ভুল হয়েছিল। কারণ আমি ইতিপূর্বে লোকদের দৃষ্টির আড়ালে ছিলাম। এই পদ গ্রহণ করায় মানুষের মাঝে খ্যাতি ছড়িয়ে যায়। তখন আমি বললাম ঃ হযরত! কোন কোন ওলীআল্লাহ থেকে আমি শুনেছি, বিচারপতির পদ আপনার প্রকৃত অবস্থাকে আড়াল করে রেখেছে। মানুষের মাঝে আপনার দুনিয়া বিমুখতা, পরহেজগারী ও কাশফ প্রভৃতির খ্যাতি প্রসিদ্ধি লাভ করতে ছিল। তখন শায়েখ বললেনঃ আলহামদুলিল্লাহ, বেটা! তুমি আমার বোঝা হালকা করে দিলে। তিনি নফল দানের প্রতি খুব গুরুত্বারোপ করতেন, অনেক অভাবী মানুষের প্রাত্যহিক ব্যয়ের অর্থ নির্ধারণ করে রেখেছিলেন। গোপনে দান করার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করতেন। তাঁর সামনে অন্য লোক থাকা অবস্থায় কোন অভাবী মানুষ এলে তাকে বলতেন, পরে এসো। এতে করে মানুষের মধ্যে তিনি দান কম করেন বলে প্রসিদ্ধ হয়ে যায়।

হযরত শাইখুল ইসলাম (রহঃ) একশত বৎসরের অধিক হায়াত লাভ করেন। শেষ জীবনে তিনি অন্ধ হয়ে যান। কিন্তু শেষ সময় পর্যন্ত তিনি অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, রচনা, সংকলন, যিক্‌র ও ইবাদতের কাজ পরিপূর্ণরূপে চালু রাখেন। হযরত শায়েখ আবদুল ওয়াহহাব শারানী

(রহঃ) তাঁর প্রশংসায় বলেন ঃ তিনি ফেকাহ ও তাসাওউফ উভয় তরীকার স্তম্ভ ছিলেন। আমি বিশ বছর তাঁর খেদমত করেছি। এই দীর্ঘ সময়ে আমি কখনও তাঁকে উদাসীনতায় বা কোন অনর্থ কাজে লিপ্ত হতে দেখিনি, দিনে বা রাত্রিতে কখনই নয়। তিনি বৃদ্ধ হওয়ার পরও ওয়াক্তিয়া নামাযের সুন্নাতগুলো সর্বদা দাঁড়িয়ে আদায় করতেন। তিনি বলতেন, আমি আমার নফসকে অলসতায় অভ্যস্ত করতে চাই না।

কোন ব্যক্তি তাঁর নিকট দীর্ঘ সময় কথা বলতে থাকলে তিনি বলতেনঃ জলদি কর। তুমি অনেক সময় নষ্ট করছ। আল্লামা শারানীই বলেন ঃ আমি যখন তাঁর নিকট কোন কিতাব পড়তাম, তখন কোন কোন সময় কিতাবের শব্দ ঠিক করতে মাঝপথে কিছু দেরী হত। তিনি এই সময়কেও নষ্ট করতেন না। এই বিরতির সময় হালকা আওয়াজে আল্লাহ আল্লাহ যিকিরে লিপ্ত থাকতেন।

তিনি বিভিন্ন জ্ঞানবিষয়ক চল্লিশোর্ধ বিরাট বিরাট গ্রন্থ রচনা করেন। তার মধ্যে শাফেয়ী ফেকাহ বিষয়ক 'আসনাল মাতালিব' এবং 'শরহুল বাহজা' অধিক প্রসিদ্ধ। এ সকল কিতাব আজ পর্যন্ত শাফেয়ী মাজহাবের ফেকাহ বিষয়ক প্রামাণ্য উৎস বলে গণ্য হয়ে আসছে। হাফেজ সাখাবী (রহঃ) তাঁর সমসাময়িকদের প্রশংসার ব্যাপারে অতি সাবধানী একজন বুযুর্গ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি হযরত শায়েখ সম্পর্কে বলেন ঃ আমাদের পরস্পরের মধ্যে অত্যন্ত ভালবাসা এবং হৃদ্যতা বিদ্যমান। তাঁর পক্ষ থেকে অব্যাহত দু'আ ও প্রশংসা বাক্যে আমি সর্বদা আনন্দ পেতে থাকি। যদিও সকলের ব্যাপারেই তাঁর আচরণ এমনই কিন্তু সেখানে আমার অংশ অত্যাধিক।

আল্লামা ইবনুল আম্মাদ বলেন যে, শাইখুল ইসলাম যাকারিয়া (রহঃ)এর ছাত্রের সংখ্যা এত অধিক বিস্তৃত ছিল যে, তাঁর সময়ে এমন কোন আলেম ছিল না, যিনি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তাঁর ছাত্র হওয়ার সৌভাগ্য লাভ না করেছে। বরং তাঁর 'সনদ' (বর্ণনা পরম্পরা) সে যুগের সর্বাধিক উঁচু পর্যায়ের ছিল। তাই তাঁর ছাত্রত্ব বরণের জন্য মানুষ বিশেষভাবে চেষ্টা চালাত। কোন কোন সময় এমনও হয়েছে যে, এক ব্যক্তি প্রত্যক্ষভাবে তাঁর মুখ থেকে ইলম হাসিল করার পর সেই ব্যক্তিই

এমন লোকদের থেকেও ইলম অর্জন করেছে, যার এবং শাইখুল ইসলামের মাঝে সাতজনের মধ্যস্থতা রয়েছে। অন্য কোন আলেমের এই বৈশিষ্ট্য নেই।

ফুসতাত অঞ্চল

ইমাম শাফেয়ী (রহঃ)এর মাজার সংলগ্নে মিসরের অনেক বড় একটি মাদরাসা ছিল। বড় বড় আলেমগণ সেখানে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার কাজ সম্পাদন করতেন। এখনও শিক্ষাদানের এবং যিকিরের কিছু কিছু সমাবেশ সেখানে রয়েছে। কিন্তু মাদরাসারূপে নিয়মতান্ত্রিক কোন শিক্ষাকেন্দ্র এখন আর নেই। আমরা মাজারে ফাতেহা পাঠ করে যখন অবসর হই, তখন মসজিদে উচ্চস্বরে যিকিরের একটি সমাবেশ চলছিল। কিন্তু এসব বস্তু এখন প্রথাসর্বস্ব হয়ে আছে। ইত্তিবায়ে সুন্নাতের গুরুত্ব, যা যিকির ও ইবাদতের মূল প্রাণ, তা খুব কমই দৃষ্টিগোচর হয়। আল্লাহর নিকটই সকল অভিযোগ।

আমার পথপ্রদর্শক ডঃ শাফেয়ী বললেন ঃ এখান থেকে অল্প দূরেই হযরত ওকবা বিন আমের (রাযিঃ)এরও মাজার রয়েছে। কিন্তু পথ এমন যে, সেখানে গাড়ী যাওয়ার ব্যবস্থা নেই। পায়ে হেঁটে যেতেও কোথাও কোথাও প্রতিবন্ধক রয়েছে। তাছাড়া অন্ধকারও ঘনিয়ে এসেছে। কিন্তু এত সন্নিকটে এসেও মহিমান্বিত এক সাহাবীর মাজারে উপস্থিত না হওয়া অকৃতজ্ঞতাই বটে। অধম তাই সেখানে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করল। তিনি তখন জামে ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) থেকে পথপ্রদর্শকরূপে এক ব্যক্তিকে সঙ্গে নিলেন। তার পথপ্রদর্শনে আমরা সম্মুখে চলতে থাকি। এ সম্পূর্ণ অঞ্চল আধুনিক যুগের সভ্য ভাষায় একটি পশ্চাৎপদ অঞ্চল। কাঁচা পাকা গৃহ, ভাঙ্গাচোরা পথ, প্রায়ই সংকীর্ণ ও অন্ধকার গলি, কিন্তু এ অঞ্চলটি আমার নিকট শহরের উন্নত অঞ্চল থেকে অধিক প্রিয় মনে হল। প্রথমতঃ এজন্য যে, মূল শহরের তুলনায় এখানকার লোকদের মধ্যে ধর্মপরায়ণতা অধিক প্রবল দেখা যাচ্ছিল এবং প্রাচীন ঐতিহ্যময় নীতি নৈতিকতার ঝলক অনুভূত হচ্ছিল। দ্বিতীয়তঃ ডঃ শাফেয়ী বললেন ঃ এটি কায়রোর প্রাচীনতম অঞ্চল। ফুসতাত শহর ছিল এরই সন্নিকটে।

ফুসতাতের নাম শুনতেই অতীত ঘটনাবলীর একটি জীবন্ত চিত্র মন-মস্তিষ্কে ভেসে ওঠে। কারণ এটি ছিল সাহাবায়ে কেরামের আবাদ করা শহর। বর্তমানে যে জায়গায় কায়রো শহর অবস্থিত, মূলতঃ এখানে অতীতে পর্যায়ক্রমে তিনটি মহানগর আবাদ হয়। বর্তমান কায়রো নগরীর পশ্চিমাঞ্চলে হযরত মূসা (আঃ)এর যুগে নীল নদের পশ্চিম তীরে ফেরআউনের রাজধানী ছিল। তবে সেকালে একে 'মানাফ' শহর বলা হত। বর্তমানের 'জিযা' সে জায়গাতেই অবস্থিত এবং পিরামিড সেখানেই অবস্থিত। বহু শতাব্দী মানাফ শহর আবাদ ছিল। কিন্তু বুখতে নসরের আক্রমণে তা বিরান ভূমিতে পরিণত হয়।

পরবর্তীতে যখন সিকান্দার মাকদুনী মিসর জয় করেন, তখন তিনি রাজধানী এ অঞ্চলে না রেখে রোম সাগরের উপকূলীয় অঞ্চলে স্থানান্তর করেন। তিনি সেখানে নতুন করে একটি শহর আবাদ করেন, যাকে আজ পর্যন্ত তার নামেই ইস্কান্দারিয়া বলা হয়। ইস্কান্দারিয়াও বহু শতাব্দীকাল মিসরের রাজধানী ছিল। হযরত উমর (রাযিঃ)এর খেলাফতকালে হযরত আমর ইবনে আস (রাযিঃ) যখন মিসর আক্রমণ করেন, তখন পর্যন্ত সম্রাট মকুকাস এর রাজধানী ইস্কান্দারিয়াই ছিল। সে যুগে বর্তমান কায়রো নগরী বড় কোন শহর ছিল না। বরং এটি একটি সেনাদূর্গ ছিল মাত্র। আক্রমণকারীদের অগ্রাভিযান প্রতিহত করার জন্য তা নির্মাণ করা হয়েছিল। হযরত আমর ইবনে আস (রাযিঃ) এবং তাঁর সঙ্গীগণ মিসরের সম্মুখের কয়েকটি অঞ্চল জয় করার পর এ দূর্গ অবরোধ করেন। ছয় মাস কাল এ অবরোধ চলতে থাকে। এ দীর্ঘ সময়ে দূর্গে আরোহণের কোন পথ পাওয়া যায় না। পরিশেষে ছয় মাস অতিবাহিত হওয়ার পর হযরত যুবায়ের বিন আউয়াম (রাযিঃ) দূর্গের একস্থানে পা রাখার সুযোগ দেখতে পেয়ে সেখানে একটি সিঁড়ি বসিয়ে দেন এবং সঙ্গীদেরকে সম্বোধন করে বলেন ঃ 'আমি আমার জান আল্লাহর নিকট উপঢৌকনরূপে পেশ করছি। আমার অনুগমনে ইচ্ছুক ব্যক্তি আমার সঙ্গে চলে আসুন।' একথা বলে হযরত যুবায়ের (রাযিঃ) সিঁড়িতে আরোহণ করতে থাকেন। এভাবে সর্বপ্রথম হযরত যুবায়ের (রাযিঃ) দূর্গ প্রাচীরের উপরে উঠে যান। এতে করে অন্যান্যদের মধ্যেও

সাহস সঞ্চার হয়। তাঁরাও সিঁড়ি বসিয়ে প্রাচীরে আরোহণ করতে থাকেন। পরিশেষে আল্লাহ পাক বিজয় দান করেন। মকুকাস পালিয়ে এসে উপদ্বীপের দূর্গগুলোতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। যার বিবরণ 'রওজা' নামক স্থানের পরিচিতি পর্বে ইতিপূর্বে লিখেছি। আল্লামা হামভী (রহঃ) লেখেন, দূর্গে আরোহণের জন্য হযরত যুবায়ের (রাযিঃ)এর ব্যবহৃত সিঁড়ি ৩৯০ হিজরী পর্যন্ত 'অর্দান' বাজারের একটি গৃহে সংরক্ষিত ছিল, পরে একটি অগ্নিকাণ্ডে তা বিনষ্ট হয়।

হযরত আমর ইবনে আস (রাযিঃ) দূর্গে আক্রমণ করার জন্য বৃহৎ একটি তাঁবু দূর্গের সম্মুখে স্থাপন করেন। যখন তিনি সম্মুখে অগ্রসর হওয়ার জন্য তাঁবুটি তুলে সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার ইচ্ছা করেন, তখন তাঁবু উঠাতে গিয়ে দেখতে পান যে, একটি কবুতর তার উপর ডিম দিয়েছে। কবুতরটি ডিমের উপর বসে আছে। তাঁবু উঠিয়ে নিলে ডিমটি নষ্ট হবে তাই হযরত আমর ইবনে আস (রাযিঃ) বললেন ঃ 'কবুতরটি আমাদের তাঁবুতে আশ্রয় নিয়েছে। তাই ডিম ফেটে বাচ্চা হয়ে তা উড়ার যোগ্য হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তাঁবুটি অমনি রেখে দাও।' নির্দেশ মোতাবেক তাঁবুটি পূর্বাবস্থায় রেখে দেওয়া হয়। হযরত আমর ইবনে আস (রাযিঃ) কয়েকজন লোককে সেখানে রেখে ইস্কান্দারিয়া অভিমুখে যাত্রা করেন।

ইস্কান্দারিয়া জয় করতেও ছয়মাস সময় লাগে। পরিশেষে আল্লাহ তাআলা বিজয় দান করেন। তখন আমর ইবনে আস (রাযিঃ) ইস্কান্দারিয়াকে নিজেদের বাসস্থান বানানোর জন্য আমীরুল মুমিনীন হযরত উমর (রাযিঃ)এর নিকটে অনুমতি প্রার্থনা করেন। হযরত উমর ফারুক (রাযিঃ) উত্তরে লেখেন ঃ 'হে মুসলমানগণ! এমন কোন স্থানকে নিজেদের বাসস্থান বানিও না, যেখানে আমার এবং মুসলমানদের মাঝে কোন সাগর বা সমুদ্র প্রতিবন্ধক হবে। বলা বাহুল্য যে, মুসলমানরা ইস্কান্দারিয়াকে বাসস্থান বানালে মাঝখানে সাগর প্রতিবন্ধক হত। তাই হযরত আমর ইবনে আস (রাযিঃ) সঙ্গীদের সাথে পরামর্শকালে প্রশ্ন করলেন ঃ ' আমরা কোন স্থানকে আমাদের বাসস্থান বানাবো। তখন কেউ কেউ পরামর্শ দিলেন, 'হে নেতা! আমাদের সেখানেই যাওয়া উচিত, যেখানে আপনার তাঁবু স্থাপিত হয়েছে। সেখানে পানি-নীলনদ

আমাদের অদূরে হবে এবং আমরা মরুভূমিতেও থাকতে পারব। সুতরাং হযরত আমর ইবনে আস (রাযিঃ) এ পরামর্শ গ্রহণ করেন এবং সে স্থানে ফিরে আসেন যেখানে তাঁবু স্থাপিত ছিল। এখানে তিনি মুসলমানদের জন্য একটি শহরও আবাদ করেন। তখন পর্যন্ত শহরের কোন নাম রাখা হয়নি। তাই লোকেরা কিছুদিন পর্যন্ত নিজের ঠিকানা বলার জন্য সেই ফুসতাতের (তাঁবুর) উদ্ধৃতি দিয়ে বলতেন ঃ 'আমার ঠিকানা ফুসতাতের (তাঁবুর) ডান দিকে। কেউ বলতেন, আমার স্থান ফুসতাতের (তাঁবুর) বাম দিকে। ক্রমান্বয়ে শহরটির নাম ফুসতাতই প্রসিদ্ধ হয়ে যায়। এটিকে মিসরে মুসলমানদের রাজধানী বানানো হয়। বহু শতাব্দীকাল এটি ইসলামী তাহজীব তামাদ্দুনের কেন্দ্র ছিল। শহরটি নীলনদের পূর্ব উপকূলে আবাদ ছিল।

তারপর ৩৫৮ হিজরীতে উখশীদীদের শাসনামলে ফাতেমী বাদশাহ মুঈয লিদ্বীনিল্লাহ জাওহার নামীয় তার এক ক্রীতদাসকে দিয়ে ফুসতাত আক্রমণ করে তা পদানত করেন। ফুসতাতের অধিবাসীরা জাওহার তাদের সঙ্গে ফুসতাত শহরে অবস্থান না করার শর্তে তার সঙ্গে সন্ধি করে। সুতরাং এ শর্ত পুরা করে জাওহার ফুসতাতের বাইরে অবস্থান করেন। সেখানে একটি দুর্গ নির্মাণ করেন এবং 'আল কাহেরা' নামকরণ করেন। ফাতেমী বংশের শাসনামলে দুর্গটি সরকারী কার্যালয় এবং আমীরদের বাসস্থানরূপে ব্যবহৃত হত। তবে সাধারণের বসবাস ফুসতাত শহরেই বহাল ছিল। সুলতান সালাহউদ্দীন আইয়ুবীর শাসনামলে তিনি আল কাহেরা দুর্গ সাধারণের বসবাসের জন্য উন্মুক্ত করে দেন এবং তিনি নিজে আল জাবাল দুর্গে অবস্থান করতে থাকেন। যার আলোচনা ইতিপূর্বে করা হয়েছে। তখন থেকে কায়রো নিয়মতান্ত্রিক জনবসতিপূর্ণ নগরীর রূপ লাভ করে। নগরীটি ফুসতাত শহরের উত্তর পশ্চিমে নীলনদের পূর্ব তীরে আবাদ ছিল। পঞ্চম হিজরী শতাব্দীতে অগ্নিকাণ্ড ও আরও কিছু কারণে ফুসতাত শহর ধ্বংস হয়ে যায় এবং শুধুমাত্র কায়রো অবশিষ্ট থাকে, যা অদ্যাবধি বিদ্যমান এবং তা বিস্তৃত হতে হতে শুধু ফুসতাত অঞ্চলই নয় বরং জাযীরা, জিযা এবং ফেরাউনের যুগের মানাফ অঞ্চলকেও স্বীয় আঁচল তলে নিয়ে নিয়েছে।

যাই হোক হযরত ইমাম শাফেয়ী (রহঃ)এর মাজার থেকে হযরত উকবা বিন আমের (রাযিঃ)এর মাজারে যেতে বেশীর ভাগ সেই অঞ্চলই অতিক্রম করতে হয়, একসময় যেখানে ফুসতাত শহর আবাদ ছিল। এখানে প্রতি পদক্ষেপে প্রাচীনত্বের নিদর্শন সুস্পষ্ট। অনেক পুরাতন গৃহ বিরান পড়ে আছে। জায়গায় জায়গায় প্রাচীর ঘেরা কবরস্থান রয়েছে। নাজানি এ অঞ্চল কত আলেম, ফকীহ, মুহাদ্দিস এবং আল্লাহর ওলী ও মুজাহিদদের কেন্দ্র ছিল। সেই ভাঙ্গা পথে আমি চলছিলাম আর কল্পনার চোখ প্রথম শতাব্দীর মুসলমানদের এখানে চলাফেরার দৃশ্য অবলোকন করছিল। অবশেষে আমাদের পথপ্রদর্শক আমাদেরকে ছোট একটি মসজিদের দরজায় নিয়ে গিয়ে উপস্থিত হলো। যার আশেপাশে জীর্ণশীর্ণগৃহ ছাড়া অন্য কিছু ছিল না। সেই মসজিদের একাংশে হযরত উকবা বিন আমের (রাযিঃ)এর মাজার। সেখানে সালাম পেশ করার সৌভাগ্য হয়।

হযরত উকবা বিন আমের (রাযিঃ)

হযরত উকবা বিন আমের (রাযিঃ) বিখ্যাত সাহাবীদের অন্যতম। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন হিজরত করে পবিত্র মদীনা তায়্যিবাতে আসেন, তখন তিনি তাঁর পবিত্র হাতে বায়াত হন। এবং স্বীয় জন্মভূমি থেকে হিজরত করে পবিত্র মদীনারই অধিবাসী হয়ে যান। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে অনেক জিহাদে তিনি অংশগ্রহণ করেন। তিনি ফকীহ সাহাবীদের মধ্যে গণ্য হতেন। বিশেষভাবে ফারায়েয তথা উত্তরাধিকার শাস্ত্রে তিনি ছিলেন অধিক প্রসিদ্ধ। তিনি অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক পন্থায় কুরআন পাক তেলাওয়াত করতেন। তিনি নিজ হাতে পবিত্র কুরআনের একটি কপিও লিপিবদ্ধ করেন। হাফেজ ইবনে হাজার (রহঃ) লেখেন, কপিটি আজও মিসরে সংরক্ষিত আছে। তাঁর সেই কপিতে সূরাসমূহের ক্রমধারা উসমান (রাযিঃ) কর্তৃক সংকলিত কুরআনের সূরাসমূহের ক্রমধারা থেকে ভিন্নতর। কপিটির শেষে লিখিত আছে, এটি উকবা বিন আমের স্বহস্তে লিপিবদ্ধ করেন।

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের পরেও তিনি

জিহাদে মশগুল থাকেন। দিমাশ্‌ক বিজয়েও তিনি শামিল ছিলেন। বরং তিনিই হযরত উমর (রাযিঃ)কে দিমাশ্‌ক বিজয়ের সুসংবাদ দিয়েছিলেন। সাহাবায়ে কেরামের মতদ্বৈততার কালে তিনি হযরত মুয়াবিয়া (রাযিঃ)এর পক্ষে ছিলেন। সিফফিনের যুদ্ধে তিনি হযরত মুয়াবিয়া (রাযিঃ)এর পক্ষেই অংশগ্রহণ করেন। পরিশেষে হযরত মুয়াবিয়া (রাযিঃ) তাঁকে মিসরের গভর্নর নিযুক্ত করেন।

তাঁর জীবনী সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা কিতাবসমূহে পাওয়া যায় না। তবে তাঁর থেকে অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে, যে জায়গায় তাঁর মাজার অবস্থিত এটি সেই জায়গা, যার সম্পর্কে 'সালাহউদ্দীন আইয়ুবীর দূর্গ' এর পরিচয় পর্বে ইতিপূর্বে আমি লিখেছি যে, এটি আল মুকাত্তাম পাহাড়ের একটি অংশ ছিল। হযরত উমর (রাযিঃ) তা কবরস্থান বানানোর নির্দেশ দেন। তাই এখানে অনেক সাহাবায়ে কেরাম সমাধিস্থ হওয়ার বিষয় বহু গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে।

কিন্তু তাঁদের মাজারসমূহের হয় কোন চিহ্নই অবশিষ্ট নেই অথবা এ বিষয়ে অবহিত লোকেরা মৃত্যুবরণ করেছে।

হযরত উকবা বিন আমের (রাযিঃ)এর কবর যিয়ারত করার পর আমরা হোটেলে ফিরে আসি। মিসরে পাকিস্তানী রাষ্ট্রদূত জনাব রাজা যফরুল হক সাহেব নৈশভোজের দাওয়াত করেছিলেন। কিছুক্ষণ পরে তার গাড়ী এসে পৌঁছল। তার বাড়ীতে গেলাম। বাড়ীটি বেশ জাঁকজমকপূর্ণ। আল্লাহর দয়া, বাড়ীটি পাকিস্তানের মালিকানাধীন। এটি পাকিস্তানী রাষ্ট্রদূতের বাসস্থানরূপে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। নীল নদের তীরে শহরের মনোরম এক অঞ্চলে এটি অবস্থিত। একে 'গার্ডেন সিটি' বলে।

খাবার সময় রাজা সাহেবের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা হল। ইতিপূর্বে আমি লিখেছি যে, তিনি এখানে আসার পর অল্প সময়েই এখানকার শিক্ষিত সমাজে অত্যন্ত ভালবাসা ও গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করেন। অনেক দেশে আমাদের পাকিস্তান মিশন বড়ই দুর্বল এবং আমাদের মিশনসমূহের দায়িত্বহীনতা দেখে অত্যন্ত দুঃখ হয়। তবে মাশাআল্লাহ, রাজা সাহেব অত্যন্ত উৎসাহী ও কর্মঠ এবং দায়িত্ব সচেতন যার দরুন এখানে তিনি পাকিস্তানের পরিচিতি ও অবস্থান স্পষ্টরূপে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছেন।

আলহামদুলিল্লাহ! আল্লাহ তাআলা তাকে দেশ ও মিল্লাতের অধিক খিদমতের তাওফীক দান করুন। আমীন।

নীলনদ

রাজা সাহেবের গৃহ থেকে প্রত্যাবর্তনের পর মন কিছুটা ভারাক্রান্ত ছিলো। তাই হোটেল থেকে বের হয়ে ঘোরাফেরার জন্য নীলনদের তীরে চলে যাই। ঋতু বড়ই মনোরম। নদীর উভয় পাড়ে নির্মিত ভবনসমূহের বিচিত্র রঙ্গের আলোকমালা নদীর পানিতে প্রতিফলিত হয়ে এমন বিচিত্র রং সৃষ্টি করেছে, যা প্রকাশ করার জন্য মানব অভিধানে ভিন্ন কোন শব্দ নির্ধারণ করা হয়নি। নদীর উপরে নির্মিত সুন্দর সেতুতে বিপরীত দিক থেকে আসা চলন্ত গাড়ীসমূহের লাইটকে এমন মনে হচ্ছিল যেন নীলের উভয় তীর একে অপরের দিকে স্বর্ণের বল নিক্ষেপ করছে।

ঐতিহাসিক এ নদী কত জাতির উত্থান পতনের কত যে উপাখ্যান আপন তরঙ্গ বক্ষে লুকিয়ে রেখে শত সহস্র বছর ধরে একইভাবে প্রবাহিত হচ্ছে। বিশুদ্ধ হাদীসে একে জান্নাতের নদী বলা হয়েছে। মেরাজ রজনীতে যখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'সিদরাতুল মুনাতাহায়' পৌঁছেন তখন তার মূল থেকে দুটি প্রকাশ্য এবং দুটি গুপ্ত নদী প্রবাহমান দেখতে পান। তখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রশ্নের উত্তরে হযরত জিবরাঈল (আঃ) বলেন ঃ প্রকাশ্য এই দুই নদী হলো, নীল ও ফুরাত।

سيحان، جيحان، والفرات، والنيل كل من أنهار الجنة

অর্থ ঃ সাইহান, জাইহান, ফুরাত ও নীল জান্নাতের নদী।

এসব নদী জান্নাতী নদী হওয়ার তাৎপর্য কি, তা আল্লাহই ভাল জানেন। আলেমগণ এর বিভিন্ন প্রকার ব্যাখ্যা করেছেন। তবে হাদীসের ভাষার বাহ্যিক অর্থে এরূপ মনে হয় এবং অনেক আলেমও এরূপই ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন যে, এসব নদীর মূল উৎস জান্নাতেরই কোন এক নদী। এখন কথা হল, জান্নাতের সাথে এসব নদীর সম্পর্ক কিরূপে স্থাপিত এ বিষয় কেউ অবগত নয়। হাদীসেও তা উল্লেখ করা হয়নি এবং

তা উদ্ধারে উঠে পড়ে লাগার আবশ্যকতাও নেই।

তবে এতটুকু বিষয় পরিস্কার যে, নীল নদ এমন কিছু বৈশিষ্ট্যের অধিকারী, যার ভিত্তিতে সে বিশ্বের অন্যান্য নদের তুলনায় বৈশিষ্টমণ্ডিত।

১. নদীটি তার দৈর্ঘ্যের দিক দিয়ে বিশ্বের সর্ববৃহৎ নদী। যা চার হাজার মাইলব্যাপী বিস্তৃত।

২. অধিকাংশ নদী উত্তর থেকে দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হয়ে থাকে। কিন্তু এ নদীটি দক্ষিণ থেকে উত্তর দিকে প্রবাহিত।

৩. বহু সহস্র বছর ধরে নীল নদের মূল উৎস কোথায় তা গবেষকদের জন্য একটি রহস্যই রয়ে গেছে। আল্লামা মুকরিযী (রহঃ) 'আল খিতাব' গ্রন্থে এ বিষয়ে বার পৃষ্ঠাব্যাপী দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। সেখানে তিনি বিভিন্ন মতামত ও বর্ণনা তুলে ধরেছেন। যার ভিত্তিতে কোন সিদ্ধান্তে পৌছা সম্ভব নয়। ইনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকায় এর মূল উৎস উদঘাটনের অনেক শতাব্দীব্যাপী দীর্ঘ ইতিহাস বর্ণনা করা হয়েছে। সবশেষে বর্তমানে যেই চিন্তাধারাটি ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা লাভ করেছে তা এই যে, এ নদীটি উগাণ্ডার ভিক্টোরিয়া হ্রদ হতে উৎসারিত হচ্ছে। কিন্তু ব্রিটানিকার প্রবন্ধকার লেখেন যে, এ কথাটি এই অর্থে ঠিক আছে যে, ভিক্টোরিয়া হ্রদ পানির সেই সর্ববৃহৎ ভাণ্ডার যেখান থেকে নীল নদ তার চার হাজার মাইলের দীর্ঘ সফরের সূচনা করেছে। কিন্তু যদি উৎস দ্বারা এর মূল উৎস ধরা হয়, তাহলে প্রশ্ন হয় যে, ভিক্টোরিয়া হ্রদের পানি কোত্থেকে আসছে? ভিক্টোরিয়া হ্রদের পানির যোগান বিভিন্ন উপায়ে হচ্ছে। তার মধ্য থেকে কাজীরার উপত্যকাকে এখন পর্যন্ত নীলনদের সর্বশেষ উৎস নির্ধারণ করা হয়। এর সার্ভের কাজ আজো পূর্ণতা লাভ করেনি, তাই উক্ত প্রবন্ধকারের বক্তব্য হল ঃ 'ভৌগলিক গবেষণার সমস্যাদির মধ্যে নীলনদের উৎসের বিষয়টি ছাড়া এমন কোন বিষয় নেই, যা এত দীর্ঘকাল পর্যন্ত মানবের চিন্তা জগতে এত শক্তিশালী প্রভাব ফেলেছে।

শত সহস্র বছরের অনুসন্ধান ও গবেষণার পরও পৃথিবীতেই এর শেষ উৎস ১০০% ভাগ নিশ্চয়তার সাথে উদঘাটন করতে সক্ষম হয়নি। তাই চিরসত্যবাদী রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জান্নাতের সঙ্গে

এর যেই যোগসূত্রের উল্লেখ করেছেন, তার সঠিক তাৎপর্য উদঘাটন করা কারও পক্ষে সম্ভব কি?

পরদিন ভোরে ডঃ শাফেয়ী সাহেবের সঙ্গে কায়রোর বিভিন্ন কুতুবখানা ঘুরে দেখার কাজে সময় অতিবাহিত হয়। মিসর আরবী ভাষার ধর্মগ্রন্থসমূহের প্রসারের অনেক বড় কেন্দ্র। সেখান থেকে দ্বীনের প্রতিটি বিষয়ে এত অধিক গ্রন্থ প্রকাশ পেয়েছে যে, তা গণনা করে শেষ করা দুস্কর। তবে বর্তমানে ক্রমান্বয়ে এখানকার গ্রন্থাগারগুলো তার অতীত ঐতিহ্য হারাতে বসেছে। সেসব বিশ্বখ্যাত গ্রন্থাগারগুলোতে যাওয়ার সুযোগ ঘটে, যারা অতীতে হাজার হাজার গ্রন্থ প্রকাশ করেছে, কিন্তু বর্তমানে তাদের প্রকাশিত গ্রন্থের ভাণ্ডার অতি অল্প। দারুল মাআরেফের মত সংস্থা অতীতে যা অতি মূল্যবান জ্ঞানশীর্ষক গ্রন্থরাজির স্তূপ লাগিয়ে দিতো, এখন তা বেশীর ভাগ কিচ্ছা-কাহিনী আর নভেল-নাটক প্রকাশ করছে। তার পুরাতন প্রকাশিত গ্রন্থসমূহ দুস্প্রাপ্য হয়ে গেছে। এমন জীর্ণ-শীর্ণ অবস্থাতেও মিসর জ্ঞানশীর্ষক গ্রন্থরাজির গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র। ঈসা আল-বাবী, মুস্তফা আল-বাবী এবং মুহাম্মাদ আলী সাবীহ যাদের নাম সর্বদা বিভিন্ন গ্রন্থে পাঠ করেছি তাদের প্রকাশনা কেন্দ্রে যাই। বাহ্যিকভাবে সেসব গ্রন্থাগারের অবস্থা এতই জীর্ণ-শীর্ণ যে, তা দেখতে ময়লার ঘর মনে হয়, কিন্তু অনুসন্ধানকারী ব্যক্তির যদি সময় থাকে আর সে ধুলাবালির পরোয়া না করে তাদের আলমারির সারিতে ঢুকে যায়, তাহলে আজও অনেক দুর্লভ মুক্তা সে লাভ করতে পারবে। আল্লাহর শোকর, এমন অনেক দুস্প্রাপ্য গ্রন্থ, দীর্ঘদিন ধরে যেগুলো তালাশ করছিলাম, তা ঐ সব গ্রন্থগারে পেয়ে যাই।

আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়

সেদিন বেলা এগারোটায় আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের শায়েখের সঙ্গে সাক্ষাতের সময় নির্ধারিত ছিল। তাই কিতাব ক্রয়ের কাজ মাঝপথে রেখে কিছু সময়ের জন্য আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয় ও তৎসংশ্লিষ্ট অফিসসমূহে যাই।

বর্তমানে আল-আজহার বিরাট এক বিশ্ববিদ্যালয়। যার অধীনে

অনেক কলেজ এবং বিদ্যালয় রয়েছে। কিন্তু এর মূল সূচনা সেই ঐতিহাসিক মসজিদ থেকে ঘটে। যেটি আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গেই অবস্থিত এবং আল-আজহার জামে মসজিদ নামে প্রসিদ্ধ। জাকজমকপূর্ণ এই মসজিদটি ৩৬১ হিজরীতে নির্মাণ করা হয়। মু'ইযলিদ্দিনিল্লাহ এর ক্রীতদাস জাওহার আল কাতিব যখন কায়রো আবাদ করেন তখন তিনি এই মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেন। এই মসজিদ সম্পর্কে প্রসিদ্ধ ছিল যে, এর নির্মাণে এমন কিছু তেলেসমাতি কাজ করা হয়েছে, যে কারণে এই মসজিদ ভবনে কোন চড়ুই, কবুতর অথবা অন্য কোন প্রাণী বাস করতে পারে না। পরবর্তীতে হাকেম বি আমরিল্লাহ এই ভবন সংস্কার করেন এবং এর নামে অনেক কিছু ওয়াকফ করে দেন।

মোটকথা এটি কায়রোর (ফুসতাতের নয়) প্রাচীনতম মসজিদ। যেহেতু সে যুগে বড় বড় মসজিদগুলোতেই শিক্ষা সমাবেশ প্রতিষ্ঠা করার প্রচলন ছিল এবং মসজিদই নিয়মতান্ত্রিক মাদরাসার রূপ লাভ করত। বিধায় এই মসজিদ বহু শতাব্দীকাল পর্যন্ত বিরাট বড় ধর্মীয় শিক্ষাকেন্দ্রের খিদমত সম্পাদন করে। এখানে বড় বড় আলেম শিক্ষা অর্জন করেন এবং শিক্ষা দান করেন।

ফলে এই মাদরাসার সুখ্যাতি চতুর্দিকে ছড়িয়ে যায় এবং বিশ্বের চতুদিগন্ত থেকে ছাত্রদের আগমন ঘটতে থাকে। তাই শেষ যুগে মসজিদের পাশেই পৃথক ভবন নির্মাণ করে এটিকে বিংশ শতাব্দীর একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ দেওয়া হয়। তাই বর্তমানে আল-আজহার জামে মসজিদ নয় বরং আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা দান করা হয়। আর আল-আজহার জামে মসজিদ একটি ঐতিহাসিক মসজিদরূপে রয়ে যায়। আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয় অতীতে বড় বড় আলেম জন্ম দিয়েছে এবং বর্তমান শতাব্দীর সূচনা পর্যন্ত এটি ধর্মহীনতার প্লাবনে বাঁধ নির্মাণে খুব উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে। কিন্তু ক্রমান্বয়ে এর উপর এমন সব লোকের আধিপত্য বিস্তার হতে থাকে, যারা পাশ্চাত্য চিন্তাধারার সম্মুখে পরাজিত এবং জবাবদিহি মনোভাবের ধারক বাহক। যদিও আল আজহার থেকেই সর্বদা এমন দৃঢ়চেতা প্রত্যয়শীল গভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী ব্যক্তিত্বেরও জন্ম হতে থাকে, যারা এরূপ

চিন্তাধারার শক্তভাবে প্রতিরোধ ও মোকাবেলা করেন। কিন্তু পূর্বোক্ত দল রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা অর্জন করতে সক্ষম হওয়ায় তারা এর উপর আধিপত্য বিস্তার করতে থাকে। ফলে এই শিক্ষাকেন্দ্রের পোক্ত ধর্মীয় রং ম্লান হতে থাকে। যার কু-প্রভাব সর্বপ্রথম এখানকার সাধারণ আমলও পরিবেশের উপর পড়ে। জীবনের প্রতিটি শাখায় ইত্তেবায়ে সুন্নাতের গুরুত্ব যা যে কোন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সর্বাধিক মূল্যবান পুঁজি, ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেতে থাকে। জ্ঞান গবেষণার ক্ষেত্রেও অবনতি দেখা দেয়, তারপরেও আল-আজহার গবেষণার ময়দানে মোটামুটিভাবে তার মান ঠিক রেখেছে। কিন্তু বর্তমানের এই জ্ঞান গবেষণা এক শুষ্ক জ্ঞান গবেষণার রূপে রয়ে গেছে। যার মধ্যে আমলের প্রেরণা কদাচিতই দেখা যায়। ছাত্র এবং শিক্ষকদের কায়-কারবার ও নৈতিকতায় দ্বীনের উপর আমল করার গুরুত্ব পূর্বেই লোপ পেয়েছিল। পরবর্তীতে ইবাদত-বন্দেগীর গুরুত্বও দুর্বল হতে থাকে। বেশ-ভূষায় পরিবর্তন আসতে থাকে। মুখমণ্ডলের দাড়ি কমতে কমতে নিশ্চিহ্ন হতে থাকে। মাথায় পাগড়ী এবং দেহে জুব্বা অবশিষ্ট ছিল। পরিশেষে তাও বিদায় নেয়।

আজ থেকে প্রায় সাত বছর পূর্বে যখন আমি কায়রোতে প্রথমবার আসি তখন আল-আজহারের ছাত্র শিক্ষকদের মধ্যে প্রায় চল্লিশ শতাংশকে জোব্বা ও পাগড়ী পরিহিত দেখতে পাই। কিন্তু এবারের সফরে আল-আজহারের স্বাভাবিক পরিবেশে সেই বিশেষ পরিধেয়, চোখ সন্ধান করে ফেরে। প্রায় নিরানব্বই শতাংশ লোককে পাশ্চাত্যের পোশাকেই সজ্জিত দেখা যায়। সেখানকার ছাত্র শিক্ষকদের আপাদমস্তকে এমন কোন স্বাতন্ত্র্য অনুবীক্ষণ যন্ত্র লাগিয়েও দেখতে পাওয়া গেল না, যা তাদেরকে ধর্মহীন সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের ছাত্রদের থেকে পার্থক্য করবে।

তবে একটি আনন্দের বিষয় (যে সম্পর্কে আমি কিছুটা বিস্তারিতভাবে পরে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ) এই যে, মিসরের সাধারণ তরুণদের মধ্যে বিশেষতঃ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে দ্বীনকে জাগরুক করার এক অসাধারণ প্রবণতা দ্রুত শিকড় গেড়ে চলছে। এই তরুণেরা নিজেরা ধর্মের দিকে প্রত্যাবর্তনে ও স্বজাতিকে সে দিকে প্রত্যাবর্তন করাতে প্রত্যাশী। সাধারণতঃ তাদের অবয়বেও এই প্রবণতার নূর উদ্ভাসিত দেখা

যায়। এই তরুণেরাও আল-আজহারের এহেন পরিবেশ ও জীবন পদ্ধতিতে অশ্রু বিসর্জন করছে।

যাই হোক এটি একটি বেদনাদায়ক বাস্তবতা যে আল-আজহার ধর্মীয় বিষয়ে তার পূর্বের সেই ঐতিহ্য হারিয়ে ফেলেছে। জ্ঞান গবেষণার প্রান্তরে সেখান থেকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রথম শ্রেণীর বহু গ্রন্থ ও প্রবন্ধ এখনও প্রকাশ পাচ্ছে তাতে সন্দেহ নেই এবং আল্লাহর শোকর এখনও এমন সব প্রবন্ধের সংখ্যাও কম নয়, যার মধ্যে নির্ভেজাল ধর্মীয় চিন্তাধারা কার্যকর যা পাশ্চাত্যের ধর্মহীন সভ্যতার সম্মুখে জবাবদিহিমূলক চিন্তাধারার প্রকাশ্যে সমালোচনা করে থাকে। এতদব্যতীত বর্তমানের এই পতিত অবস্থাতেও সেখানে এমন কিছু আলেম আছেন, যাঁরা আমলের জগতে ছাত্রদের জন্য আদর্শ হতে পারেন, কিন্তু তাদের সংখ্যা আটায় লবণতুল্য এবং এখানকার সাধারণ পরিবেশে তাঁদের কোন প্রভাব নেই।

শাইখুল আজহার এবং উকিলুল আজহারের সঙ্গে সাক্ষাত

বেলা সাড়ে এগারোটায় শাইখুল আজহার শায়েখ জাদুল হক আলী জাদুল হকের সঙ্গে তার অফিসে সাক্ষাত হয়। অত্যন্ত উচ্ছ্বাস, সদাচরণ ও ভালবাসা নিয়ে তিনি আমাদের সঙ্গে মিলিত হন। শাইখুল আজহারের পদ মিসরের উচ্চপদসমূহের অন্যতম। প্রটোকলের ক্রমধারায় শাইখুল আজহারের পদ সম্ভবত প্রধানমন্ত্রীর পর সর্বোচ্চ পদ। তিনি রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে যে সুযোগ সুবিধা লাভ করে থাকেন, তা বড় বড় মন্ত্রীরাও পায় না। এটি আল-আজহারের মর্যাদা দানের অতি প্রাচীন ঐতিহ্য যা অদ্যাবধি চলে আসছে। এককালে আল-আজহারের শায়েখ তাদের এই মর্যাদাকে ধর্মীয় লক্ষ্য বাস্তবায়নে খুব বেশী ব্যবহার করতেন এবং কখনো সরকারের কোন কাজ ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে আপত্তিকর হলে শাইখুল আজহার নিজের সেই প্রভাব ও ব্যক্তিত্বকে কাজে লাগিয়ে তা সংশোধন করাতেন এবং হুকুমতের জন্য তাদেরকে ডিঙ্গিয়ে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা কঠিন ছিল।

কিন্তু ক্রমানুয়ে তাঁদের সেই প্রভাব ও কর্তৃত্ব লোপ পেতে থাকে। বর্তমানে শাইখুল আজহারের সেই উচ্চ মর্যাদা প্রথাস্বরূপ লাভ হয় ঠিক,

কিন্তু সরকারের কর্মকাণ্ডে তাদের কোন কর্তৃত্ব কার্যত অবশিষ্ট নেই। তবুও এই পদে যদি কোন নিষ্ঠাবান নির্ভীক ও চিন্তাশীল ব্যক্তি অধিষ্ঠিত হন, তাহলে তিনি অনেক খারাপ কাজ সংশোধনে প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম। বর্তমানের শাইখুল আজহার (শায়েখ জাদুল হক) প্রথমে মিসরের মুফতী ছিলেন। তাঁর সম্পর্কে এখানে প্রসিদ্ধ আছে যে, তিনি তুলনামূলক নির্ভীক ব্যক্তিত্ব। মিসরে শরীয়ত বাস্তবায়নের যে আন্দোলন চলছে শায়েখের কর্মপন্থায় তার শক্তি বৃদ্ধি পেয়েছে।

অধম প্রায় এক ঘন্টার এই সাক্ষাতে তাকে জ্ঞানী, ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, চিন্তাশীল ও সদাচারী পেয়েছে। বিভিন্ন বিষয়ে তার সঙ্গে আলোচনা হয়। অধম নিজের লেখা 'তাকমিলায়ে ফাতহুল মুলহীম' এর প্রথম ভলিউম তাঁকে হাদীয়া দিই। তিনি অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে কিতাবটি দেখেন এবং সাহস বৃদ্ধিসূচক কিছু কথা বলেন। আল আজহার এবং মিসরের সার্বিক অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা হয়। ফেরার পথে বিদায় দেওয়ার জন্য তিনি দরজা পর্যন্ত এগিয়ে আসেন। অনেক দু'আ দিলেন এবং মুহাব্বতের সাথে বিদায় করলেন।

তারপর শাইখুল আজহারের সহকারী উকিলুল আজহার শায়েখ হুসাইনের সঙ্গে সাক্ষাত হয়। তিনি আল-আজহারের ব্যবস্থাপনা প্রধান এবং খ্যাতনামা পণ্ডিত ব্যক্তি। আল্লামা আহমদ শাকের মসনদে আহমদ এর উপর যে কাজ অসম্পূর্ণ রেখেছিলেন, তিনি তা সম্পূর্ণ করার কাজে হাত দিয়েছেন। তার এক ভলিউম প্রকাশও পেয়েছে। অন্যান্য ভলিউমের কাজ চলছে বলে তিনি জানালেন।

হাফেজ ইবনে হাজার (রহঃ) মসজিদ

আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয় দেখার পরে জোহর নামাযের অল্প সময় বাকী ছিল। আমি আমার পথপ্রদর্শক ডঃ হাসান আশ শাফেয়ীকে অনেক পূর্বেই বলে রেখেছিলাম যে, আমি হাফেজ ইবনে হাজার (রহঃ)এর মাজার যিয়ারত করতে ইচ্ছুক। ডঃ সাহেব বললেন, তাহলে আমরা সেই মসজিদে গিয়েই নামায আদায় করি। সুতরাং আমরা জামে আল হুসাইনের সম্মুখের সংকীর্ণ ও অন্ধকার গলি অতিক্রম করে একটি

দীর্ঘ সড়কে পৌঁছি। সড়কটি জামে আল হাকিমে গিয়ে শেষ হয়েছে। এটি প্রাচীন কায়রোর একটি সড়ক, যা তৎকালে হয়ত রাজপথ ছিল। কিন্তু বর্তমানে তা খুবই সংকীর্ণ।

এর উভয় দিক দিয়ে প্রাচীন ধাচের বাজার চলে গেছে। প্রায় দেড় কিলোমিটার পথ চলার পর বাম দিকে একটি লম্বা গলিপথ রয়েছে। ডঃ হাসান আশ শাফেয়ী নিজেও দীর্ঘদিন পরে এখানে এসেছেন। তাই অনেক লোকের নিকটই তাকে ঠিকানা জিজ্ঞেস করতে হয়। পরিশেষে এই গলির শেষ মাথার নিকটে ছোট একটি মসজিদ দেখতে পেলাম। এটিই হাফেজ ইবনে হাজার (রহঃ) মসজিদ। ডঃ শাফেয়ীর ধারণা ছিল যে, এ মসজিদের সীমানাতেই হাফেয ইবনে হাজার (রহঃ)এর মাযার অবস্থিত। কিন্তু সেখানে কোন মাজার ছিল না। মসজিদের খাদেমগণ বললেন, এখানে তাঁর মাজার নেই। তবে এ মসজিদ তাঁরই, এখানে তিনি নামায আদায় করতেন এবং পাঠদানও করতেন। পরবর্তীতে জানতে পারি যে, তাঁর মাজার হযরত উকবা বিন আমের (রাযিঃ)এর মাজারের সম্মুখে কুরাফাতে অবস্থিত। যেখানে গতকাল আমরা গিয়েছিলাম। সম্প্রতি হাফেয ইবনে হাজার (রহঃ)এর এক জীবনীকার ডঃ শাকের মাহমূদ আবদুল মুনীম লেখেন ঃ

হাফেয ইবনে হাজার (রহঃ)এর মাজার সাইয়্যেদ আসাদের কুরাফার পশ্চিমে অবস্থিত। এর সম্মুখে হযরত উকবা বিন আমের (রাযিঃ)এর মাজার। আফসোস ! কবরটি অমনোযোগিতার স্বীকার। এতে মাটি স্তূপ হয়ে আছে...... এটি ভূমি থেকে উঁচু দীর্ঘাকৃতির ছোট একটি কক্ষে অবস্থিত। এর চার কোণায় চারটি উঁচু স্তম্ভ রয়েছে। যা উপরে গিয়ে সরু আকৃতি ধারণ করেছে। কবরের সিঁথানে অস্পষ্ট একটি ফলক রয়েছে, যার এই লেখা আমি পড়তে সক্ষম হই।

"এটি আহমদ বিন আলী বিন হাজার আল আসকালানীর কবর।"

মোটকথা তাঁর মাজারে তো হাজির হতে পারিনি তবে ঐ মসজিদে নামায পড়ার সুযোগ হয়েছে। মসজিদটি ছোট। বর্তমানে তার জীর্ণ-শীর্ণ অবস্থা, তবে মেরামতের কাজ চলছে। যেই মসজিদকে হাফেয ইবনে হাজারের মত জ্ঞানের অকুল সাগর তার ফয়েয বিতরণের কেন্দ্র বানান,

তার যৌবনকালে ইলম পিপাসীদের কেমন ভীড়ই না সেখানে হয়েছে।

হাফেয ইবনে হাজার (রহঃ)এর জীবনী গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে, তাঁর গৃহও এই মহল্লার আশেপাশে কোথাও ছিল।

এমনি তো খ্যাতনামা আলেমদের প্রত্যেকেই ইলেমের রবি-শশী ছিলেন, কিন্তু আমার মত তালেবে ইলেমদের উপর যে সকল ব্যক্তিত্বের করুণা সীমাহীন এবং যাঁদের নাম আসতেই অন্তরে ভক্তি ও ভালবাসার অসংখ্য ঝর্ণা উৎসারিত হতে থাকে, তাঁদের মধ্যে হাফেয ইবনে হাজার (রহঃ)এর সুউচ্চ স্থান রয়েছে। আল্লাহ তাআলা তাঁর দ্বারা ইলমে হাদীসের যে খিদমত নিয়েছেন তাঁর সঠিক মাকাম পরিমাপ করার জন্যও গভীর ইলেম দরকার। তাঁকে যদি উভয় জাহানের সম্রাট হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবিত মুজিযা বলা হয়, তাহলেও অত্যুক্তি হবে না।

বাল্যকালেই তিনি এতীম হন। তাঁর পিতার এক বণিক বন্ধু সর্বোতভাবে তাঁর লালন পালন করেন। আল্লাহ তাআলা আশ্রয়হীন এই বালককে স্বীয় হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতের সংরক্ষণ এবং তাঁর প্রচার প্রসারের জন্য মনোনীত করেন। তিনি শিক্ষা অর্জনে ব্রতী হলে খোদাপ্রদত্ত মেধা ও অসাধারণ স্মরণশক্তির বলে নিজের সকল সাথীদের অতিক্রম করে যান। হাদীস শাস্ত্রে তাঁর বিশেষ উস্তাদ ছিলেন হাফেয যায়নুদ্দীন ইরাকী (রহঃ)। হাফেয ইবনে হাজার (রহঃ) সম্পর্কে তিনি মন্তব্য করেন, হাদীস শাস্ত্রে আমার ছাত্রদের মধ্যে ইবনে হাজার থেকে বড় আলেম কেউ নেই।

হাফেয ইবনে হাজার (রহঃ) পবিত্র মক্কায় গিয়ে যমযম কূপের পানি পান করার সময় এই দু'আ করেন ঃ হে আল্লাহ, আপনি আমাকে হাফেয যাহাবীর মত স্মরণশক্তি দান করুন। আল্লাহ তাআলা তাঁর এ দু'আ কবুল করেন। বিশ বছর পর পুনরায় মক্কায় গেলে এই দু'আ করেন ঃ হে আল্লাহ ! আমাকে আরো অধিক স্মরণশক্তি দান করুন। সুতরাং বিচক্ষণ উলামাদের মন্তব্য এই যে, এই শাস্ত্রে তাঁকে আল্লাহ তাআলা হাফেয যাহাবীরও ঊর্ধ্বে স্থান দিয়েছিলেন।

বাস্তব জীবনে ইত্তিবায়ে সুন্নাতের প্রতি এত বেশী গুরুত্ব আরোপ

করতেন যে, লোকেরা পানাহারে ও চলাফেরায় তাঁর আমল দেখে দেখে সুন্নাতসমূহ শিক্ষা করত। একবার তিনি সন্দেহজনক খাবার খান। পরবর্তীতে এ বিষয়ে অবগত হলে একটি খাঞ্চা চেয়ে নেন এবং বলেন যে, আমি সেই কাজ করব যা হযরত সিদ্দীক আকবর (রাযিঃ) করেছিলেন। এ কথা বলে সমস্ত খাবার উগলে দেন।

তাঁর জীবন ছিল সময়ানুবর্তী। প্রতিটি কাজের সময় নির্ধারিত ছিল, প্রতিটি মুহূর্ত হিসেব করে ব্যয় করতেন। এমনকি লেখার সময় কলম ঠিক করতে হলে সে সময়টুকুও অনর্থক নষ্ট করতেন না। বরং এই ফাঁকে তিনি আল্লাহর যিকিরে লিপ্ত হতেন। সময়ের এমন মূল্য দেওয়ার বরকতেই আল্লাহ তাআলা তাঁর দ্বারা এত অধিক কাজ নেন যে, যদি কোন ব্যক্তি শুধুমাত্র তাঁর রচিত গ্রন্থসমূহ নকল করতেও চায়, সারা জীবনে তা নকল করেও শেষ করতে পারবে না। তাঁর গ্রন্থসমূহ সাধারণ মানের কোন গ্রন্থ নয়, বরং তা এমন গবেষণালব্ধ যে, তিনি যাই লিখেছেন তাই মানুষের নিকট প্রমাণরূপে গৃহীত হয়েছে। হাদীস বিষয়ে তাঁর মৌনতাও (অর্থাৎ কোন হাদীস বর্ণনা করে সে সম্পর্কে কোন মন্তব্য না করা) অনেক আলেমের নিকট প্রামাণ্য হওয়ার কথা ফতহুল বারী এবং তালখীছ গ্রন্থদ্বয়ে উল্লেখ আছে।

কিন্তু ফতহুল বারীর মত তুলনাহীন গ্রন্থসমূহের সংকলকের কোনরূপ গর্ব অহংকারে লিপ্ত হওয়া তো দূরের কথা, বরং তাঁর এমন বিনয় ছিল যে, তিনি তাঁর গ্রন্থরাজি সম্পর্কে লিখেন ঃ 'আমার অধিকাংশ গ্রন্থই অন্যান্য আলেমদের একটি গ্রন্থেরও সমকক্ষ নয়। ব্যস! আমার কলম লিখেছে মাত্র।'

তবে তিনি তাঁর গ্রন্থসমূহের মধ্য হতে শুধুমাত্র ফতহুল বারী, হাদিউস সারী, তাগলীকুত তালীক, নুখবাতুল ফিকার, আল মুশতাবাহুত তাহযীব এবং লিসানুল মিযান সম্পর্কে তিনি সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। আর অবশিষ্ট গ্রন্থ সম্পর্কে লেখেন ঃ আমার অবশিষ্ট সকল গ্রন্থ সংখ্যায় তো অনেক, কিন্তু বিষয়বস্তুর দিক থেকে তা দুর্বল। নিজের গ্রন্থ সম্পর্কে এরূপ স্বীকারোক্তি জ্ঞান ও গুণের সুউচ্চ চূড়া হাতে পেলেই করা সম্ভব হয়। আল্লাহ পাক তাঁর উপর অফুরন্ত রহমত নাযিল করুন।

হাফেয বুলকিনী (রহঃ)এর মাজারে

হাফেয ইবনে হাজার (রহঃ)এর মসজিদ থেকে বের হয়ে ফেরার পথে কিছুদূর অগ্রসর হলে ঐ গলিরই ডান দিকে আরেকটি মসজিদ দেখতে পাই। মসজিদের উপর একটি বোর্ড লাগানো রয়েছে। বোর্ডের লেখা থেকে জানতে পারি যে, এটি উমর বিন রসলান আল বুলকিনী (রহঃ)এর মাজার। আল্লামা উমর বিন রসলান আল বুলকিনী (রহঃ) হাফেয ইবনে হাজার (রহঃ)এর ওস্তাদ ছিলেন। হাফেয ইবনে হাজার (রহঃ) যে সকল ওস্তাদের সঙ্গে বিশেষ সম্পর্ক রাখতেন এবং যাঁদের থেকে অধিক জ্ঞান অর্জন করতেন, তাঁদের মধ্যে হাফেজ যায়নুদ্দীন ইরাকী (রহঃ), আল্লামা বুলকিনী (রহঃ) এবং হাফেজ ইবনুল মুলকিন (রহঃ)এর সম্মানিত নাম শীর্ষ তালিকায়। আল্লামা বুলকিনী (রহঃ) হাদীস শাস্ত্রে যদিও পূর্ণ দক্ষতা রাখতেন, কিন্তু ফেকাহ ছিল তার বিশেষ বিষয়বস্তু। হাফেয ইবনে হাজার (রহঃ) ফেকাহ শাস্ত্রে তাঁর নিকট থেকে বিশেষভাবে জ্ঞান অর্জন করেন। আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রহঃ) বলেন ঃ 'যমযমের পানি পানকালে আমি দু'আ করি যে, হে আল্লাহ! আপনি আমাকে হাদীস শাস্ত্রে হাফেয ইবনে হাজার (রহঃ)এর এবং ফেকাহ শাস্ত্রে আল্লামা বুলকিনী (রহঃ)এর মর্তবা দান করুন।

আল্লামা বুলকিনী (রহঃ) মূলতঃ সিরিয়ার অধিবাসী ছিলেন। বাল্যকালেই তিনি মিসরে চলে আসেন এবং এখানে বসবাস শুরু করেন। দীর্ঘদিন দিমাশ্‌কে কাজীর পদেও অধিষ্ঠিত ছিলেন। পরবর্তীতে পুনরায় মিসরে চলে আসেন এবং শেষ জীবন পর্যন্ত এখানেই অবস্থান করেন। তার স্মরণশক্তি এমন প্রখর ছিল যে, তিনি যখন কামেলিয়া মাদরাসায় ভর্তি হন, তখন মাদ্রাসার মুহতামিম সাহেবের নিকট অবস্থান করার জন্য একটি কক্ষের আবেদন করেন। মুহতামিম সাহেব তা দিতে অস্বীকার করেন। পরবর্তীতে সেখানে একদিন একজন কবি আগমন করেন। তিনি সেই মুহতামিম সাহেবের প্রশংসা সম্বলিত দীর্ঘ একটি কাব্যগাঁথা পড়ে শোনান। কবিতা আবৃত্তি শেষ করলে আল্লামা বুলকিনী (রহঃ) বলেন ঃ কাব্যগাঁথাটি আমার মুখস্থ হয়ে গেছে। তখন মুহতামিম সাহেব বললেন, এই কাব্যগাঁথা তুমি মুখস্থ শোনাতে পারলে আমি তোমাকে একটি কক্ষ

দিয়ে দেব। তখন তিনি কাব্যগাঁথাটি আদ্যপান্ত শুনিয়ে দিলেন। এভাবে তিনি সেই কক্ষ পেয়ে যান।

প্রত্যহ আসর থেকে মাগরিব পর্যন্ত ফতওয়া লিখনের অভ্যাস ছিল। প্রত্যক্ষদর্শীরা বলেন ঃ এ পুরো সময় অব্যাহতভাবে তাঁর কলম লিখে চলত। তবে কোন ফতওয়া সম্পর্কে সামান্যতম সন্দেহ হলে তা বিভিন্ন কিতাবে দেখার জন্য এবং এ বিষয়ে অধ্যয়নের জন্য লেখা বন্ধ রাখতেন। পরিপূর্ণ নিঃসন্দেহ না হয়ে কোন উত্তর লিখতেন না। তাতে যত দেরীই হোক না কেন।

তাঁর পাঠ দানের সুখ্যাতি দূর দূরান্ত পর্যন্ত ছড়িয়েছিল। আল্লামা বোরহান হালভী (রহঃ) লেখেন ঃ 'আমি তার মুখতাছার সহীহ মুসলিমের পাঠদানের বৈঠকে অনেক বারই অংশগ্রহণ করি। তার সেই বৈঠকে চার মাযহাবের ফকীহগণই অংশগ্রহণ করতেন। একটি হাদীস নিয়ে তিনি ভোর থেকে আলোচনা শুরু করে জোহরের নিকটবর্তী সময় পর্যন্ত ঐ একই হাদীসের পাঠদান চালু রাখতেন।

কিন্তু তার ইলম লেখনীর মাধ্যমে প্রসার লাভ করেনি। তার কারণ এই ছিল যে, তিনি কোন গ্রন্থ লিখতে শুরু করলে জ্ঞানের গভীরতা হেতু ছোট ছোট বিষয়ে বিশদ আলোচনা করতেন। ফলে তাঁর সে লেখনী পূর্ণতা লাভ করতে পারত না। তখন আরেকটি শুরু করতেন। যেমন বুখারী শরীফের ভাষ্যগ্রন্থ লেখা আরম্ভ করে শুধুমাত্র বিশটি হাদীস লিখতেই দুই ভলিউম হয়ে যায়। এ কারণে তাঁর লিখিত গ্রন্থ অধিক হতে পারেনি।

কেউ কেউ তাঁকে নবম শতাব্দীর মুজাদ্দিদও বলেছেন। ৮০৫ হিজরীতে তাঁর ইন্তেকাল হয়। তাঁর মৃত্যুর সময় তাঁর প্রিয় ছাত্র হাফেয ইবনে হাজার (রহঃ) হজ্জে গিয়েছিলেন। হজ্জ থেকে ফিরে এসে তাঁর মৃত্যুর সংবাদ শুনে অত্যন্ত ব্যথিত হন এবং তাঁর সম্পর্কে অতীব বেদনাপূর্ণ শোকগাঁথা রচনা করেন। যার সূচনা এই—

يا عين جودى لفقد البحر بالمطر

واذرى الدموع ولاتبقى ولاتذرى

رَحِمَهُ اللّٰهُ رَحْمَةً وَّاسِعَةً

আল্লাহ তাআলা তার উপর স্বীয় অফুরন্ত রহমত বর্ষণ করেন।

আল হাকেম জামে মসজিদ

কায়রোর অলিগলি ইতিহাসে সমৃদ্ধ। বিশেষ করে নগরীর প্রাচীন অঞ্চল এমন যে, যে কোন ঐতিহাসিক বা প্রত্নতত্ত্ববিদের প্রতিটি স্থানে গবেষণা চালিয়ে ইতিহাস রচনা করতে বহু বছর সময়ের প্রয়োজন হবে। হাফেয ইবনে হাজার (রহঃ)এর মসজিদের গলি থেকে বের হয়ে বামদিকে এগুলে অতি দীর্ঘ ও প্রশস্ত জাঁকজমকপূর্ণ দুর্গসদৃশ একটি মসজিদ দৃষ্টিগোচর হয়। ডঃ শাফেয়ী বললেন ঃ এটি আল হাকেম জামে মসজিদ। আল হাকেম জামে মসজিদ একজন অত্যাচারী ফাতেমী বাদশাহ হাকেম বি আমরিল্লাহ এর নামে সম্পৃক্ত। যার ঔদ্ধত্য সীমালংঘন এবং হস্তপদহীন আইন মিসরবাসীর জন্য বহু বছর ধরে বিপদরূপে আপতিত হয়। তার সম্পর্কে আল্লামা সুয়ূতী (রহঃ) লেখেন, ফেরআউনের পর এর চেয়ে অধিক নিকৃষ্ট শাসক মিসরে আর দ্বিতীয়টি আসেনি। মসজিদের নির্মাণ কাজ প্রথমে আজিজ বিল্লাহ শুরু করেন। পরে এই কাজ হাকেম সম্পন্ন করেন। তাই একে আল হাকেম জামে মসজিদ বলা হয়। এই মসজিদেও চার মাযহাবের শিক্ষা সমাবেশ প্রতিষ্ঠিত ছিল। তবে এটি ফাতেমী যুগের বিরাট বড় মসজিদ হওয়ায় বুহরীয়দের এটি কেন্দ্রস্থল ছিল। বুহরী ফেরকার লোকেরা দূর দূরান্ত থেকে এর দর্শনে আসত।

ইবনে হিসাম নাহবী (রহঃ)

যেখানে আল হাকেম জামে মসজিদের দৈর্ঘ্য শেষ হয়েছে, সেখান থেকে বাম দিকে একটি প্রাচীর শুরু হয়েছে, যা এক সময় নগর রক্ষার কাজ দিত। এই প্রাচীরে এখনও একটি দরজা রয়েছে, তাতে প্রাচীনতার নিদর্শন সুস্পষ্ট। এই দরজার ভীতরের অংশে চত্বরের মত একটি জায়গা রয়েছে। ডঃ শাফেয়ী বললেন ঃ 'আমি, আমার ওস্তাদগণ এবং পিতা ও পিতামহদের কাছ থেকে শুনেছি যে, এই চত্বরটি প্রসিদ্ধ আরবী ব্যাকরণ

শাস্ত্রবিদ ইবনে হিসাম (রহঃ)এর কবর। ইনি সেই ইবনে হিসাম (রহঃ), যাঁর রচিত 'মুগনিউল লাবীব' গ্রন্থ আরবী ব্যাকরণের প্রামাণ্য উৎসসমূহের মধ্যে গণ্য হয় এবং তৎপ্রণীত 'কতরুল মুনদী' গ্রন্থ প্রাথমিক আরবী ব্যাকরণরূপে অনেক শিক্ষাকেন্দ্রের পাঠ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। তার পূর্ণ নাম আবদুল্লাহ বিন ইউসুফ জামালউদ্দীন বিন হিসাম (রহঃ)। ফেকাহ বিষয়ে প্রথমে তিনি শাফেয়ী মাযহাবাবলম্বী ছিলেন। পরবর্তীতে হাম্বলী মাযহাব গ্রহণ করেন। তবে তিনি আরবী ব্যাকরণ ও সাহিত্যকেই নিজের বিশেষ বিষয়বস্তুরূপে গ্রহণ করেন। তৎযুগে তাঁকে সর্বসম্মতভাবে ব্যাকরণের ইমাম মানা হত।

ইবনে খালদুন বলেন ঃ 'আমি মরক্কো থাকতে তাঁর খ্যাতি শুনি যে, মিসরে আরবী ব্যাকরণ ও অন্যান্য শাস্ত্রে এমন এক আলেম জন্ম নিয়েছেন যিনি ব্যাকরণে 'সিবিওয়াই'–এর তুলনায় অধিক পারদর্শী।'

উপরোক্ত গ্রন্থ ছাড়াও তিনি আরও বহু গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করেন। তিনি ৭৬১ হিজরীর জিলকদ মাসে ইন্তেকাল করেন।

আল্লামা আইনী (রহঃ)এর মসজিদ

এখান থেকে ফেরার পথে আমরা পুনরায় আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ে যাই। কেননা আমাদের গাড়ী ওখানেই ছিল। আল–আজহার জামে মসজিদের পশ্চাতে একটি গলি রয়েছে। ঐ গলির একটি মসজিদের নিকট দিয়ে অতিক্রমকালে ডঃ শাফেয়ী বললেন ঃ 'এটি আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (রহঃ)এর মসজিদ। তাঁর মাজারও এখানেই অবস্থিত।'

আমার মত তালেবে ইলমের জন্য এখানে কিছু সময় অবস্থান করার জন্য এটি কম আকর্ষণের বিষয় ছিল না যে, এটি আল্লামা আইনী (রহঃ)এর মহল্লা, তাঁর মসজিদ, তাঁর মাদরাসা এবং তাঁর মাজার। সেই আল্লামা আইনী (রহঃ), যাঁর অনুকম্পারাজির ভারে মুসলিম উম্মাত বিশেষতঃ হানাফী আলেমদের ঘাড় নুয়ে আছে। তাঁর প্রণীত শরহে বুখারী, শরহে হেদায়া এবং শরহে কানয হানাফী ফেকাহের বিরাট উৎস বলে গণ্য। এছাড়াও প্রত্যেক শাস্ত্রে তার এত অধিক গ্রন্থ রয়েছে যে,

হাফেয সাখাভী (রহঃ)এর মত বিচক্ষণ (আলেমদের প্রশংসায় অতি সতর্ক) ও বুযুর্গ ব্যক্তিও একথা না বলে পারেননি যে, 'আমার জানা মতে আমাদের শায়েখ (হাফেয ইবনে হাজার রহঃ) এর পর আল্লামা আইনী (রহঃ) এর থেকে অধিক গ্রন্থ প্রণেতা বুযুর্গ ব্যক্তিত্ব আর কেউ নেই। তিনি আল–আজহার জামে মসজিদের নিকটেই নিজের মসজিদ এবং মাদরাসা এজন্য বানিয়েছিলেন যে, তিনি আল–আজহার জামে মসজিদে নামায পড়া 'কারাহাত' ত্রুটিমুক্ত মনে করতেন না। কারণ এটি একজন তাবাররায়ী (দুষ্ট ও অসৎ) রাফেজী ওয়াকফ করেছিল।

আল্লামা আইনী (রহঃ)কে আল্লাহ তাআলা জ্ঞানে গুণে স্মরণশক্তি এবং লেখনী শক্তিতে এমন দক্ষতা দান করেছিলেন যে, তা কদাচিৎই কারও ভাগ্যে জোটে। এত দ্রুত লিখতেন যে, একবার মুখতাছর আল কুদুরী গ্রন্থ সম্পূর্ণ এক রাত্রিতে নকল করেন। হাফেজ ইবনে হাজার (রহঃ) এবং আল্লামা আইনী (রহঃ)এর মাঝের সমসাময়িক হওয়ার দ্বন্দ্ব অতি প্রসিদ্ধ। যদিও আল্লামা আইনী (রহঃ) বয়সে হাফেজ ইবনে হাজার (রহঃ) থেকে বার বছরের বড় ছিলেন এবং হাফেজ ইবনে হাজার (রহঃ) তাঁর নিকট কিছু হাদীসও পাঠ করেন। তবে মোটের উপর তাঁদের পরস্পরকে সমসাময়িক গণ্য করা হয়। হাফেয ইবনে হাজার (রহঃ) শাফেয়ী মাযহাবের ছিলেন, আর আল্লামা আইনী (রহঃ) ছিলেন হানাফী মাযহাবের। তিনিও বিচারপতি ছিলেন এবং ইনিও বিচারপতি ছিলেন। তিনিও বুখারী শরীফের ভাষ্যগ্রন্থ লিখেছেন এবং ইনিও লিখেছেন। এজন্য উভয়ের মধ্যে সূক্ষ্ম জ্ঞান শীর্ষক মতবিরোধ লেগে থাকত।

হাফেজ ইবনে হাজার (রহঃ) প্রথমে বুখারী শরীফের ভাষ্যগ্রন্থ লিখতে আরম্ভ করেন। সাথে সাথে তিনি তা ছাত্রদেরকে লিখাতে থাকেন। ছাত্রদের মধ্যে আল্লামা বোরহানউদ্দীন ইবনে খিজির নামক এক ছাত্রের আল্লামা আইনী (রহঃ)এর সঙ্গেও সম্পর্ক ছিল। আল্লামা আইনী (রহঃ) তাকে তার লিখিত খাতাগুলো ধার দেওয়ার জন্য বললেন। আল্লামা ইবনে খিজির হাফেজ (রহঃ)এর অনুমতি গ্রহণ করে আল্লামা আইনী (রহঃ)কে ব্যাখ্যার লিখিত অংশ ধার দিতে শুরু করেন। ফলে আল্লামা আইনী (রহঃ) নিজের ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচনা করার সময় হাফেজ (রহঃ)এর

ব্যাখ্যা সামনে রাখেন এবং বিভিন্ন স্থানে তাঁর উপর আপত্তিও তুলে ধরেন। পরবর্তীতে হাফেজ (রহঃ), আইনী (রহঃ)এর উত্থাপিত আপত্তিসমূহের উত্তরে স্বতন্ত্র দুটি গ্রন্থ রচনা করেন।

উভয়ের সূক্ষ্ম টোকাটুকির একটি মনোরম ঘটনা এরূপ, তৎকালীন শাসক আল মালিকুল মুয়াইয়াদ এর চরিত নিয়ে আল্লামা আইনী (রহঃ) একটি দীর্ঘ কাব্য রচনা করেন। তাতে শাসনকর্তার নির্মিত জামে মসজিদের প্রশংসা করা হয়েছিল। ঘটনাচক্রে কিছুদিন পর সেই মসজিদের মিনার হেলে পড়ে এবং পতন্মুখ হয়। তখন হাফেজ ইবনে হাজার (রহঃ) একটি চিরকুটে দুই লাইন কবিতা লিখে বাদশাহর নিকট পাঠিয়ে দেন।

لجامع مولانا المويد رونق

منارته تزهو على الفخر والزين

تقول، وقدمالت، على ترفقوا

فليس على حسنى أضر من العين

অর্থ ঃ 'মুয়াইয়াদ সাহেবের জামে মসজিদ অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণ। তার মিনার গর্ব ও সৌন্দর্যের কারণে অতি শোভাময়। কিন্তু মিনারটি যখন ঝুঁকে গেল, তখন সে বলল, 'আমার উপর অনুগ্রহ কর' কারণ আমার সৌন্দর্যের জন্য বদনজরের চেয়ে অধিক ক্ষতিকর বস্তু আর নেই।'

এই কবিতার মধ্যে মজার ব্যাপার এই যে, এতে ব্যবহৃত 'আঈন' (বদনজর)কে অন্ত মিলের জন্য 'আইনী' পড়া হয়, যার দ্বারা আল্লামা আইনী (রহঃ)এর দিকে ইঙ্গিত হয়।

চিরকুটটি মালিক মুয়াইয়াদের হস্তগত হলে তিনি তা আল্লামা আইনী (রহঃ)এর নিকট পাঠিয়ে দেন। তখন আল্লামা আইনী (রহঃ)এর উত্তরে দুই লাইন কবিতা লিখে তা ফেরত পাঠান ঃ

منارة كعروس الحسن قد جليت

وهدمها بقضاء الله والقدر

قالوا أصيبت بعين، قلت ذاخطأ

وانما هدمها من خيبة الحجر

অর্থ ঃ 'মিনারটি সৌন্দর্যে নওশার মত ভাস্বর। আর তা পতিত হওয়া শুধুমাত্র আল্লাহ তাআলার ফয়সালার কারণেই হয়েছে। মানুষে বলে তাতে নজর লেগেছে। আমি বলি এটি ভুল কথা। মূলতঃ তার 'হাজার' (পাথর) নষ্ট হওয়ার ফলে পতিত হয়েছে।' (এখানে 'হাজার' শব্দ দ্বারা ইবনে হাজার-এর দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।)

আল্লামা দারদের মালেকী (রহঃ)

আল্লামা আইনী (রহঃ)এর মসজিদ থেকে সম্মুখে সামান্য অগ্রসর হলে মালেকী মাযহাবের প্রসিদ্ধ ফকীহ আল্লামা আহমদ আদ দারদের মালেকী (রহঃ)এর মাজার। তিনি সেই মহান ব্যক্তি যাঁর প্রণীত 'মুখতাছরে খলীল' গ্রন্থের ভাষ্যগ্রন্থ বর্তমানে মালেকী ফেকাহের মেরুদণ্ডের মর্যাদা রাখে। তিনি দ্বাদশ হিজরী শতাব্দীর একজন বুযুর্গ। আল আজহার জামে মসজিদে ইলম হাসিল করেন। ফেকাহ এবং তাসাওউফ শাস্ত্রে তাঁকে ইমাম মনে করা হয়। এমনকি তাঁকে মালিকুস সাগীর (ছোট ইমাম মালেক) বলা হতে থাকে।

তৎকালীন মরক্কোর বাদশাহ আল আজহারের আলেমদের জন্য হাদীয়া পাঠাতেন। (১১৯৮ খৃষ্টাব্দ) একবার কিছু হাদীয়া তিনি আল্লামা দারদের (রহঃ)এর খেদমতে পাঠান। ঘটনাচক্রে সে বৎসরই বাদশাহর ছেলে হজ্জে যায়। ফেরার পথে মিসরে পৌছে তার সফরের খরচের অর্থ শেষ হয়ে যায়। আল্লামা দারদের (রহঃ) বিষয়টি অবগত হতে পেরে তাঁর প্রাপ্ত হাদীয়ার অর্থ শাহজাদার নিকট পাঠিয়ে দেন। পরবর্তী বছর বাদশাহ এর দশগুণ বেশী হাদীয়া পাঠান। শায়েখ সেই অর্থ দিয়ে হজ্জ করেন এবং অবশিষ্ট টাকা দিয়ে তাঁর মসজিদ ও খানকা নির্মাণ করেন। জীবনের শেষ পর্যন্ত তিনি তাতেই অধ্যাপনা এবং গ্রন্থ রচনার কাজ করে যান। পরিশেষে ১২০১ হিজরীতে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

আল্লামা দারদের (রহঃ)এর মাজার যিয়ারতের পর আমরা হোটেলে

ফিরে এসে কিছু সময় বিশ্রাম করি। সেদিন সন্ধ্যায় এবং পরদিন বারোটা পর্যন্ত বিভিন্ন গ্রন্থাগার ঘুরে দেখা এবং গ্রন্থ ক্রয়ে সময় কাটে। দ্বিপ্রহরের খাবার খাওয়ার পর দেশে ফেরার জন্য এয়ারপোর্ট অভিমুখে যাত্রা করি।

সার্বিক প্রতিক্রিয়া

মিসর বহু শতাব্দী দ্বীন ও ইলমের লালন কেন্দ্র ছিল। এই ভূমি ইলেম ও ধর্মীয় নৈতিকতার এমন সকল রবি-শশী জন্ম দিয়েছে, ইতিহাস সর্বদা যাদের নিয়ে গর্ব করবে, কিন্তু যেমনিভাবে এদেশ দীর্ঘদিন ইলেম এবং দ্বীনের দিক দিয়ে আলমে ইসলামের নেতৃত্ব দিয়েছে তেমনিভাবে পাশ্চাত্য চিন্তাধারার ব্যাপকতার পর এদেশেরই কিছু বুদ্ধিজীবী পাশ্চাত্যবাদের প্রচার প্রসারের কাজেও অংশগ্রহণ করেন। মুফতী মুহাম্মদ আবদুহু সাইয়্যেদ রশীদ রেজা, পরবর্তীতে ত্বাহা হুসাইন এবং আহমাদ আমীনের মত প্রচলিত প্রগতিবাদী মনোভাবের লোকেরাও এদেশে জন্মগ্রহণ করেন। তাদের চিন্তাধারা এবং লিখনী সমগ্র আলমে ইসলামের প্রচলিত প্রগতি ও আধুনিকতাপ্রেমীদের অস্ত্র যোগান দিয়েছে। এমনকি আল আজহারের মত জ্ঞান কেন্দ্রও তাঁর বিষাক্ত থাবায় আক্রান্ত হয়।

অপরদিকে দৃঢ় আকীদার আলেমদের সংখ্যাও এখানে কম ছিল না। তাঁরা প্রথমদিকে এসব চিন্তাধারার বিরুদ্ধে দৃঢ়তার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। তবে প্রথমোক্ত দল রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করার ফলে বাস্তব জীবনে এদের প্রভাব প্রবল হতে থাকে। জামালউদ্দীন আবদুন নাসেরের শাসনামলে এই ধারা চূড়ান্তে পৌছে। দ্বীনকে রাষ্ট্রব্যবস্থার ভিত্তি নির্ধারণের সর্বপ্রকার আন্দোলন সে অত্যন্ত কঠোর হস্তে দমন করে। ইখনওয়ানুল মুসলিমীনের সদস্যরা সাধারণতঃ ইখলাস এবং দ্বীনী জযবা উভয়টিতে সমৃদ্ধ। তাঁরা অনেক বড় কুরবানী করেছেন। তবে এমন মনে হয় যেন তাঁরা তাঁদের কর্মপদ্ধতি নির্বাচন করতে সচেতনতা, কৌশল ও বুদ্ধির দ্বারা এতটুকু কাজ নেননি যতটুকু নিয়েছেন যোশের মাধ্যমে। যাই হোক জামাল নাসেরের শাসনামলে দ্বীনকে বাস্তব জীবনে চালু করার চিন্তাকে গলা টিপে হত্যা করা হয়। ফলে দেশে আরবী জাতীয়তাবাদের পূজা শুরু হয়, ধর্মহীনতা, নগ্নতা ও অশ্লীলতার এক সয়লাব উথলে উঠে।

আনোয়ার আস সাদাতের শাসনামলে দ্বীনী মহলের সঙ্গে কিছুটা নম্রতার আচরণ করা হয়। বাহ্যতঃ বর্তমান সরকারও এই পলিসিতে অবস্থান করছে। ফলে বর্তমানে তাবলীগ ও দাওয়াতের কাজের বিশেষ উন্নতি হয়েছে। এর ফল এই হচ্ছে যে, জনসাধারণের মধ্যে ধর্মীয় আবেগের সেই স্ফুলিঙ্গ যা জোর জবরদস্তি করে দাবিয়ে রাখা হয়েছিল, এখন তা তার রং দেখাচ্ছে।

একদিকে সরকারের পাশ্চাত্য তোষামোদমূলক নীতির অব্যাহত প্রভাবে এখনও নগ্নতা ও অশ্লীলতার বাজার গরম রয়েছে। কোন কোন অঞ্চলের লোকদের চালচলন দেখে সিদ্ধান্ত করাই দুস্কর হয় যে, এটি ইউরোপের কোন নগরী নাকি আলমে ইসলামের। এখানে মদ্যপানের মহামারীও ব্যাপক। প্রচার মাধ্যমগুলো সামান্যতম রাগ-ঢাক ছাড়া প্রকাশ্যে নগ্নতা ও অশ্লীলতার প্রচার করে যাচ্ছে। অপরদিকে তরুণদের মাঝে দ্বীনের দিকে প্রত্যাবর্তনের এক অসাধারণ উদ্দীপনা জাগ্রত হচ্ছে। বিভিন্ন মহল এই মাঠে অব্যাহতরূপে কাজ করে যাচ্ছে। তাবলীগ জামাতের প্রভাবও মাশাআল্লাহ উজ্জ্বল দেখা যায়, এতদ্ব্যতীত ইখওয়ানের সদস্যরাও বিভিন্ন উপায়ে তরুণদের মাঝে ইসলামকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার উদ্দীপনা সৃষ্টি করে চলেছে। বর্তমানে মিসরে শরীয়তের বিধান বাস্তবায়নের আওয়াজ সমুচ্চ করার কাজে বড় একটি মসজিদের খতীব হাফেজ সাল্লামা অগ্রগামী। আমি যখন সেখানে ছিলাম তখন তিনি কারাগারে ছিলেন।

পূর্বের তুলনায় সরকারের আইন শিথিল হওয়া সত্ত্বেও তরুণদের মাঝের জেগে ওঠা ধর্মীয় প্রবণতাকে সরকারী মহলে কোন্ দৃষ্টিতে দেখা হচ্ছে, তা এই ঘটনা থেকে অনুমান করা যায় যে, তরুণেরা ছোট ছোট চিরকুটে সাইজের ষ্টিকার পেপারে শুধুমাত্র কালিমা তাইয়্যিবা—লিখে লোকদের মধ্যে বিতরণ করে এবং আবেদন করে, এসব ষ্টিকার গাড়ীতে লাগিয়ে দেয়ার জন্য। অল্পদিনের মধ্যেই ষ্টিকারগুলো এত ব্যাপকতা লাভ করে যে, কায়রোর প্রায় প্রতিটি গাড়ীতেই সেই ষ্টিকার লেগে যায়। সরকার এ অবস্থার রিপোর্ট রেকর্ড করে এবং তাৎক্ষণিকভাবে গাড়ী থেকে ষ্টিকার তুলে ফেলার হুকুম জারি করে।

সরকারের এই পদক্ষেপে তরুণদের ক্ষুব্ধ হওয়া স্বাভাবিক ব্যাপার। সুতরাং আমার সেখানে অবস্থানকালে তাদের এবং পুলিশের মাঝে সংঘর্ষ চলছিল।

তবুও যদি দ্বীনী মহল এখলাস, কৌশল, বুদ্ধিমত্তা ও দৃঢ়তার সাথে দাওয়াতের কাজ চালু রাখে এবং কাজের প্রথম ধাপেই সরকারকে সরাসরি প্রতিপক্ষ বানিয়ে নিজেদের জন্য বিরাট প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না করে হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানী (রহঃ)এর পদ্ধতিতে এই দাওয়াত সরকারী মহল পর্যন্ত বিস্তৃত করে, তাহলে ক্রমান্বয়ে অবস্থার উন্নতি সাধনের আশা করা যায় ইনশাআল্লাহ।

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত